বিদ্রোহী বল্‌কান্‌

রামনাথ বিশ্বাস

মিত্রালয়,
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা

—সাড়ে তিন টাকা—

মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে জি ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও
গুপ্তপ্রেশ, ৩৭।৭, বেনিয়াটোলা লেন, হইতে শ্রীকিশোরীমোহন নন্দী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

বিদ্রোহী বল্‌কান

সোফিয়ার পথে

কোনরূপ ভূমিকা না করেই বলছি, তুর্কীর সীমান্তে পৌঁছেই মনে হল আমি বিদেশের দিকেই অগ্রসর হচ্ছি। বিদেশে নিঃস্ব হয়ে ভ্রমণ করা যেমন তেমন, কিন্তু এ যে রাজার জাতের দেশের দিকে চলেছি! বুলগেরিয়া হতেই ইউরোপ শুরু হয়েছে! বাস্তবিকই মনটা যেন ছম্ ছম্ করে উঠল। মনে হল কি করে দিন কাটবে, ইউরোপের লোক কেমন হবে, ইউরোপের লোকের সঙ্গে কি করে খেতে এবং শুতে হবে ইত্যাদি নানা কথা। এরূপ চিন্তা মাথায় গজাবার একমাত্র কারণ হল, যে সকল ভারতীয় বিদ্বান্ এবং বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ইউরোপ ভ্রমণ করে বই লিখেছেন তাঁরা ইউরোপের মাহাত্ম্য এত বাড়িয়ে দিয়েছেন যে আমরা ইউরোপের কথা ভাবলেই যেন ঘাবড়িয়ে ভীত হয়ে পড়ি। তা ছাড়া ইংরেজ জাতের ভারতে পদার্পণের পর যে সকল ভারতীয় বুদ্ধিজীবী বৃটিশের সংস্পর্শে এসে ছিলেন তাঁরা গ্রামে গিয়ে ইংরেজ মাহাত্ম্য এমনই করে বলতেন যে, যার ফলে লোকের মনে ইউরোপীয়দের স্থান দেবতার স্থানের চেয়েও উপরে উঠেছিল। আমি সেরূপ আবহাওয়াতেই বর্দ্ধিত হয়েছিলাম। সেই জন্যই তুর্কীর সীমান্তে এসে থমকে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল।

১৯৩১ সালে চীনাদের অন্তর্বিপ্লব, মান্‌চুরিয়ায় জাপানীদের বিজয়ডঙ্কা শুনে, দুর্দান্ত বেদুইনের সঙ্গে থেকে, হৃত সাম্রাজ্যমদে মাতোয়ারা তুরুক্‌দের সংস্পর্শে এসেও মনে ভয় হয়নি। কিন্তু আজ এই বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রের একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম এবার আমি ইউরোপে যাচ্ছি। ভারতীয় বিলাত-ফের্তারা নাকিস্বরে যাকে বলেন 'বিলেত' গিয়েছিলুম আমি সেই বৃহত্তর বিলেতের দরজায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম এটাকেই বলে বিলাত যাত্রা। ইউরোপ হল বাবুদের স্বর্গভূমি আর দেশীয় রাজাদের পুণ্য অর্জনের স্থান। এরূপ স্থানে ভ্রমণ করতে পারব কি? যদি পারি তবে (গেট্ আউট্) শুনতে হবে কি? যখন এইভাবে আমি চিন্তা করছি তখন ফেজধারী একজন লোককে দেখে আমি আর না হেসে থাকতে পারলেম না। লোকটি বুলগেরিয়ার সীমান্তের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিল। ফেজ নানারকমের, ইউরোপের অনেক স্থানেই ফেজের প্রচলন আছে। কিন্তু লাল রঙের ফেজ তুরুকরাই ব্যবহার করত। এখন আসল তুর্কীর লোক তা পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু যে সকল তুরুক্ তুর্কীর বাইরে রয়েছে তারা সেই পুরাতনকে বিসর্জন দিয়ে নূতন আচার ব্যবহার গ্রহণ করতে পারছে না। ফেজ এখনও তাদের মাথার ভূষণ হয়েই রয়েছে এবং ফেজ ব্যবহারে যে সকল দোষ থাকে তা-ও পরিত্যাগ করতে পারেনি। ফেজ পরা লোকটিকে সাম্‌নে দেখতে পেয়ে ভাবলাম আমার মত অনেক দীন ভাবাপন্ন লোক-ও ইউরোপে রয়েছে তাই মনের সংশয় একেবারে দূর করে ফেলে দিয়ে এগিয়ে চললাম।

রাজা মহারাজারা বৃটিশ রেসিডেন্টকে দেখে ভীত হয়। ভীত হবার কথাই, কারণ রেসিডেন্ট ইচ্ছা করলেই রাজা মহারাজদের গদিচ্যুত করতে পারে। বড়বাবু বড়-সাহেবকে দেখে ভয় পায় চাকরী বজায় রাখবার কথা ভেবে। কিন্তু আমার সেরূপ ভয়ের কোন কারণ ছিল না। আমি পথের লোক, পথে চলব, ভয়ের কারণ কিসের?

প্রাচীর নানা রকমের হয়। জেলের প্রাচীর পার হ'তে গিয়ে অনেকেরই আরও বিপদে পড়ে। যারা পালাতে সক্ষম হয় তারাও নির্বিঘ্নে থাকতে পারে না। জেলের প্রাচীর ছাড়াও আর একটি প্রাচীর আছে, যাকে বলা হয় সীমান্ত প্রাচীর। সীমান্ত প্রাচীরের কথা ভারত-বাসী হালে জানতে আরম্ভ করেছে। পূর্বে এ সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। সীমান্ত প্রাচীর বড়ই শক্ত। এ প্রাচীর ডিঙানো বড়ই বিপদজনক। এ প্রাচীর ডিঙাতে হলে আদেশ নিতে হয়। বুলগেরিয়ার সীমান্ত প্রাচীর ডিঙাবার আদেশ আমি নিয়ে ছিলাম। আরও একটু এগিয়ে যাওয়ার পর তুর্কীর সীমান্ত শেষ হল, আরম্ভ হল বুলগেরিয়ার সীমান্ত। আন্তর্জাতিক নিয়ম মত উভয় সীমান্তের মধ্যে কতকটা জমি পতিত ফেলে রাখতে হয়। এই জমিটুকুকে বলা হয় (নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড) যার সঠিক বাংলা আজ-ও সাহিত্যিকরা লেখেন নি। আমি তাকে "কারো জমি নয়" বলব।

চোখ এবং কান আমার সজাগ ছিল। কানের ব্যবহার কমই করতে হয়েছিল। কিন্তু চোখের ব্যবহার ভাল ভাবেই করতে লাগলাম। "কারো জমি নয়" ভূমিখণ্ডের ভেতর দিয়ে অনেকগুলি একপেয়ে পথ দেখতে পেলাম। পথগুলি ব্যবহার হয় তা দেখলেই বোঝা যায়। কে পথ ব্যবহার করে এবং কখনই বা সে পথ ব্যবহার করা হয় তাই নিয়ে একটু চিন্তা করলাম। বুলগেরিয়ান্, গ্রীক্, রুমেনিয়ান্ প্রত্যেকেই নিজেদের সীমান্ত রক্ষা করতে ব্যস্ত, তবে কি তুর্কীর সীমান্ত রক্ষীরাও এদিকে চলাফেরা করে? বুলগেরিয়ার লোকও যদি এ পথ ব্যবহার করে তবে কারো কিছু বলবার উপায় নাই। কারণ এই ভূমিখণ্ড হল "কারো জমি নয়।"

"কারো জমি নয়" ভূমিখণ্ডের পাশ দিয়ে একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। নদীর জল ঘোলা। এ নদীর জল কল্ কল্ করে বয় না। নদীতে (শঙ্খচিল) জাতীয় পাখী উড়ছিল। নদীর বিশেষ বিশেষত্ব ছিল না, কিন্তু একটি বিশেষত্ব—সেটি হল নদীটি সীমান্ত প্রাচীর রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাষ্ট্রনীতিবিশারদ কূটনীতিকগণ নদীরূপে জনসাধারণের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। দাঁড়িয়েছিলেন এই ভয়ে, কি জানি মানুষে মানুষে মিল হয়ে যায়? মানুষে মানুষে যদি মিল হয়ে যায় তবে তাঁদের অস্তিত্বের দরকার হবে না। তখন বল্‌কানে আর যুদ্ধের আগুন প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে না। যুদ্ধের সময় ব্যবসায়ে বেশ লাভ হয়। যুদ্ধ বিগ্রহের অভাবে সে লাভও হবে না। মজুরকে কম মাইনে দিয়ে খাটানো চলবেনা। নদী হচ্ছে পৃথিবীর সৌন্দর্য। কিন্তু যে নদী সীমান্ত হয়ে প্রাচীর রূপে দাঁড়িয়ে থাকে সে নদী ভয়াবহ। আমাকে নদী পার হতে হবে না। নদীর পাশ দিয়েই পথ, সেই পথ দিয়ে আমি চলেছিলাম। সীমান্ত নদী চোখে পড়ল বলেই দু-একটি কথা নদী সম্বন্ধে বলতে হল।

"কারো জমি নয়" ভূমিখণ্ড পেরিয়ে যাবার পরই সামনে একখানা ঘর দেখতে পেলাম। ঘরের পাশেই একটা বড় পাইন গাছ পুঁতে তারই উপর বুলগেরিয়ার পতাকা টাঙিয়ে দেওয়া

হয়েছে। দূর থেকে পতাকা দেখতে বেশ ভালই লাগছিল। উপরের দিকে পতাকা লক্ষ্য করে কখন যে সীমান্ত রক্ষীদের ঘরের কাছে এসে পড়লাম সে দিকে আমার মোটেই খেয়াল ছিলনা। আমাকে দেখতে পেয়ে দুজন সেপাই ছুটে এসে "পাছিপোর্ত" বলে চীৎকার করতে লাগল। আমি তাদের হাতে "পাসপোর্ট"খানা দিয়ে ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম।

অফিসারগুলি বেশ ভাল করে আমার পাশপোর্ট পরীক্ষা করল তারপর ম্যনি-ব্যাগ, চাইল। আমি ম্যনিব্যাগ তাদের হাতে দিলাম। ম্যনিব্যাগে যত টাকা ছিল তার একটা লিষ্ট করা হল। লিষ্টের একখানা কপি আমাকে দেওয়া হল। আমি তা ভাল করে দেখে পাসপোর্টের ভেতরেই রেখে দিলাম। তারপর বাইসাইকেলের কি করা হবে না-হবে তাই নিয়ে তারাই আলোচনা করতে লাগল। আমি বাইরে এসে কতকগুলি লোককে বিশ্রাম করতে দেখলাম। এতে স্ত্রী পুরুষ উভয়ই ছিল। স্ত্রীলোকের পর্দা ছিলো, তাঁদের মাথায় সালু বাঁধা ছিল, গায়ে কোট এবং পরণে লম্বা গাউন্, পায়ে মোজা এবং অপরিষ্কার জুতা থাকার জন্য পায়ের গঠন ভাল করে বুঝতে পারছিলাম না। তবে প্রত্যেকটি রমণীর মুখের উপর অতিপরিশ্রমের একটি ছাপ সুস্পষ্ট। এখানকার মেয়েদের নাক লম্বা নয়, তাদের নাক বেশ পাতলা সূক্ষ্ম এবং ছোট ও পাতলা এবং হাঁ, মুখ ছোট। নরডিক্ ছাপ্ এদের মুখের উপর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছিল। পুরুষগুলি দেখতে বেশ বলিষ্ঠ, তবে তাদের শরীর অনেকটা গ্রীক্‌দের মত রুক্ষ ছিল। তাদের পোষাক ছিল পুরাতন তুরুক্ ধরণের এবং মাথায় নাইট্ ক্যাপ্।

এখানেও তুর্কীর মতই বাইসাইকেল সঙ্গে করে নেবার জন্যে ছাব্বিশ টাকা (দুই পাউণ্ড) জমা দিতে হল। একজন অফিসার একটু রহস্য করে বল্লেন, 'জানেন মশাই জার্মাণী থেকে অনেক পৃথিবী-পর্যটক বুলগেরিয়াতে এসে সঙ্গের সাইকেল বিক্রি করে রেলগাড়িতে করে ফের জার্মাণীতে ফিরে যায়। জার্মাণীতে সাইকেল সস্তা, আর এখানে সাইকেল জার্মাণীর দ্বিগুণ দামে বিক্রি হয়। জার্মাণদের এরূপ অন্যায় ব্যবসা প্রতিরোধ করার জন্যেই নতুন আইন হয়েছে। আপনাকেও সে আইন মানতে হবে।' বুলগেরিয়ার নতুন আইন প্রতিপালন করার জন্য দুটি ইংলিশ পাউণ্ড দিয়ে সাইকেলের একখানা ত্রিপ্ টিক্ (ট্রিপ টিকেট্) নিলাম। বুলগেরিয়া ভ্রমণ হয়ে গেলে, যখন বুলগেরিয়ার সীমান্তে পৌঁছব, তখন ট্রিপ্ টিকেটের বাবদ গচ্ছিত দুটি পাউণ্ড ফিরে পাব, একথাটা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বুলগেরিয়াতেও ন্যাশনেল-সোসিয়েলিজমের পত্তন হয়েছে। আমার কাছে যত টাকা পয়সা ছিল তার লিষ্ট করে লিষ্টখানা পাশপোর্টে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সীমান্তের কাষ্টম্ অফিসার বুঝতে পেরেছিল আমি ভিক্ষা করেই ভ্রমণের খরচ যোগাচ্ছি। ভিক্ষার ধন যাতে শুধু চর্বণ করেই শেষ করি—কিছুই যেন সঞ্চয় করে অন্য দেশে নিয়ে না-যাই সে সুব্যবস্থার জন্য আমার সঙ্গে যে ধনরত্ন ছিল তার লিষ্ট করা হয়েছিল। বাস্তবিক বুল-গেরিয়ার পক্ষে ন্যাশনাল-সোসিয়েলিষ্ট হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। বুলগেরিয়ার চাষা এবং মজুররা নিজের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন। সচেতন মজুর চাষাকে শান্ত করে রাখতে হলে তাদের আহার, নিদ্রার দিকেও দৃষ্টি রাখতে হয়! এই সুব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য নানা রকমের

নিয়মকানুন সৃষ্টি করা হয়েছিল। বিদেশী মজুরকে কাজ দেওয়া হ'ত না, পাছে বিদেশী ভিখারী ভিক্ষা করে টাকা নিয়ে গেলে এদেশের ক্ষতি হয়, সেজন্তে নানারূপ ফন্দী পাতা হয়েছিল। তার দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখতে পেলাম এবং মনে মনে হাসলাম। অফিসারদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম। নতুন দেশের অভিজ্ঞতা আমার পথকে বিচিত্র করে চলল প্রতিপদে।

গ্রাম নিকটে। পথের দুদিকে সুন্দর বৃক্ষরাজি দাঁড়িয়ে আছে। প্রাকৃতিক পথ, এ পথে চলতে বেশ ভাল লাগছে। মৃদু মন্দ শীতল বাতাসে চলবার শক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাইরে থেকে গ্রামের দৃশ্য বেশ মনোরম মনে হয়। বৃক্ষরাজি ভেদ করে কয়েকখানা ঘরের টাইল যেন চুপি দিয়ে দেখছিল। আমার মনে ইউরোপ দেখার প্রবল বাসনা থাকায় সবই যেন সুন্দর দেখায়।

ক্রমেই গ্রামের কাছে আসতে লাগলাম, হঠাৎ পথটা বেঁকে গেল। যে স্থানে পথটা বেঁকে গেছে তার ডান দিকে একটা ছোট টিলা। টিলা থেকে অনেক মাটি কাটা হয়েছে। এটা ইউরোপের মাটি। এর মূল্য আছে, তাই মাটির নমুনা দেখতে দাঁড়ালাম। মাটি লাল, প্রচুর বালুকণা এবং পাথর তাতে রয়েছে। দু'হাত নীচেই শক্ত পাথর। বেশীক্ষণ আর দাঁড়ালাম না। আর একটু এগিয়ে গিয়েই কতকগুলি ঘর দেখতে পেলাম। ঘরগুলি আমাকে আকৃষ্ট করেছিল।

যে দিক্ দিয়ে বড় পথটা চলে গিয়েছে তারই বাঁদিকে আর একটা পথ নীচের দিকে চলে গেছে। আমি বড় পথ পরিত্যাগ করে নীচের দিকের পথ ধরে সেই ঘরগুলির দিকে চললাম্। পথে দেখা হল একটি যুবতীর সঙ্গে। যুবতীর যৌবন কানায় কানায় ভ'রে উঠেছে। যুবতী আমাকে দেখে দাঁড়াল। আমি সাইকেল থেকে নামলাম এবং টুপি খুলে তাকে সম্মান দেখালাম। যুবতীর পরণে ঘাঘ্‌রা, অবিকল গুজরাটী ধরণের। তবে পেটটা বেরিয়ে পড়েনি। পেটটা বস্ত্রাবৃত। পায়ে ছেঁড়া মোজা এবং জুতার হিল ছিল না। মাথার কালো চুল স্তন স্পর্শ করে আরও নীচে কোমর পর্যন্ত এসেছে। চুল বেণীবদ্ধ ছিলনা। মাথায় একখানা পৃথক রেশমী কাপড় দিয়ে ঢেকে গলার কাছে এনে বেঁধে রাখা হয়েছে। যুবতী মৃগাক্ষী এবং দৃষ্টি চঞ্চল। রং শ্যামবর্ণ, যুবতীর যৌবন যতটুকু আকৃষ্ট করেছিল, তারচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছিল তার শরীরের রং। যুবতীকে কিছুই বলার ছিল না, কারণ তখন সব সময়ের জন্যই যুবতীর প্রেম থেকে দূরে থাকতাম্। আমি আবার যুবতীকে নমস্কার করে তার গ্রামের দিকে গেলাম। গ্রাম বেশী দূরে নয়। গ্রামে সারি দিয়ে ঘর। প্রত্যেক খানা ঘর দেখে মনে হল আমি কোনও বিশিষ্ট বাঙালী গ্রামে এসেছি। তবে বাঙালী গ্রামে শূকর দেখতে পাওয়া যায় না। কেবল গরু, হাস, মোরগ, ছাগল, ভেড়া এসব দেখতে পাওয়া যায়, এখানকার সঙ্গে তারপার্থক্য হল, এখানে শূকরও রয়েছে। অনেকগুলি ঘরের গঠন আবার আমাদের দেশের ঘরের গঠনের সঙ্গে এমন সুন্দর ভাবে মিলে যায় যে মনে হয় যেন নিজের গ্রামেরই কোথাও এসেছি। দু-চালা ঘর, দুটো চালই বাঁকা এবং মাঝখানটা উঁচু। ঘরের চালাগুলির শেষ খান্টা অর্দ্ধ বৃত্তাকারে রয়েছে। আমাদের দেশের অনেক পুরাতন মন্দির এবং গরীব লোকের

ঘরের চাল এখনও সেরূপ আছে। ঘরের সামনের দরজা ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত। ঘরগুলি দেখে মনে হল এরা ইউরোপের উন্নতির সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারিছে না, এটা ওদের দারিদ্র্যের দোষ নয়, দোষ ওদের স্বভাবের।

গ্রাম দেখে ফিরলাম। পথে এসে ভাবলাম গরু, ভেড়া, শূকর এইসব জন্তু দেখলাম, এই দুধ ত দেখলাম না। প্রথম একবার ইচ্ছা হল গ্রামে ফিরে যাই কিন্তু এরপর আর গ্রামে যেতে ইচ্ছা হল না, চলে এলাম স্লাভ গ্রামে।

স্লাভ গ্রামের দুদিকে সারি দিয়ে ঘর। ঘরগুলির প্রায় সবই দোকান। দোকান ঘরগুলি নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। এর মাঝে কতকগুলি হ'ল খাবারের দোকান। খাবারের দোকান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি দোকানে শুধু গব্য বিক্রয় হয়, যেমন দই, গরম দুধ, ঠাণ্ডা দুধ, ক্রিম, সর, পনীর ইত্যাদি। এই দোকানগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সজ্জিত। দোকানে প্রবেশ করা মাত্র যা চাও তাই দোকানী কাঁচের পাত্রে এনে দেয়। হাত মোটেই ব্যবহার করতে হয় না। চামচে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়। চামচেগুলি ওজনে ভারী এবং দেখতে চক্‌চক্ করে।

শহরে প্রবেশ করেই একটা গব্যের দোকানে গিয়ে আধসের মত দই দিতে বললাম। অবশ্য কথা হচ্ছিল ইঙ্গিতে। দোকানী দই দেবার আগেই দাম চেয়ে বসল। আমি তার হাতে একটি তুর্কীর পাউণ্ড দিলাম। সে পাউণ্ডটি হাতে নিয়ে বলল "মঁসিয়ে ইসি বুলগার রিস্কি নাই তুরকীয়া, দনে দিনার নাই লিড়া।" এর মানে হল—এটা বুলগেরিয়া, তুর্কী নয়। লিড়া নিয়ে দিনার দিন। আমার কাছে দিনার ছিল না। সে জন্যেই বোধ হয় দোকানী আমাকে ব্যাঙ্ক দেখিয়ে দিতে বাধ্য হল। আমি ব্যাঙ্কে গিয়ে দুটি তুর্কীর পাউণ্ড বদল করে এসে আবার দইয়ের দোকানে প্রবেশ করলাম। দোকানী এবার আমাকে দই, দুধ, পনীরসামান্য চিনি এবং একটা রুটি এনে দিল। পেট ভরে খাবার খেয়ে যে সময়ে আমি দোকান থেকে বের হয়েছি ঠিক সে সময়ে আমাকে একটি ছাত্র সাদর অভিনন্দন জানাল।

ছাত্রটি যুবক, তার চুল ছোট করে কাটা। ইউরোপের প্রায় দেশের ছাত্রেরাই চুল ছোট করে কাটে। চুল ছোট করে কাটলে মুখের স্বাভাবিক অবস্থা ঠিক করে ধরতে পারা যায়। লম্বা এবং ফ্যাশন করে চুল কাটলে অনেক সময়ই যুবকদের শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা বুঝতে পারা যায় না। চীনা, জাপানী এবং ফিলিপাইনের সৈনিক ছাত্ররা চুল ছোট করে কাটতে বাধ্য হয়। আমার এই ছাত্র বন্ধুটি সোফিয়া থেকে এসেছিল। সে আমেরিকান্ মিশনারী স্কুলে পড়ত। যুবকের মা বাবা গ্রীক অঞ্চল থেকে এখানে এসে বসবাস করছে। ছাত্রটি জাতে ম্যাসিডোনিয়ান্।

ছাত্রটি বেশ ইংলিশ বোলতে পারে। আমরা যাকে ইংলিশ বলি বলকানে তাকেই বলা হয় এমেরিকান্। যুবকের শিক্ষা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। কাজকর্ম খুব কমই ছিল। আমি তাকে একটি হোটেল ঠিক করে দিতে বললাম! সে আমার কথায় রাজি হ'ল এবং তৎক্ষণাৎ কাছের একটি হোটেলে নিয়ে গেল। হোটেলের মালিক আমাকে একখানা সুন্দর রুম-

দেখিয়ে বললো, এই রুমের জন্য দৈনিক কুড়ি দিনার করে দিতে হবে। কুড়ি দিনার আমাদের দেশের পাঁচ আনার মত।

হোটেলটি দ্বিতল। উপরের তলায় পাঁচ খানা রুম। আমাকে যে রুমটি দেওয়া হয়েছিল তা রং করা ছিল। রং সাদা। আঙুল দিয়ে রংটা পরীক্ষা করলাম। দেখলাম রং করাই বটে। এরূপ সুন্দর করে রং-করা রুম ভারতে খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপের লোক কারো বাড়িতে গিয়ে অতিথি হয় না, তারা বিদেশে গিয়ে হোটেলেই থাকতে চায়। আমাদের দেশে হোটেলে গিয়েও শান্তি পাওয়া যায় না। বাড়ি থেকে বিছানা ঘাড়ে করে নিতে হয়। ইউরোপে বিছানা ঘাড়ে করে নিতে হয় না, প্রত্যেকটি রুমে একটি করে সজ্জিত বিছানা থাকে। অনেকে হয়ত বলবেন এরূপ বিছানায় কি শোয়া উচিত? তার উত্তরে বলব, যারা আমাকে এরূপ প্রশ্ন করেছেন তাদের বাড়িতে ইউরোপের পাঁচ আনা দৈনিক ভাড়ার বিছানা না থাকবারই কথা। ইউরোপে লোক হোটেলে থাকে বলেই, হোটেল-চার্জ এত কম।

রুমটাতে তিনটি খিড়কি দরজা। রুমে বেশ বাতাস খেলে। দুখানা চেয়ার, তাও দেখবার মতই এবং আরাম দায়ক। যে দুখানা টেবিল ছিল তার টেবিল ক্লথ বেশ মূল্যবান। তারপর রয়েছে বেশিন, গামছা, গরম জলের ঘটি, যাকে ইংলিশে বলা হয় "জার"। এত সুন্দর এত পরিষ্কার তাকিয়া আটা, দুগ্ধ ফেননিভ বেড্‌সিট্ সন্নিবিষ্ট বিছানা এত সস্তায় এক দিনের জন্য কি করে দেওয়া যেতে পারে তারই কথা অনেকক্ষণ ভাবতে হয়েছিল। আমার মামুলি কয়েকটি জিনিস রেখে ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলাম এখানে কি ছাপাখানা আছে? ছাত্রটি বলল্ কিসের জন্যে বলুন ত? আমি তখন আমার আসল কথা তাকে বললাম—দেখ ভাই বিদেশে বের হবার বেলা একটি পয়সা নিয়েও বের হইনি। চলবার পথে যে কোন দেশ আসুক সে দেশের লোকের উপরই আমাকে নির্ভর করতে হয়। সেজন্য পোস্টকার্ড ছাপান দরকার। আমি ত বুলগেরিয়ার ভাষা বলতে পারি না, ছাপানো পোষ্টকার্ড ভিক্ষা পত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

যুবক আমার কথা শুনে একটু চিন্তা করল, তারপর আমাকে নিয়ে একটি ছাপাখানায় গেল। প্রেস্‌ম্যান্ এবং তার মধ্যে কি কথা হল, তারপর সেই যুবক বলল "বুঝতে পেরেছি আপনি প্রলিটারিয়েট্", আপনাকে সবাই সাহায্য করবে। প্রেস-ওয়ালাও কিছু সাহায্য করবে। বিকালে এসে পোস্টকার্ড নিয়ে যাবেন এবং আমি আপনাকে লোকের কাছে পরিচয় করিয়ে দেব"। ছাত্রটি আমার কাছ থেকে বিদায় নিল। আমি রুমে এসে শুয়ে রইলাম এবং ভাবলাম এরা আমাকে সর্বহারা ঠিক করেছে। পৃথিবীর সর্বত্রই সর্বহারার দল রয়েছে। এখানেও আছে। প্রেস্‌ম্যান্ এবং ছাত্র উভয়েই খাঁটি মজুর। প্রেসম্যান্ প্রেসে কাজ করে আর ছাত্র থাকে তার বাবার ঘরে। ছাত্রের পিতার নিজের ঘর নাই। অন্য একজন দয়াকরে থাকতে দিয়েছে। সেই লোকটি হ'ল একজন চাষী। যদি ছাত্রটির বাবা চাষার জমিতে কাজ না করে তবে ঘর হতে তাড়িয়ে দেবে। তখন ছেলে মেয়ে নিয়ে ক্ষেতের মজুরকে পথে দাঁড়াতে হবে। অন্য কাজ না পাওয়া পর্যন্ত পথে দাঁড়ান ছাড়া

ছাত্রের বাবার বাবার আর স্থান নেই। একেই বলে সর্বহারা। ভারতে এমন লোক কজন আছে?

অনেক সর্বহারা, কিন্তু নিজেকে সর্বহারা বলে ভাবতে শেখেনি। তারা ভাবে এটা হ'ল তাদের পাপের ফল। ভগবানই তাদের দরিদ্র করেছেন আবার ভগবান যখন খুশি হবেন তখন তাদের সুদিন আসবে। তারা-ও ধনী হবে। তারা-ও অপরের উপর কর্তৃত্ব করবে, তারা-ও সুখী হবে। কি করে মানুষ সর্বহারা হতে বাধ্য হয়, কি করে এই সর্বহারা মানুষ নিজের রক্ত জল করেও উপযুক্ত মজুরি পায় না, এই সত্যকথা যারা অবগত হয়েছিল এবং অপরকে বলার চেষ্টা করত তাদের বুলগার সরকার বেশ শাস্তি দিতেন এবং "ভলসী" বলে অবিহিত করতেন।

ভলসী বলে পরিচিত হওয়াটা তখন বড়ই বিপজ্জনক ছিল। ভলসীদের যদি কেউ পথে এনে লগুড়াঘাত করত, নানা রকমে অত্যাচার করত, তবে সেই অত্যাচারীকে কেউ কিছু বলত না, কারণ ভলসীরা ভগবানে বিশ্বাস করে না। যারা ভগবানে বিশ্বাস করে না তাদের হত্যা করলে পাপের ভয় নাই। সরকার যেমন বিদ্রোহীদের নিপাত করেন ভগবানও তেমনি তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের অত্যাচার করলে কিছুই বলবেন না। এরূপ ধরণা যাতে লোকের মনে বদ্ধমূল হয় তারই চেষ্টা চলছিল। সকল দেশের শাসক সমাজের এই মনোভাব।

পাঁচটা বেজেছে। বেড়াবার জন্যে দলে দলে লোক ঘর খালি করে স্ত্রী-পুরুষ ছেলেমেয়ে পথে বের হয়েছে। ছোট গ্রামের ফুটপাথ অসম্ভব প্রশস্ত। ফুটপাথের উপর দিয়েই লোক চলাফেরা করে। ট্রাফিক্ তত নাই। ইচ্ছা করলেই তারা পথের মধ্য দিয়ে হাঁটতে পারে। তবুও তারা ফুটপাথের উপর দিয়ে হাটছে, তার কারণ কি? আর ঐ জিপ্‌সিরা যাদের আচার ব্যবহার আমাদের সঙ্গে মেলে, শরীরের রং আমাদের মতই যাদের—ভাষার সঙ্গে আমাদের বেশ সম্পর্ক রয়েছে, তারা হাঁটছে পথের মাঝ দিয়ে। কেন তারা এমন করছে? শিক্ষার অভাব প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হল রাষ্ট্রনীতি নিয়ে তারা মাথা ঘামায় না। তারা হল "নন পলিটিকেল্"। কাজ করার পর ঘরে এসে কিছু খেয়ে, হয় ভগবান চর্চা, নয় তাস খেলে এর বেশী যদি কিছু করে তবে মদের দোকানে বসে আড্ডা দেয়, এর বেশী কিছু নয়। রাষ্ট্র-নৈতিক দায়িত্ব জ্ঞান যাদের নাই, চিরাচরিত প্রথামত যারা চলতে ভালবাসে, তারা কাপুরুষ হয়ে জন্মে না, তবে মরে কাপুরুষ হয়ে।

আমি তখন-ও ঘুমাচ্ছিলাম। হঠাৎ শুনলাম কে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। দরজা খুলে দেখি পূর্ব-পরিচিত ছাত্রটি আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। সর্বপ্রথম আমরা প্রেসে গেলাম এবং প্রেস হতে পোস্টকার্ডগুলি এনে খাবারের দোকানে গিয়ে বিলি করতে লাগলাম। প্রত্যেকেই আমাকে সাহায্য করতে লাগল। তবে সাহায্যের পরিমাণ অল্প। ভিক্ষা শেষ করে রুমে এসে গুণে দেখলাম দু'পাউণ্ড-এর মত পেয়ে গেছি। তৎক্ষণাৎ ঘরের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে বেশ করে স্নান্ করে নিলাম। যদি-ও স্নান করার কোন দরকার মনে করছিলাম না, তবুও শীতের দেশে যারা কায়িক পরিশ্রম করে তাদের সপ্তাহে তিনবার স্নান করা কর্তব্য।

ছাত্রকে নিয়ে আমি বের হলাম একটি পাঠচক্রে। আমাদের দেশে সেরূপ পাঠচক্র আছে কিনা তা আজ পর্যন্ত আমি দেখিনি তবে কতকগুলি লোক কয়েকখানা বই সামনে রেখে হাউমাউ করতে দেখেছি এবং সেই হাউমাউ করাতে যোগও দিয়েছি। এখানের পাঠচক্র অন্য রকমের।

পাঠচক্রে এসে বুঝলাম, পাঠচক্রের ছাত্রাদের মধ্যে ঠিক হয়ে গেছে যে যুগোশ্লোভিয়া, গ্রীস এবং রুমেনিয়ায়, বুলগেরিয়ার যে অংশ ভার্সাই সন্ধির ফলে দখল করেছে তা ফেরৎ পেতে হবেই। এই পরিবর্তন যাতে সত্বর হয় সেজন্য দুটি মতে কাজ আরম্ভ হয়েছিল। একটি হ'ল ন্যাশনালিজমের ভেতর দিয়ে আর অন্যটি হ'ল কমিউনিজমের সাহায্য নিয়ে। কমিউনিজম প্রচার করা তখনকার দিনে আইন বিরুদ্ধ ছিল। সেজন্য সে পথে প্রকাশ্যে কেউ যেত না। তবে অপ্রকাশ্যে বেশ কাজ চলত। দুই রকমের কেন কাজ চলছিল তা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। রাজা বুরিশ এবং তার মন্ত্রীরা যাদের পরামর্শে চলেন তাঁরা চান তুরুক, গ্রীস সার্ভিয়ান এবং রুমেনিয়ানদের সঙ্গে কোনরূপ আপোষ না করে যুদ্ধের দ্বারা ভার্সাই সন্ধির ফলে যে রাজ্য হাত-ছাড়া হয়েছে তা উদ্ধার করা এবং দেশকে যুদ্ধে জড়িয়ে রাখা। ভার্সাই সন্ধির ফলে বৈদেশীক কুচক্রী সামাজ্যবাদীরা একের রাজ্য অন্যকে দিয়েছে এটা সকলেই জানত এবং লিগ অব নেশন্ যে একটা বাটপাড়ের আড্ডাস্থল তা ইউরোপের লোক সর্বত্রই বলা কওয়া করত। যাতে করে এই বাটপাড়ের দল আর কোন অন্যায় কাজ না করতে পারে সেজন্য বলকান্ দেশগুলিতে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছিল। সেই প্রতিষ্ঠানের কাজই হচ্ছিল শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে অনবরত প্রোপাগণ্ডা করা। এদিকে শাসক শ্রেণীও যাতে যুদ্ধ বিগ্রহ লেগেই থাকে তার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য কাউণ্টার প্রপাগণ্ডা করত।

এই দুটি নীতির শেষের নীতিটি আমি পছন্দ করতাম। এবং আমার ছাত্র বন্ধুটিও শেষের নীতিটিরই একজন কর্মী ছিল সেজন্য আমাদের মধ্যে বেশ একটা প্রীতির বন্ধন হয়ে গিয়েছিল। ছাত্র আমাকে জানাল, সে আমাকে যতটুকু পারে ততটুকু সাহায্য করবেই। আমি এই ধরণের ছাত্রদের বেশ ভাল করেই জানতাম তাই বললাম "ছাত্রবন্ধু দয়া করে-তুমি আমার চোখের ঠুলি হয়ো না।

"যদি তোমরা আমার চোখের ঠুলি হয়ে দাঁড়াও তবে কিছুই দেখতে পাবনা। বোধহয় তোমরা জাননা, ইউরোপ সম্বন্ধে আমাদের কতবড় উচ্চ ধারণা রয়েছে। যাতে করে আমি সেই তথাকথিত উচ্চ ধারণার আসল তথ্য সংগ্রহ করতে পারি, আশাকরি বুলগেরিয়ার ছাত্র সমাজ আমাকে সেদিকেই সাহায্য করবে। পলিটিক্স-এর দিকটা ছেড়ে দিয়েও যদি আমি ইউরোপের কিছুটা জানতে পারি তবেই হবে আমার ভ্রমণের সার্থকতা।

বুলগার যুবক আমার কথায় রাজি হল এবং যাতে করে আমি ইউরোপ ভাল করে দেখতে পারি সেজন্য সুব্যবস্থা করবে তার-ও আভাস দিল।

পাঠাগার থেকে বেরিয়ে এসে আমরা স্থানীয় পুলিশস্টেশনে গেলাম। পুলিশের বড়কর্তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য এসেছি বলে জানালাম। পুলিশের বড়কর্তা তখন কতকগুলি ব্যবসায়ীর সঙ্গে বসে কথা বলছিলেন। আমার আসার সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ আমাকে

ডেকে পাঠালেন। ছাত্রসাথীকে আমি সঙ্গে করে নিয়ে চললাম। পুলিশ তাতে বাধা দিল। ছাত্র বন্ধুকে বললাম "বুঝিয়ে বল আমি ফ্রেন্চ জানিনা। তোমার সাহায্য না নিলে আমার একটা কথাও তারা বুঝতে পারবে না।"

পুলিশ তাদের বড়কর্তার কাছে ফিরে গেল এবং আমি যা বলেছি বোধহয় বলেছিল। বড়কর্তা ছাত্রবন্ধুকে সাথে করে নিয়ে যাবার আদেশ করলেন। আমরা উভয়ে বেশ বড় একটা আঙিনায় গেলাম। আঙিনায় সুন্দর ঘাসের উপর কয়েকখানা চেয়ার বিন্যস্ত ছিল। বয় মস্ত বড় একটা কাচের কলসে করে বিয়ার নিয়ে তাদের শূন্য গ্লাস ভর্তি করে দিচ্ছিল। আমাদের দেখা মাত্র পুলিশের বড়কর্তা দু'খানা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললো। আমরা বসার পরই দু'গ্লাস বিয়ার এনে দেওয়া হল। আমরা গ্লাস উঠিয়ে সকলের স্বাস্থ্য কামনা করলাম, এরপর বিয়ারের গ্লাসটি প্রায় অর্ধেক শেষ করে টেবিলে উপর রাখলাম। এক চুমুকে আধ গ্লাস বিয়ার খেয়ে ফেলা বড়ই অন্যায় কাজ সে কথাটা আমার জানাছিল, তবুও অন্যায় কাজটি ইচ্ছা করেই করে ফেললাম। আমার এরূপ অন্যায় কাজটি পুলিশ অফিসার সহ্য করলেন না, তিনি কি বললেন এবং আমার ছাত্রবন্ধু তাই অনুবাদ করে আমার কাছে তাঁর বক্তব্য বিষয় বলল। আমি আর বসতে পারলাম না দাঁড়িয়ে বললাম "মাননীয় অফিসার, আপনি নিশ্চয়ই জানেন আমি একজন ভারতবাসী। বৃটিশের প্রজা আমরা। আমরা ধর্ম নিয়ে চর্চা করতে পারি, একে অন্যের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করতে পারি, ভূত আছে বলে লেকচার দিতে পারি, হাত দেখে মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারি কিন্তু বিয়ার প্রস্তুত করার অধিকার আমাদের নাই। আমাদের যদি বিয়ার খেতে হয় তবে আমরা বৃটিশের তৈরী অথবা জার্মান বিয়ার পাই। আপনাদের দেশের বিয়ার অতীব সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যপ্রদ, সেজন্যই এক সঙ্গে এতগুলি বিয়ার খেয়ে ফেয়েছি, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন।"

অফিসার আমার কথা শুনে আর কিছুই বললেন না, আমাকে চেয়ারে বসিয়ে নিজের হাতে গ্লাস ভর্তি করে দিতে লাগলেন আর আমি খেয়ে যেতে লাগলাম। এক সঙ্গে আট গ্লাস বিয়ার খেয়ে একটা বুলগার সিগারেট ধরিয়ে বললাম, "এখন কথা বলুন, খালি পেটে কথা বলে ভারতের সন্ন্যাসী, আমি সন্ন্যাসী নই, পাঠক মাত্র, খালিপেট আমি মোটেই পছন্দ করি না।"

অফিসার আমার ভ্রমণ কাহিনীর কিছুটা জানতে চাইলেন। যখন শুনলেন আমি চীন ভ্রমণ করে এসেছি তখন অফিসার আমাকে সেদিনের মত বিদায় দিয়ে পরদিন সকালে তার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। তিনি ভেবেছিলেন আট বোতল বিয়ার খেয়ে আমি মাতাল হয়েছি, কিন্তু বুলগার অফিসার জানতেন না, আমি তার দশগুণ বেশি মাইনে পেতাম এবং প্রত্যহ "আন্‌জিন মার্কা" মানে স্টভিট বিয়ার পাঁচ থেকে নয় বোতল খেয়েও টাইপ রাইটিং মেশিনে সুন্দর এবং সরল ভাবে মিনিটে পঁয়ত্রিশটি শব্দ টাইপ করতে পারতাম। আমরা সসম্মানে অফিসারের বাড়ি থেকে বিদায় নিয়ে রুমে এসে বসলাম।

রুমে এসে ছাত্রটির পরিচয় নেওয়া উচিত ভেবে তার কলেজের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল সোফিয়ার আমেরিকান কলেজ থেকে ইংলিশে সে ম্যাট্রিক পাশ করে এখন

ইন্‌জিনিয়ারিং শিখছে। তার বাবা তাকে জার্মানীতে পাঠাতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে তা পছন্দ করেনি, সোফিয়াতেই সে তার শিক্ষার সমাপ্তি করে, বুলগার জাতের সেবার্থে নিজেকে বিলিয়ে দেবে। নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া কথাটা বড়ই বড় কথা, কিন্তু যুবকের কথার ভাবে বুঝলাম, যদি সুযোগ এবং সুবিধা পায় তবে রাজা বুরিশের বিরুদ্ধাচরণ করাই হ'ল তার জীবনের লক্ষ্য। বুলগেরিয়া স্বাধীন দেশ। যতদূর জানি রাজা বুরিশ অত্যন্ত ভাললোক, শাসনতন্ত্র-ও দূর থেকে বেশ ভালই মনে হয়, তবে এই বিদ্রোহের কারণ কি?

বিদেশে গিয়ে বেশী কথা বলতে নেই। আমরা হলাম বৃটিশ-প্রজা। আমাদের কথার কোন মূল্য নাই বটে তবে অপরের সর্বনাশ আমরা করতে পারি। সেজন্যই যুবকের সঙ্গে এবিষয়ে আর কথা না বলে অন্য কথা বলতে আরম্ভ করলাম। যুবকও পলিটিক্স চর্চা করতে যেন একটু সঙ্কোচ মনে করল। সেদিনের মত যুবকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

যুবকটি এবার ফাঁদে পড়েছে। আমাকে এবার তার পরিচয় পুলিশের কাছে দিতে হবেই। পুলিশের কাছে যুবকের পরিচয় কি করে দেব সেকথাটাই যুবক আমাকে সকাল বেলা ভাল করে বুঝাতে লাগল। যুবক যে সকল কথা আমাকে বলতে বলেছিল তা এতই অসঙ্গত ছিল যা বললে আমাকেই বিপদে পড়তে হ'ত। সুখের বিষয় যুবকটি জানত না, পরাধীন দেশের লোক আর কিছু না জানুক মিথ্যা কথা বলতে বেশ জানে। যুবক যা ভেবে গতকল্য রাত্রে ভাল করে ঘুমাতে পারেনি সে কথাটাই পুলিশ অফিসার সর্বপ্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। সে কথার জবাব অতি সংক্ষেপ এবং সরল ছিল। আমি বললাম, ব্যাঙ্কে দাড়িয়ে "কেউ ইংলিশ বলতে পারেন বলে যখন সাহায্য চেয়েছিলাম তখন এই যুবক সাড়া দিয়েছিল, সেই সূত্রেই এই যুবকের সঙ্গে আমার পরিচয়।"

যুবক যখন আমার কথা অনুবাদ করে বলছিল তখন আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছিলাম। তার মুখ পরিস্কার হয়েছিল। সে কথাটা বলেই আমার দিকে চেয়ে বলল "যা বলেছেন তা আমি বলেছি, আর কিছু যদি বলার থাকে তবে বলুন।"

আমি বললাম, "আমার বলার মত আর কিছুই নাই।"

অফিসার আমাদের বিদায় দেবার পূর্বে চারশ কুঁড়িটি দিনার দিয়ে আমাকে বিদায় দিলেন। চারশ কুড়ি দিনারে এক স্টারলিং হ'ত। প্রকৃত পক্ষে বুলগেরী মুদ্রাকে দিনার বলে না, চলতি কথায় দিনার বলে বলেই আমিও দিনার শব্দই ব্যবহার করলাম। দিনার কথাটা হ'ল আরবী! বর্তমানে :ইরাকে পাউণ্ড শিলিং ব্যবহার হয়। ইরাকীরা ইংলিশ পাউণ্ডকেও দিনার বলে।

চীনের ভ্রমণ কথা পুলিশ অফিসার শুনতেও ভয় পেয়েছিলেন। ভয় পাবার কথাই কারণ চীন দেশে বিদ্রোহের ভেতর দিয়েই গণ স্বাধীনতা কায়েম করতে পেরেছিল। তখনকার দিনের চীনদেশ সম্বন্ধে ধনী পরিচালিত দেশগুলি নীরব থাকতেই ভালবাসত। কি জানি চীনের অনুকরণ করে ধনী পরিচালিত দেশগুলিতে আবার বিদ্রোহ জেগে ওঠে, এটাই ছিল তাদের ভয়ের কারণ।

আমার হাতে অনেক টাকা হয়েছে দেখে বুলগার যুবক সুখী হ'ল। আমি তাকে নিয়ে একটি বড় হোটেলে বসিয়ে নানারূপ খাদ্য খাওয়ালাম এবং বল্লাম, "দেখলেত ভায়া এরা বিদেশের কথা শুনতেও ভালবাসে না।"

যুবক আমার কথায় উত্তর না দিয়ে শুধু বল্ল "মাননীয় অতিথি আপনার বুদ্ধির উচ্চ প্রশংসা আমি করছি," তারপরই সুর বদলিয়ে বলল "দেখলেন ত আমাদের দেশের সরকার কত দয়ালু, আপনাকে প্রায় পাঁচ শত দিনার দিয়েছেন। রাজা বুরিশ বড়ই ভাল লোক, রাজা বলে তাঁকে বলা চলে না, তিনি হলেন বুলগেরিয়ার প্রাণ।"

খাওয়া হয়ে গেলে আমরা শহর ছেড়ে একটি ফার্মে গেলাম। ফার্মটি একজন ধনী লোকের। নিজে ফার্ম দেখতে অসমর্থ বলে ম্যানেজার নিযুক্ত করেছেন। এই ফার্মেই যুবকের পিতা মজুরী করেন। আমাদের দেখা মাত্র অনেকগুলি মজুর আমাদের কাছে ছুটে এল এবং আমার সাথীর মারফতে প্রশ্ন করলে, মরলে পরে মানুষের কি হয়। এসম্বন্ধে আমি যা বলেছিলাম তাতে ফার্মের মজুরগণ সুখীই হয়েছিল। যারা ধর্মে বিশ্বাস করে তাদের কাছে যদি ভগবান নাই বলা হয় তবে তারা আর কোন কথা শোনেনা। নাস্তিক বলে সকল যুক্তি উড়িয়ে দেয়। আমার উড়ে যাবার ভয়ই বেশী ছিল। এবং জুড়ে বসবার-ও প্রত্যাশা ছিল, সেইজন্যই মজুরদের কথার জবাব এড়িয়ে যাবার জন্য অন্য কিছু বলেছিলেম। ফার্মে তামাক হয়। ইউরোপে পৌছার পর এই সর্বপ্রথম একটি তামাকের ফার্মে আমি উপস্থিত হলাম। আমাদের দেশেও তামাক হয় কিন্তু ইউরোপে তামাক ক্ষেতে যেরূপ পরিশ্রম করে তামাক ক্ষেত করা হয়, আমাদের দেশে সেরূপ কিছুই করা হয় না। তামাক ক্ষেতের কাছ দিয়ে সুন্দর একটি বাঁধানো পথ চলে গেছে, সেই পথের শেষেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ি। এই বাড়িটায় ম্যানেজার মশায়-থাকেন।

ম্যানেজার-মশায় বড়ই সদাশয় লোক। তিনি সকল দেশের মজুরকেই কাজ দেন। বুলগেরিয়ার নতুন আইন মতে বিদেশীকে মজুরী দেওয়া মহা অন্যায় কাজ, কিন্তু আইনের ফাঁক আবার, ম্যানেজার-মশায় সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে অনেকগুলি। বিদেশীকে তাঁর তামাকের ক্ষেতে স্থান দিতে সক্ষম হয়েছেন। রুমেনিয়ান্, আলবেনিয়ান্, গ্রীক, ক্রীট, মন্তে-নিগ্রো, এবং অন্যান্য জাতের লোক-ও এখানে কাজ করছে। ম্যানেজার-মশায় আমাকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে কতকগুলি সিগারেট আমার সামনে রেখে দিয়ে বললেন বুলগেরিয়া পৃথিবীর সর্বত্র তামাক চালান দিয়ে থাকে। আমাদের নেশার তামাক এতই উত্তম যে জার্মাণী বৃটেন এবং এমন কি ফ্রেন্চ পর্যন্ত আমাদের দেশের তামাক ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।"

ম্যানেজার-মশায়কে সুখী করার জন্য তৎক্ষণাৎ একটি সিগারেট ধরালাম। বাস্তবিকই বুলগেরিয়ার তামাক ভাল অর্থাৎ বুলগেরিয়ার ফ্যাক্‌টরীতে যত সিগারেট তৈরী হয় তাতে "ছাতা গাছের" পাতার জাল দেওয়া হয় না। যে দেশের সিগারেট ফ্যাক্টরীতে তামাকের সঙ্গে অন্য কিছু ভেজাল দেওয়া হয় সে দেশের সিগারেটেরই নানারূপ "গুণ গরিমা" ঢাক পিটিয়ে জন সমাজে প্রচার করা হয়। তুর্কীতে তামাকের বিজ্ঞাপন থাকে না কারণ তামাকে কেউ কোনরূপ ভেজাল দিতে পারে না। বুলগেরিয়াতেও সিগারেটের বিজ্ঞাপন দেওয়ার

দরকার হয় না। পয়সা থাকে নরম সিগারেট বেশী পয়সা দিয়ে কিনে খাও নতুবা তামাক পাতার ডাঁটা সমেত যে সকল সিগারেট সাধারণ দামে বিক্রী হয় তাই কিনে সন্তুষ্ট হও।

সিগারেট ফ্যাক্টরী দেখার বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল কিন্তু তামাক ক্ষেতে সিগারেট ফ্যাক্টরী হয়না সেজন্য সে দিনই দ্বিপ্রহরের খাদ্য না খেয়ে আমরা গ্রামে ফিরে এলাম এবং বেশ বড় একটা রেঁস্তোরায় খেয়ে দুপুর বেলা শুয়ে কাটালাম।

বিকালে ছাত্রটির সঙ্গে দেখা হলে তাকে জানিয়ে দিলাম পরদিন সকাল বেলাই রওনা হব। সে আমাকে পথেও সাহায্য করবে জানিয়ে ছিল। ছেলেটির সাহায্য পথেও পেয়েছিলাম।

দুটি-দিন বুরীশোগ্রেদে কাটিয়েই মনে হল ইউরোপ ভ্রমণ করা কষ্টকর হবে না। কেউ আমাকে 'গেট আউট' করবেনা। ইউরোপের লোকও আমাদের মতই মানুষ। গতকাল মজুর চাষারা যেমন ভাবে ধর্মকথা নিয়ে আলোচনা করল তাতে মনে হল এদের মনেও উচ্চ শিক্ষার ছাপ পড়েনি। তবে এদের আর্থিক এবং সামাজিক নিয়ম আমাদের চেয়ে ঢের উন্নত তা স্বীকার করতে হবেই। কি করে এরা আর্থিক এবং সামাজিক উন্নতি করল তাই আমাকে জানতে হবে। এসব কথা আমাকে জানতে হবে পথে দাঁড়িয়ে, বই পড়ে নয়। অতএব একই স্থানে বেশীদিন বসে থাকা ভাল মনে করলাম না। পরের দিনই সকাল বেলা সোফিয়ার দিকে রওনা হলাম।

সকাল বেলা দেখতে পেলাম দলে দলে লোক ঘোড়ার গাড়িতে করে গ্রামের বাইরে যাচ্ছে। তাদের প্রত্যেকের পরণেই লম্বা জুতা, মোটা কোট এবং মাথায় নাইট ক্যাপ। এরা প্রত্যেকেই আমাকে ভিক্ষা দিয়েছিল এবং সেজন্যই আমার মুখ তাদের কাছে পরিচিত ছিল। হাত উঠিয়ে যখন আমি তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানালাম তখন প্রত্যেকেই তারা হাত উঠিয়ে আমাকে বিদায় দিল। দুদিনের পরিচয় কয়েক মিনিটের মাঝে ভুলে গিয়ে নতুনের ডাকে সারা দিতে হল।

পথের দুদিকে নানারূপ শস্য ক্ষেত্র। আঙুর ক্ষেতগুলি আমার কাছে বেশ লাগছিল। বাতাসে আঙুরের লতাগুলিকে তাদের আশ্রয় রূপী চিক্কণ লম্বা কাঠের টুকরা থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছিল। বাতাসের রেশ একটু কমা মাত্র তারা আবার সেই চিক্কণ কাঠের চৌপাইতে এসে আশ্রয় নিচ্ছিল। এই কাঠের টুকরা গুলিই হল যেন তাদের এক মাত্র আশ্রয়।

দুপুর বেলা বিশ্রামার্থ একটি খামারবাড়িতে প্রবেশ করব ভেবে খামারবাড়ির দরজার কাছে দাঁড়ালাম। খামারবাড়ির মালিক দরজার পাশের আঙুর বাগানে দাঁড়িয়ে আঙুর গাছগুলি দেখছিলেন। আমাকে দেখা মাত্র তাঁর কৌতূহল হল এবং আমার কাছে এসে তাঁর বাড়ির দিকে যেতে বললেন। আমার দেশবাসী নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করবেন কোন ভাষায় এই বুলগার ভদ্রলোক আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমাদের দেশে একটি প্রচলিত কথা আছে, সেই কথাটি হল "হস্ত থাকিতে কেন মুখে বলব কথা।" আমরাও ইঙ্গিতেই কথা বলেছিলাম। আমাদের দেশ সোভিয়েট রুশকে বাদ দিলে ইউরোপের প্রায় সমান। এত বড় দেশটাতে হিন্দুস্থানী ভাষা প্রায় লোকেই বলতে পারে এবং বোঝেও। সেইজন্যই হাতের

ব্যবহার প্রায় উঠে গেছে। ইউরোপে ফ্রেন্‌চ ভাষা সর্বত্রই লোকে ব্যবহার করে, কিন্তু আমরা যেমন করে হিন্দুস্থানী ব্যবহার করতে সক্ষম হই তেমনটি তারা করেনা অথবা ব্যবহার করবার সুযোগ পায় না। সেজন্যই ইঙ্গিতের ব্যবস্থা ইউরোপের সর্বত্রই দেখতে পেয়েছিলাম।

খামারের মালিক আমাকে সঙ্গে করে তার বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েই ঘরের ভেতর চলে গেলেন। ইত্যবসরে আমি তার বাড়িটা দেখে নিলাম। অবশ্য চেয়ারে বসেই চোখ বুলিয়ে নিলাম। খামারের মালিকের ঘরের পাশেই মস্ত আর একটা বাড়ি। সেই বাড়িটাতে খামারের মজুরেরা খায় এবং থাকে বলেই মনে হল।

মালিক তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে বাইরে আসা মাত্র আমি আবার নমস্কার করলাম, কারণ স্ত্রী জাতির প্রতি যারা সম্মান দেখায় না, তারাই ইউরোপে বর্বর বলে গণ্য হয়। ভদ্রলোকের স্ত্রী আমাকে দেখা মাত্র চম্‌কে উঠলেন এবং আমাকে আরব বলে ধারণা করলেন। আরব কথাটা শুনেই আমি মুখ খুললাম এবং তৎক্ষণাৎ বল্‌লাম 'নাই আরবইস্কি—হিন্দুইস্কি। হিন্দু—হিন্দু কি আরবের মতই হয় এরূপ বোধ হয় কথা হচ্ছিল, আমি তাঁদের কথা কমই বুঝতে সক্ষম হয়েছিলাম সেজন্য পকেট থেকে একখানা পরিচয় পত্র বের করে স্ত্রীলোকের হাতে দিলাম। স্ত্রীলোকটি নিরক্ষর ছিলো না। তিনি আমার পরিচয় পত্র পড়লেন এবং আমাকে ভেতরের ঘরে বসিয়ে তার স্বামীকে সঙ্গে করে ভেতর বাড়িতে গেলেন। আমাকে খাবার টেবিলের সামনে বসিয়ে দম্পতি অন্যত্র গিয়েছিলেন। খাবার টেবিলের উপর সুন্দর ধবধবে একখানা চাদর বিছানো ছিল। তারই উপর একটা কাঁচের কুঁজোতে আঙুরের মদ সযত্নে রক্ষিত ছিল। গৃহিণী ফিরে এসে আমাকে এবং তাঁর স্বামীকে এক গ্লাস করে মদ দিলেন। আমি গ্লাসে মুখ দেবার আগেই আর একটা ছোট গ্লাস চাইলাম। গৃহিণী এতে চমকে উঠলেন। আমি গৃহকর্তাকে বললাম "মদ খাওয়া আমার অন্যায় হবে। আপনাদের সম্মান রক্ষার্থে সামান্য একটু মাত্র খাব। স্ত্রীকে বুঝিয়ে বলা মাত্রই তিনি একটি ছোট গ্লাস এনে হাজির করলেন এবং আমি অল্প ওয়াইন্‌ খাচ্ছি বলে গৃহিণী বড়ই আনন্দিত হলেন। গৃহকর্তা কিন্তু রাগ করে চোখ দুটা লাল করে ফেললেন। আমাকে উপলক্ষ করে তাঁর প্রচুর ওয়াইন খাবার সুযোগ হয়েছিল এবং সেজন্যই বোধহয় তিনি আমাকে পথ থেকে ডেকে এনে ছিলেন। মদখাওয়া যখন তার হয়ে উঠল না তখন তিনি দোভাষীর কাজে-ও অবহেলা করতে লাগলেন। আমি তাতে মোটেই দুঃখিত হলাম না। ইঙ্গিতে গৃহিণীকে গরম জল দিতে বললাম। গৃহিণী গরম জল দিলেন। বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে আবার টেবিলে এসে খেতে বসলাম। এবার গৃহিণী গৃহকর্তাকে কিছু না বলেই তিন জনের খাবার নিয়ে এলেন।

কৃষকের খাদ্য সর্বত্র সমান। মামুলি খাবার খেয়েই কৃষক শক্তিশালী হয়। রুটী, মাখন এবং প্রচুর পরিমাণে পানীয় টেবিলে আনা হয়েছ। কয়টী পেঁয়াজ কেটে তারই সঙ্গে মিষ্টি লঙ্কা মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃত পক্ষে এই মিশ্রণটি চাটনীর কাজ করেছিল। শুষ্ক খাদ্য অতি কম খেতে পারি বলে আমি নিজেই কিছুটা দুধ চাইলাম। গৃহিণী দুবোতল দুধ এনে হাজির করলেন। আমি রুটির সঙ্গে প্রায় এক বোতল দুধ খেলাম। ইংলিশম্যান

যেমন খাবারের পর অথবা এই রকমের খাবারের সঙ্গেই চা খায়, বুলগেরিয়াতে সেরূপ কোনও ব্যবস্থা নাই। খাবার খেয়ে মজুর চাষীদের হোটেলের একটা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। ম্যালেরিয়া না হবার জন্য খামারের সর্বত্র মশানাশী বিষ ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। রাতে বিনা মশারীতেই শুয়েছিলাম। এটা হল বুলগেরিয়া। বুলগেরিয়া প্রাচ্য দেশ বলেই পরিচিত। কিন্তু ইংলণ্ডের নিউ হেভেনের মত স্থানেও মশার দংশন সহ্য করতে হয়েছিল। অথচ বুলগেরিয়ার খামারেও মশা ছিল না।

এই খামারের মজুরগণ শীতের সময় খামারে রাত কাটায়, সেজন্যই এতগুলি বিছানার ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছিল। দুপুর বেলা মজুরগণ কখন খেল তা দেখতে পাইনি। যে কয়জন মজুর রাত্রে খামারে ছিল তারা আমাদের একই সঙ্গে খেয়েছিল। রাত্রে খাবারের বেশ পারিপাট্য ছিল। সুপ্‌, ভাজা মাছ, আলু এবং পেঁয়াজ সিদ্ধ, প্রচুর দই এবং ঘন দুধ তারপরই এক পেয়ালা কাফি। মদ কেউ খায়নি।

রাতে শোবার সময়ই শরীরটাতে বেশ ব্যথা হয়েছিল। শরীরে কেন ব্যথা হল তারই কথা অনেকক্ষণ চিন্তা করেছিলাম কিন্তু কোন কারণ খুঁজে পাইনি।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে-ও শরীরে শক্তি পেলাম না। মাথায় ব্যথা ছিল বেরুতে ইচ্ছা করছিল না, তবুও বেরিয়ে পড়লাম। কারণ আমাকে পৃথিবী ভ্রমণ করতে হবে। বসে থাকলে চলবে না। কৃষক দম্পতির সঙ্গে দেখা করে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে এসে আবার ভাবতে লাগলাম কেন আমার শরীরে ব্যথা হয়েছে। মনে হ'ল আদের্ণের পিসোর দংশনের কথা। কিন্তু পথ চলাই আমার কাজ। পথের দেবতার কাছে আমার এই সাধনার কঠোর বন্ধন একে অস্বীকার করি এমন কথা মনে করতে ভালো লাগে না। চলব আমি পথ পরিব্রজনার পদচিহ্ন একে দেশ থেকে দেশান্তরে।

আদ্রিয়া নোপলে দুটি রাত কাটিয়ে ছিলাম। আদ্রিয়া নোপলের অপর নাম হল আদের্ণে। স্থানীয় লোক আদের্ণেই বলে। আদ্রিয়ানোপলেন বলে না। আদের্ণে ছিল তুর্কীয়ার সীমান্ত শহর। সেজন্য শহরটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার-ও ব্যবস্থা ছিল না। আদের্ণের প্রকাণ্ড মসজিদ্ দেখে যাদের প্রাণে প্রাণ ফিরে আসে তার আশ পাশ ছিল আবর্জনায় পূর্ণ। আমি কয়েকবারই মসজিদ্ দর্শনে গিয়েছিলাম। মসজিদ্ দর্শনের জন্য অনেকটা অপরিষ্কার স্থানে হাটতে হয়েছিল। যতক্ষণ এপথে হেঁটে ছিলাম ততক্ষণই পিসো নামক একরকমের পোকা আমাকে ক্রমাগত দংশন করেছিল। পিসো পোকা নাকি মসজিদের চত্বরের নীচে কোথাও আড্ডা গেড়েছিল। মসজিদে সংস্কারের কাজও চলছিল এবং পিসোর আড্ডা ধ্বংস করার জন্যে নানা প্রক্রিয়ার-ও ব্যবস্থা হচ্ছিল। এই প্রক্রিয়া দেখার জন্য আমি যেতাম এবং আমাকে পিসো কামড়াতো। তারই ফলে আজ আমি ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছি। সকাল বেলা পথে আসার পরই কম্প দিয়ে জ্বর এল। কতক্ষণ পথের পাশে বসে আবার চলতে লাগলাম আর মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। আদের্ণের মসজিদে না গেলেই আমার আজ এত কষ্ট পেতে হত না। অতি কষ্টে দ্বিপ্রহরে মেরিজো নামক একটি শহরে পৌছলাম।

ভাবছিলাম তাড়াতাড়ি করে একটা হোটেলে গিয়ে বিশ্রাম করব কিন্তু এই ছোট সহরের হোটেল ম্যানেজাররা যেন আমার কথা বুঝতেই চায় না। চতুর্থ হোটেলের দরজার সামনে বসে হোটেলের মালিককে একখানা রুম দেখিয়ে দিতে বললাম; সেও যেন কথা বুঝতে চায় না। একে ত শরীর খারাপ, তারপর ঘুরে ঘুরে শরীর আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এতে কার না মেজাজ খারাপ হয়? আমি রেগে গেলাম আর ঠিক্ থাকতে পারলাম না। তেড়ে গিয়ে ম্যানেজারের হাত ধরলাম। ম্যানেজার কি ভেবে অন্য দুজন যুবকের দিকে তাকাল। একজন যুবক সামান্য একটু ইংলিশ বলতে :পারত সে আমাকে রুমে নিয়ে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল। দ্বিতীয় যুবক প্রথম যুবকের সাহায্যে অগ্রসর হল। দোতলার উপর হোটেল ঘর অবস্থিত ছিল। প্রথম যুবক আমার বাইসাইকেল টেনে উঠাল। দ্বিতীয় যুবক আমার পিঠের ঝোলাটা কাঁধে নিল। সিঁড়িগুলি উঠে সামনের রুমটাতেই আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিল। প্রত্যেক রুমে তিনটা করে বিছানা, বিছানাগুলি নরম (soft bed) ছিল। নরম বিছানায় শোবার পূর্বে গরম জল দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে ফেললাম। এতে অনেকটা আরাম হল। সাহায্যকারী যুবকদ্বয় আমার পরিচয় চাইল। আমি তাদের কাছে আমার পরিচয় দিলাম, আমি যখন তাদের পরিচয় চাইলাম তখন লম্বা পাতলা যুবকটি নিজেকে ইহুদী বলে পরিচয় দিয়ে বলল "আমি আমাকে বুলগার বলে পরিচিত করতে চাই কারণ বুলগেরী হল আমার মাতৃভাষা, কিন্তু স্থানীয় সরকার আমাকে বুলগার বলে গ্রহণ করে না, বাধ্য হয়ে আমাকে ইহুদী বলে পরিচয় দিতে হয়। আমাদের পরিবারে ইহুদী নিয়ম কনুন মানা হয় না কারণ আমরা ধর্ম্মে খৃষ্টান"। এই কয়টি কথা বলেই যুবক মাথানত করে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করল। অপর যুবক বুলগার। ইহুদী যুবকের দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগে তার বুকে যেন প্রবল একটা আঘাত লাগল। সে আমার দিকে চেয়ে দুটি ইনটারনেশনেল কথা বলল। বুঝলাম যুবক কি বলতে চায়। তাদের কথায় আমার মনেও দুঃখ হল।

হাত পা চিবাচ্ছিল। আমি কাউকে কোন ফরমাস করতে সঙ্কুচিত হইনা। সঙ্কোচ করলে পথের মানুষকে আপনার করা যায়না তাই ঘাড় ফিরে শুয়ে পরলাম এবং বুলগার যুবককে হাত পা টিপে দিতে বললাম। বুলগার যুবক তার কোটটি শেলে ঝুলিয়ে একখানা চেয়ার টেনে আমার কাছে বসল। দ্বিতীয় যুবককে নীচ থেকে কাফি এনে দিতে বললাম। সে কাফি আনতে গেল। প্রথম যুবক আমার হাত পা এবং মাথা টিপে দিতে লাগল।

ইহুদী যুবক কাফি নিয়ে এল, তিন জনে কাফি খেলাম। কাফির দাম আমিই দিলাম। কাফি খেয়ে আর বিলম্ব করলাম না, বিছানায় শুয়ে পরলাম। ইহুদী যুবক একটু ইংলিশ জানত সে বলল "হিন্ হিন্ কন্এা ম্যালেরিয়া", এর মানে হল কুইনিন্ ম্যালেরিয়া নষ্ট করে। কিন্তু কথা হল আমার ম্যালেরিয়া হয়েছিল কি আর কিছু হয়েছিল তা ঠিক করা সর্বপ্রথম দরকার ছিল। সেজন্য যুবকদের বিদায় দিয়ে শুয়ে পড়লাম। বিকাল বেলা দুজন যুবকই এলো এবং আমার ম্যালেরিয়া হয়েছে বলেই তারা ঠিক করলে। তাদের কথা মতই কুইনাইন্ কিনে আনলাম এবং কুইনাইন্ খেলাম। জ্বর কিন্তু কমল না। পরের

দিন যুবকদের কছে আদের্ণের পিসো দংশনের কথা বললাম। তারা আমার কথা শুনে রোগের ঠিক ঠিক ঔধধের ব্যবস্থা করল। "কুম্ন্যক্" নামক এক প্রকার মদ কিনে এনে আমাকে খেতে দিলে। আমি তাই খেলাম, দ্বিপ্রহরে জর থেমে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে পেটও পরিষ্কার হয়ে গেল। কুম্ন্যক মদ পেট পরিষ্কার করবে তা আমি ভাবতেও পারিনি। তৃতীয় দিনটা আর কোথাও বের হলাম না। চতুর্থ দিন প্রাতে মেরিটজা শহরটি বেড়িয়ে এলাম এবং আমার খরচের উপযুক্ত অর্থ ভিক্ষা করে নিয়ে এলাম।

সেদিনই বিকাল বেলা অন্য আর একটি ছোট খাট শহরে পৌছলাম এবং হোটেলে স্থান নিলাম। হোটেলে পৌছেই খেয়ে শুয়েছিলাম। বিকালের দিকে কে এসে দরজায় ধাক্কা দিল ঘুম থেকে উঠেই দেখলাম হোটেলওয়ালা দাড়িয়ে আছেন এবং আমাকে বল্‌লেন নীচে অনেকগুলি লোক আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য অপেক্ষা করছে। তাড়াহুড়া করে নীচে নামছিলাম।

নীচে নামবার সময় লক্ষ্য করলাম, স্ত্রীলোকেরা সকলেই মাথা নীচু করে আছেন। তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলাম এমন কিছু অন্যায় করেছি যে জন্য মহিলাগণ মাথানত করে আমার অভদ্রতা স্মরণ করেছেন। মুখ ফিরিয়ে ট্রাউজারের বোতামে হাত দিয়ে দেখলাম বোতামগুলি খোলা। বোতাম এঁটে নিলাম এবং মহিলাদের কাছে নানা রকমে ক্ষমা ভিক্ষা করে নীচে গিয়ে একখানা নির্ধারিত চেয়ারে বসলাম! অনেকগুলি যুবক যুবতী অপেক্ষা করছিলেন। তারা প্রত্যেকেই কাফি খাচ্ছিলেন। হোটেলের বসবার ঘরখানা খুব ছোট ছিল। টেবিলগুলি পাশাপাশি করে সাজানো ছিল। যারা বসেছিলেন তারাও গাঘেঁসেই বসেছিলেন। এতগুলি লোক দেখে আমার ভয় হয়েছিল। এদের উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে পারছিলাম না। আমাকেও কাফি খেতে দেওয়া হয়েছিল। কতক্ষণ পর আমার সাথী ইহুদী যুবক কোথা থেকে এলেন এবং আমাকে সকলের কাছে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরিচয় হবার পর একজন জিজ্ঞাসা করলেন আমি কেন রুমানিয়া হয়ে রুশিয়া যাইনি। কেন সোভিয়েট রুশিয়ায় আমি যাইনি সেকথা বলার আমার ইচ্ছা ছিল না। প্রশ্নের উত্তরে শুধু বাজে কথাই বল্‌লাম। অনেক্ষণ বাজে কথা বলার পর হঠাৎ আমার মুখ থেকে এমন একটি কথা বেড়িয়ে পড়ল যা কোন ভদ্রলোক কারো কাছে ভুলেও প্রকাশ করেনা। কিন্তু বিদেশের লোকের কাছে যা বলতে পেরেছিলাম তা যদি স্বদেশ বাসীর কাছে না বলি তবে আমার কাপুরুষতার স্বরূপ আরও বেরিয়ে পড়বে।

স্তাম্বুলের প্রসিদ্ধ একটি পথের উপর বুলগার কন্‌সালের বাড়ি। বুলগার কন্‌সালের বাড়িতে পৌছে যথা বিহিত নিয়ম মতে ডিমার জন্য পাসপোর্ট উপস্থিত করলাম। কডিণ্টারে দাড়ানো কেরাণী পাসপোর্ট খানা ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন। আধঘণ্টার পর আমার ডাক পড়ল। ভেতরে গেলাম। ভেতরে চারজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। আমি জানতাম গ্রীস্ বুলগেরিয়া যুগোশ্লাভিয়া রুমানিয়া, আলবেনিয়া এবং হব্‌গেরীতে ডিসা সকলকে দেওয়া হয় না সেজন্য কখনও পলিটিক্স নিয়ে কোন কথাই বলতাম না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেই কথা বলতাম। কখন কখন বা কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের নামও করতাম। মহাত্মা গান্ধীর

অহিংসা নীতির কথাও বলতে ভুলতাম না। শুনাতাম বুদ্ধদেবের বাণী। তবে প্রকাশ্যেই ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করাটাও একটি মন্দ বিষয় ছিল। •

কন্‌শালের রুমে প্রবেশ করা মাত্র আমাকে বসতে দেওয়া হ'ল এবং বুলগেরিয়াতে আমি কেন যাচ্ছি তা জিজ্ঞাসা করা হল। আমি বললাম "আমি চলেছি ইংলণ্ড, বিশেষ করে লণ্ডন। লণ্ডন যেতে হলে বুলগেরিয়াতে যাওয়াটাই উচিত হবে, কারণ ক্যালে স্তাম্বুল হাইওয়ে সোফিয়ার ভেতর দিয়েই গিয়েছে।" মামুলী কথার মামুলী উত্তর। এর পেছনে কোনরূপ চক্রান্ত ছিলনা। আমাকে যে প্রশ্ন করা হয়েছিল তার উত্তর পাবার পর আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করবারও থাকতে পারেনা। কিন্তু প্রশ্ন আরম্ভ হল নানা রকমে। আধঘণ্টা সময় প্রশ্নের উত্তর দিয়ে হয়রান হয়েছিলাম। এরপরই হঠাৎ একজন জিজ্ঞাসা করল, আমার বাবার নাম কি। আমার মাথায় তখনও একটা প্রবল চিন্তা ক্রমাগত মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল—এরা ভিসা দেবে কি দেবেনা। যদি ভিসা না দেয় তবে আমাকে কোন্ পথ ধরে চলতে হবে। এদিকে যে আমাকে আমার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করেছে সে কথা আমার মনেই ছিলনা। আবার যখন আমার বাবার নাম কি জিজ্ঞাসা করা হল তখন নিমিষের মধ্যে মনের সর্বত্র খুঁজেও বাবার নামের সন্ধান পেলাম না। হঠাৎ বাবার নাম মনে হল এবং বাবার নাম বল্‌লাম। বিলম্বে বাবার নাম বলায় সকলের মনেই সন্দেহ হ্ল হয়ত আমার বাবার সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিলনা। এশিয়ার লোক হয়ে যাদের বাবার নামের সঙ্গে পরিচয় থাকেনা, তাদের দেশাত্মবোধ থাকতে পারেনা এই ধারণাই চারজন ভদ্রলোকেরই ছিল, তাই আর কোন কথা না জিজ্ঞাসা করেই আমার পাসপোর্টে ভিসা দিয়েছিলেন।

আজ আবার সেকথাই মনে হল, সঙ্গে সঙ্গে বাবার কথাও মনে হয়েছিল। তখনও আমার মন দুর্বল ছিল। তখনও মনে হচ্ছিল পৃথিবী ভ্রমণে যদি কোন রকমে বাধা জন্মে তবে প্রতিজ্ঞা পালন হবেনা। আমি উপস্থিত যুবক যুবতীর কাছে স্তাম্বুলের কথাই বললাম। আমার কথা শুনে সকলেই হাসল। তারপর বললাম, "আমি এখন আপনাদের পরিচয় পেয়েছি। আপনারা জেনে রাখুন যদি আমি আপনাদের দেশের প্রতিনিধিদের সন্তুষ্ট না করতে পারতাম তবে আজ আপনাদের দর্শন পেতাম না। আপনাদের ভীত সরকার আপনাদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য কত সচেতন তা নিশ্চয়ই আপনারা এখন বুঝতে পেরেছেন।" আমার কথা শুনে কেউ কিছু বল্‌ল না। অনেকে চিন্তিত মনে সিগারেট ধরাল এবং একে অন্যে কথা বলতে লাগল। তারপরই চীন সম্বন্ধে কয়টি কথা জিজ্ঞাসা করে সকলেই বিদায় নিল। আমি ও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। রুশিয়ায় কেন যাইনি সে কথা আর কেউ জিজ্ঞাসা করল না।

যুবক যুবতীর দল চলে গেলে ইহুদী সাথীর কাছে বুলগার বন্ধু কোথায় আছে জিজ্ঞাসা করলাম। ইহুদী যুবক বুলগার বন্ধুর সম্বন্ধে কিছুই না বলে পরের দিন সকালে পথে দেখা হবে জানিয়ে বিদায় নিল। আমিও ভিক্ষাপত্র হাতে নিয়ে গ্রাম বেড়িয়ে পড়লাম। অনেকে ভিক্ষা দিল অনেকে ভিক্ষা দিলনা। বুঝলাম এগ্রামের শতকরা পঞ্চাশ জন লোকই এত দরিদ্র যে ভিক্ষা দেবার মত ক্ষমতা তাদের নাই। ভিক্ষালব্ধ অর্থ সবগুলিই হোটেলের মালিককে দিয়ে

দিলাম। হোটেলের মালিক রাত দশটার সময় আমাকে উত্তম খাদ্য দিয়ে বাধিত করল। বল্‌কানের ভেড়ার মাংস সুখাদ্য। রাত্রে সেই সুখাদ্য ভেড়ার মাংস আমাকে প্রচুর পরিমাণে খেতে দিয়েছিল।

পরদিন সকাল বেলা হোটেলে এক কাপ কফি খেয়েই পথে এলাম। তখনও গ্রামের লোক সুখনিদ্রায় নিদ্রিত। ভাবলাম হয়ত আমার সাথীরাও শুয়ে আছে, সেজন্য ধীরে সাইকেল চালিয়ে একটা গান গেয়ে এগিয়ে চল্‌লাম। গানটি আমার গ্রামের লোকের তৈরী। যে পদটি মনে হয়েছিল তা ছিল "মলয় পবন ছুঁইয়ে যেমন মালতী ফুটে রে বনে"। তার পরের পদটি মনে হওয়া মাত্র মুখ হতে থুথু ফেলে দিয়ে নিজকে ধিক্কার দিলাম। কাপুরুষতা আমার মনের কোণে উঁকি মারছে বুঝতে পারলাম। সাইকেল হতে নামলাম। কতক্ষণ দাঁড়ালাম, তারপর মন যাতে দুর্বল না হয় সেজন্য নিজেই অন্য আর একটা গান তৈরী করতে প্রবৃত্ত হলাম। কিন্তু আমার মনে কবিতার স্থান ছিলনা। কবিতা গড়লাম, কবিতা ভাঙলাম, তারপর বললাম, কবিতা বাজে কথা।

কতক্ষণ যাবার পরই দেখলাম আমার সাথীরা পথের পাশ থেকে বেরিয়ে আসছে। তাদের দেখা পেয়ে আমার বড়ই আনন্দ হল। যে পথ দিয়ে তারা আসছিল সেই পথের দুদিকে নানাজাতীয় বৃক্ষ ছিল। অবশ্য এরূপ বৃক্ষরাজি ইউরোপের অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। গাছগুলির পাতা বেশ বড় বড় এবং রৌদ্র অথবা বৃষ্টির সময় সেই বৃক্ষপত্রের নীচে বেশ আরাম করে শোওয়াও যায়। আমার মনে হল আমার সাথীরা গাছের নীচেই রাত কাটিয়েছিল। তাদের ঘুম অল্প হওয়ার জন্য চোখ লাল এবং মুখ অপরিষ্কার ছিল।

তাদের চোখ এবং মুখের অবস্থা দেখে আমার বড়ই দুঃখ হয়েছিল, কিন্তু মনের কথা মনেই রয়ে গেল। মাইল পাঁচেক যাবার পর একখানা গোলাবাড়ি দেখতে পেয়ে সেখানে যাব বলে সাথীদের বললাম। সাথীরা গোলাবাড়িতে যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করল। গোলাবাড়তিতে গিয়ে কিছু কিনে খাব তাই জানিয়ে তাদের অপেক্ষা না করেই গোলাবাড়ির ভেতর প্রবেশ করলাম। সাথীরা বিনাবাক্যব্যয়ে আমার পেছনে চল্‌ল। অল্পদূর গিয়েই একটি লম্বা লোকের দেখা পেলাম। লোকটির গায়ে দামী একটা ওভার-কোট ছিল এবং তাঁর পরনে যে পোশাক ছিল তা সচরাচর বুলগেরিয়ার লোক ব্যবহার করে না। আমাকে দেখা মাত্রই ভদ্রলোক ইংলিশে জিজ্ঞাসা করলেন, মাননীয় মহাশয়, কোথা হতে আসছেন, আপনি কি ভারতীয় পর্যটক?

—হাঁ মাননীয় মহাশয়, বেশ ক্ষুধা হয়েছে, এখানে কি কিছু খেতে পাব? অবশ্য সেজন্য উচিত মূল্য দিতে রাজি আছি।

ভদ্রলোক শ্লেষ করেই আমাকে "মাননীয় ভদ্রলোক" বলেছিলেন। আমিও যখন তাঁকে ঠিক ভাবেই উত্তর দিতে পেরেছিলাম তখন তিনি প্রকৃতিস্থ হয়েছিলেন। খাবারের দাম দেব যখন বললাম তখন বোধ হয় তাঁর চমক লেগেছিল। ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে যেতে বললেন এবং তিনি এগিয়ে চল্‌লেন। গোলাবাড়িটা ছেড়ে আমরা অনেক দূরে

আর একটা ঘর দেখতে পেলাম। ঘরখানা বাংলো ধরনের—যাকে আমরা "খৃষ্টানী ধরনের বাড়ি" বলি। বুলগেরিয়াতেও এরূপ খৃষ্টানী ধরনের বাড়ি দ্বিতীয়টি দেখেছি বলে মনে হয় না। বুলগেরিয়ার এরূপ বাড়িকে ইংলিশ ধরনের বাড়ি বলা হয়। ইংলিশ ধরনের বাড়িতে থাকা ব্যয়সাপেক্ষ এবং সেরূপ প্রকৃতি না হলেও সেরূপ বাড়িতে থাকা চলেনা।

আমরা ভদ্রলোকের বাড়ির বারান্দায় উঠামাত্র স্কটল্যাণ্ড দেশীয় একটি কুকুর আমাদের অভ্যর্থনা করল। তারপর বাট্‌লার এসে ভদ্রলোকের শরীর হতে ওভার কোটটি খুলে নিয়ে চলে গেল। আমরা চার জনে একটি টেবিলের চার দিকে বসলাম। ইঙ্গিত করা মাত্র বয় একটিন গোল্ডফ্লেক সিগারেট এনে আমাদের সামনে রাখল। আমরা কেউ সে টিনভরা গোল্ডফ্লেক সিগারেট ছুঁতেও সাহস করলাম না। শেষটায় গৃহস্বামী নিজেই টিনটি খুলে আমাদের সামনে ধরলেন। আমার সাথীরা ইংলিশ সিগারেট নিয়ে ধরাল না অথবা নিজের পকেট হতে সিগারেট বের করেও মুখে দিল না। আমি একটি সিগারেট নিয়ে তাই ধরিয়ে বললাম, "মহাশয়, আপনাদের শিষ্টাচার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নাই, ইউরোপে এই সবেমাত্র প্রবেশ করেছি।" দাম্ভিক, ধনগর্বে গর্বিত ভদ্রলোক আমার কথা শুনে বললেন, "আপনি কি গ্রেটবৃটেনেও সাইকেলে করেই যাবেন? আমি বললাম, "আশা করি তাই, তবে আপনাদের প্রবাদবাক্য বলে "গড্ ডিস্‌পোজেস্।" ভদ্রলোক একটু মন খুলেই বললেন, "তবে আপনি ইংলিশ বেশ ভালই জানেন?"

নিশ্চয়ই মহাশয়, তিন পুরুষ ধরে বৃটিশ আমাদের দেশ শাসন করছে, সে কথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন?

জানি সবই, আপনি কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক?

না মহাশয়, একদম দরিদ্রের ছেলে।

আপনাদের দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক কেমন আছে?

আমাদের দেশের মধ্যবিত্তরা বেশ আরামে আছে, মাঝে সাঝে স্বদেশী করে, কেউ জেলে যায়, কেউ মরে, আর কেউ সংবাদ পড়ে আনন্দ করে। তবে আমাদের দেশের মধ্যবিত্তরা সাহিত্যে বেশ মন দিয়েছে, এবার উন্নতি নিশ্চয়ই হবে।

আপনি কি বলতে চান, আপনার পূর্বপুরুষ ভারতীয় চাষা ছিলেন?

না মহাশয়, আমার পূর্বপুরুষও চাষার রক্ত অনেক দিন আরাম করেই চুষে খেয়েছিলেন, এখন তাদেরই দোষে সে পথ বন্ধ হয়েছে, সুযোগ এবং সুবিধা পেলে আবার আমরাও চাষার রক্ত চুষেই খাব তাতে কোন সংশয় নাই, কারণ এতে আমরা বংশানুক্রমে অভ্যস্ত।

তবে কেন এমন করে পথে পথে বাইসাইকেল নিয়ে ঘুরছেন? যদি ইচ্ছা হয় তবে এখানেই থেকে যান, আমার তামাক বাগানে অনেক বুলগার মজুর খাটে, তাদের দেখবার জন্য আপনার মত এক জন বিচক্ষণ লোক পেলে এখনই নিযুক্ত করতে পারি।

না মহাশয়, সেটি আর এ জীবনে হবেনা। আমি যা বলেছি সবই ভাবের ঘোরে, আমার চাকুরি ছিল, তা পরিত্যাগ করেই পৃথিবী ভ্রমণে বের হয়েছি। আপনি বোধহয় আমেরিকার হকেদের কথা শুনেছেন, আমি এখন তাদেরই এক জন।

আর কথা হ'ল না; খানার টেবিল সাজানো হয়েছিল। আমরা তিনজনে গিয়ে খানার টেবিলে বসলাম। প্রথম খেলাম পরেজ, তারপর কতকগুলি আলুসিদ্ধ এবং বড় বড় টুকরার ভেড়ার মাংস। রুটিও কয়েক টুকরা দেওয়া হয়েছিল। তবে সে রুটি "সাদা"। চাষারা সাদারুটি খায়না কারণ তা সহজেই হজম হয়ে যায়। তারপরই সামান্য পুড়িং খেয়ে আমরা বড় বড় কাপে করে কফি খেতে লাগলাম। আমাদের মাননীয় গৃহস্বামী কিছুই খেলেনা. দেখে আমি একটুও অপমান বোধ করলাম না; কারণ মন এবং বুদ্ধি মানসিংহ শ্রেণীর লোকের মত ছিল না।

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে লম্বা ভদ্রলোকের কাছে আমার পরিচয় দিলাম এবং তাঁর পরিচয় পাবার অপেক্ষায় রইলাম। ভদ্রলোক শুধু বললেন, তিনি এক জন স্কচ, এদেশে তামাকের ব্যবসা করছেন। বেশি কথা না বলার কারণ আমি বেশ ভাল করেই বুঝতে পেরেছিলাম। আমার সাথীরা কিন্তু অন্য কিছু বুঝেছিল। সময় নষ্ট করা ভাল মনে করছিলাম না সেজন্য "মাননীয় ভদ্রলোক"কে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায়ের অনুমতি চাইলাম। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে করমর্দন করে জিজ্ঞাসা করলেন, স্কটল্যাণ্ড যাবেন না, সেখানে হয়ত কেউ আপনার সঙ্গে করমর্দন করবেনা। কথাটা শুনে একটু দুঃখিত হয়েছিলাম কিন্তু তিনি যা বলেছিলেন তা আমার ভালর জন্যই। ইংলেণ্ড গিয়েই বুঝেছিলাম আমাদের স্থান কোথায়। স্কটল্যাণ্ড সম্বন্ধে কয়েকটি গল্প শুনেই স্কটল্যাণ্ড যাওয়া স্থগিত রেখেছিলাম।

স্কচ্ ভদ্রলোকের ফার্ম হাউস হতে বের হয়ে আসার পর ইহুদী যুবক বলল, "বুলগেরিয়ার সর্বত্র কতকগুলি ইংলিশম্যান দেখা যায়, তারা কেউ তামাক কিনে বিদেশে চালান দেয় আর কেউ কেউ তামাকের ক্ষেতের মালিক হয়েও বসে আছে। আমাদের দেশের তামাক না হলে জার্মানীর চলেনা।" ইহুদী যুবকের কথা শুনে হাসলাম, তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে পথ চলতে লাগলাম। কতক্ষণ চলার পর আমরা পথের পাশে বিশ্রাম করার জন্য বসলাম। পথের পাশে বসেই ইহুদী যুবককে বললাম, "গত মহাযুদ্ধের খরচ বাবত মিত্রপক্ষ বুলগারদের কাছ হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে বলে সন্ধির একটি কথা ছিল সে সংবাদ রাখ?" বুলগার যুবক বললে "সে ত নগদ টাকা এবং আমাদের দেশের দু'টুক্‌রা জমি। আমি বললাম, "নগদ টাকা আজকাল কেউ কাউকে দেয় না। তোমাদের দেশের যত তামাক, আঙ্গুর এবং ফল বিদেশে যায় সবই যুদ্ধজয়ী জাতগুলি কিনে নিয়ে বিদেশে চালান দেয়। বিদেশে তোমাদের দেশের কাঁচা মাল বিক্রী করে যা লাভ হয় তার সবই মিত্রপক্ষ নিয়ে যায়।" আমার কথাগুলি বুলগার যুবককে ইহুদী যুবক বুঝিয়ে দিয়েছিল। বুলগার যুবক সে সম্বন্ধে কিছুই বলল না, শুধু একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে বলল, "নিকস্ ইংলিশ, ইংলিশ কাপিতেনিস্ত"। এর মানে হল, ইংলিশরা এসব করছে না। ইংলেণ্ডের পুঁজিবাদীরা এসব করছে। বুলগার যুবকের জ্ঞানের কথা

শুনে সুখী হয়েছিলাম। কিন্তু বলতে বাধ্য হয়েছিলাম "বৃটিশরা বৃটিশ পুঁজিবাদীর কথায়ই ওঠাবসা করে।"

আমরা যেস্থানে বসে ছিলাম, তার পাশেই কয়েক ঘর লোক বাস করত। তারা হল চাষা। তারা চলছিল বড় গ্রামে। আমরা যে গ্রাম ছেড়ে এসেছি সে গ্রামের দিকে তাদের ঘোড়ার গাড়িতে বেশ সুন্দর একটা ঘোড়া জুতেছিল। মালের পাশে একজন বৃদ্ধ আর একটি যুবক এবং যুবতী বসে ছিল। বৃদ্ধ এবং যুবকের মুখ সামনের দিকে ছিল। যুবতী পেছনের দিকে চেয়ে অন্য যুবকের সঙ্গে কথা বলছিল। যুবতী সুন্দরী, আর যে যুবকের সঙ্গে কথা বলছিল সে-ও সুপুরুষ। যুবতীর পাশের দুটি লোককে দেখে মনে হল এরা যুবতীর বাবা এবং ভাই হবে সেজন্যই মুখ ফিরিয়ে রাখছে। আমি এদের কথা শুনলাম, চোখের ভাষার বিনিময় বুঝলাম, তারপর এটাও বুঝলাম আজ যে যুবক এবং যুবতী প্রাকৃতিক ভাবের আদান প্রদান করতে চাচ্ছে তারা দরকার হলে তাদের তাজা রক্ত প্রকৃতিকে না দিয়ে তলোয়ারের সামনেও ঢেলে দিতে পারে। বুলগার, গ্রীক্, রুমেনিয়ান্, স্লাভন, ক্রুট, মেসিডোনিয়ান্, মন্তে নিগ্রো এবং অন্যান্য ছোট ছোট জাত নিজেদের স্বাধীনতা পাবার জন্য তুরুকদের সঙ্গে আপ্রাণ লড়াই করেছিল। সে লড়াই দারুণ লড়াই। সে লড়াইএর কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। এটা নতুন যুগ। এমন আর 'ধর্মের লড়াইএর কথা কেউ মনেও করেনা। মুক্ত বীর মুস্তাফা কামাল পাশা ধর্মের লড়াই বলকান হতে শেষ করে গেছেন। সেজন্যই মুস্তাফা কামাল পাশাকে বলকানের লোক শ্রদ্ধা করে। অনেকেই বলে পৃথিবী হতে লড়াই লোপ হোক, কিন্তু কিন্তু কজন লড়াই লোপ করার জন্য নিজের একটু স্বার্থ পরিত্যাগ করতে এগিয়ে আসে? বৃটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, আমেরিকান্, জাপানী এবং চীনা কেউ না। কিন্তু মুস্তাফা কামাল পাশা নিজে এগিয়ে এসে বলকান হতে ধর্মের যুদ্ধ অপসরণ করেছেন। সেণ্ট সোফিয়া স্তাম্বুলের গীর্জা যাকে মসজিদে পরিণত করা হয়েছিল সেই মসজিদকে সর্বসাধারণের দেখার বস্তু করে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দিয়েছেন। আমাদের দেশে ধরমশালাগুলিতেও সকলে প্রবেশ করতে পারেনা, অতএব আমাদের কথা ছেড়ে দিলেও এমন সুকাজ আজ পর্যন্ত কোন মহাত্মাই করতে পারেন নি।

মুস্তাফা কামালেরও কতকগুলি অসম্পূর্ণ কাজ রয়ে গেছে। তাঁর ইচ্ছা ছিল তুর্কীর অধিকৃত আর্মানীদের স্বাধীন করে দিয়ে তুরুক জাতের শত্রু নিপাত করা। কিন্তু নানা কারণে তা হয়ে ওঠেনি। আমি এ সম্বন্ধে নীরব থাকব, কারণ সূক্ষ্ম রাষ্ট্রনীতি নিয়ে কথা বলতে হলেই নানা বই ঘাঁটতে হয়, নানা বই থেকে উদ্ধৃত করে নানা কথা বলতে হয়। এত খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা আমার মত ক্ষুদ্র পরিব্রাজকের শোভা পায় না। সকল বিষয়েই সাধারণ কথা বলে সুখী থাকবার চেষ্টা করব।

বুলগার যুবকযুবতীদের প্রাকৃতিক মিলনের দিকটা বেশ ভাল করে লক্ষ্য করে বুঝলাম, বুলগারগণ স্বাধীন হয়েই আরব সভ্যতার ছাপ তাদের মন হতে উঠিয়ে দিয়ে সাধারণ অবস্থায় ফিরে যাবার জন্য চেষ্টা করছিল এবং তাতে তারা কৃতকার্যও হয়েছিল।

পথ চলার সময় আমি কথা বলিনা। আজও কথা না বলে পথ চলতে লাগলাম। ইহুদী এবং বুলগার যুবকের সম্বন্ধে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। ইহুদী যুবক বুলগেরিয়ায় জন্মেছে; বুলগেরিয়ার ভাষা সে ব্যবহার করে, বুলগেরিয়া হ'ল তার মাতৃভূমি, তবে এই ইহুদী যুবককে বুলগেরিয়ার লোক এত ঘৃণা করে কেন? ধর্মের পার্থক্যই কি তার একমাত্র কারণ? অনেক ইহুদী আজকাল "সুন্নত" পরিত্যাগ করেছে। সুন্নত প্রথাই খৃষ্টান এবং ইহুদীদের পার্থক্য এনে দেয়। নাক সিটকিয়ে যখন কোন খৃষ্টান ইহুদীদের প্রতি শ্লেষ বাক্য নিক্ষেপ করে তখন ঐ সুন্নত প্রথাটার প্রতিই ইঙ্গিত করে বেশি। আমার সঙ্গের যুবকের পিতা ইহুদী, মাতা বুলগার, সেজন্য তারা সুন্নত হয়নি। তবুও তার রক্ষা নাই, তাকে ইহুদী বলে ঘৃণা করা চাই-ই। ইহুদী বুলগেরিয়ার মাইনরিটি। আমাদের দেশের মাইনরিটি রক্ষাকবচ পাবার জন্য ব্যস্ত, বুলগেরিয়ার মাইনরিটি ইহুদী রক্ষা-কবচের বদলে বুলগেরিয়াতে যাতে কমিউনিজম বিস্তার লাভ করে তারই জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে। ১৯২৭ সালে বুলগেরিয়াতে কমিউনিজমের বীজ বপন হয়, তারপর হতে বুলগেরিয়ার প্রগতিশীল ইহুদী যুবক বা যুবতী এবং সামান্য বারজন বুলগার এখানে কমিউনিজম প্রচার করতে থাকে। আমার সঙ্গের ইহুদী যুবক এবং বুলগার যুবক কমিউনিস্ট দলের লোক ছিল।

অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করে কোন্ দেশের লোক আমাকে বেশি আতিথ্য দেখিয়েছে। এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলব কেউ আমাকে আতিথ্য দেখায় নি! যারা আতিথ্য দেখিয়েছে তারা উৎপীড়িত অথবা প্রগতিশীল। উৎপীড়তের দেশ বলতে কিছুই থাকেনা আর যারা প্রগতিশীল তারা দেশ এবং জাত বলে কিছুই স্বীকার করে না। এই উৎপীড়িত ইহুদী এবং প্রগতিশীল বুলগারের দেশ এবং জাত বলতে কিছুই ছিলনা। যদি কেউ তাদের কি জাত জিজ্ঞাসা করে তবে উভয়েই নিশ্চয়ই বলত 'তারা বুলগার' কারণ মাতৃভাষা দিয়েই জাতের পরিচয় দিতে হয়।

আরও কিছুক্ষণ এগিয়ে চলার পর, ইহুদী যুবক আমাকে পথে দাঁড়াতে বলল। পথের পাশে আমি দাঁড়ালাম, তারপর সে গেল কাছেই কর্মরত কতকগুলি কৃষক মজুরের কাছে। কৃষক মজুরদের সে বলেছিল, ভারতবর্ষ থেকে একজন পর্যটক এসেছে, যদি কেউ তার সঙ্গে দেখা করে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে চাও তবে এগিয়ে এস। কৃষক মজুররা যুবকের কথা বিশ্বাস করে কাজ রেখে দিয়ে আমাকে দেখবার জন্য এল। মজুরগণ এসেই যুবকের মারফতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, সাধু সুন্দরসিংহের বাড়ি কোথায়, তাঁর ধর্মমতই বা কি—ইত্যাদি নানারূপ প্রশ্ন।

সাধু সুন্দর সিং গোঁড়া খৃষ্টান মহলে বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাঁর কথা কোরিয়া দেশেও পূর্বে শুনেছিলাম। সিরিয়া এবং লাভাননে তাঁর নাম অনেকেই অবগত আছে। এখানে এসে আবার সেই নাম শুনতে পেলাম। প্রকৃত পক্ষে সাধু সুন্দর সিং কে এবং তিনি কোন্ ধর্ম মেনে চলেন সে সংবাদ রাখাটা দরকার মনে করতাম না। আজ নতুন করে সেই অপরিচিত লোকের পরিচয় করিয়ে দেবার ভার আমারই ওপর পড়ল দেখে মোটেই দুঃখিত হলাম না। চাষাদের

কে না ঠকায়? যারা ঠকায় না তারাই হ'ল একের নম্বর মূর্খ। আমিও চাষাদের ঠকালাম। আমি বল্‌লাম "সাধু সুন্দর সিং ভারতের লোক। তিনি যিশুকে দেখেছেন। বর্তমানে তিনি হিমালয়ে বাস করছেন।" আমার কথা শুনে চাষারা নাকে বুকে ক্রস চিহ্ন আঙ্গুল দিয়ে এঁকে নিল, তারপর আমাকে প্রচুর দই এবং রুটি এনে দিল। আমি তাদের দেওয়া খাদ্য কিছুই গ্রহণ করলাম না দেখে চাষারা আমার কথা ধ্রুব-সত্য বলেই গ্রহণ করল। এমনি করেই দুনিয়ার চাষারা তথাকথিত জ্ঞানীদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও প্রতারিত হবে।

এখনও কিন্তু আসল কথাটি বলা হয় নি। যত অবতার যে দেশেই জন্ম গ্রহণ করুননা কেন, তাঁদের পরীক্ষাক্ষেত্র হ'ল ভারতবর্ষ। বলকানের পাদরীরা যখনই ধর্ম সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কিছু নজির দেয় তখনই তারা বলে, ঐ দেখ সাধু সুন্দর সিং যিশুর পেছনে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছেন যিশুই ঠিক আর সবই ঝুটা।" সাধু সুন্দর সিং একজন ভারতবাসী। ভারতবাসীর ধর্মের দিকের গুণগরিমা বলকানে মস্তর। ভারতেরই একজন বিশিষ্ট লোক যিশু সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছেন, অতএব যিশুকে আর পায় কে? যিশুই হলেন একের নম্বর ধর্মপ্রচারক। তারপরই আমি আর একটা "সেন্টিমেন্ট" দিলাম যার ফলে সাধু সুন্দর সিং, ভগবানের পুত্র যিশু এবং ভগবান এই তিন জনেরই জয় হয়ে গেল। চাষাদের কাছে অনেক সময় দাঁড়িয়ে থাকাটা পছন্দ করলাম না। এগিয়ে যেতে ইচ্ছা হল, কারণ আজই আমদের ফিলিপো পল্লীতে পৌছতে হবে। সুন্দর এবং সোজা পথে আমরা চলতে লাগলাম। লোকজন বড় বেশি পেলাম না। আমার মনে হল যাকে আমি সোজা পথ বলেছি তা ছিল একটি ফাড়িপথ! বুলগার যুবক লোকের সঙ্গে কথা বলা পছন্দ করত না।

ফাড়ি পথে আসার জন্য বুলগেরিয়ার অভ্যন্তর দেখার সুযোগ হয়েছিল। অভ্যন্তর দেখাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বেলা দুইটা পর্যন্ত চ'লে আমরা শহরতলীতে পৌছলাম। শহরতলীতে গরিব লোকের বাস। গরিব লোক কেমন করে দিন কাটায় তাই দেখার জন্য আমি ব্যগ্র ছিলাম। সাথীদের বললাম যদি তারা অনুমতি দেয় তবে আজ শহরতলীতেই দিনটা কাটিয়ে দিয়ে পরের দিন সকাল বেলা ফিলিপো পল্লীতে যাওয়া যাবে। বুলগার যুবক এতে রাজি হল এবং শহরতলীর সবচেয়ে একটি নিকৃষ্ট হোটেলে তিন খানা রুম ভাড়া করা গেল। প্রত্যেক রুমের ভাড়া মাত্র দ্বাদশ ডলার।

হোটেলে পৌছে রুম ঠিক করেই আমাদের সাইকেল তিনখানা বুলগার যুবক ঘরের পেছনে ছোট একটা রুমে লুকিয়ে রাখল। আমার জন্য একটি সুট ভাড়া করে আনল। আমি ব্রিচেজ পরিত্যাগ করে সুট পরলাম। হোটেলের মালিক আমাদের খাবার ব্যবস্থা করল। আমাকে জিপসী বলেই বুলগার যুবক হোটেলের মালিকের কাছে পরিচয় করে দিল। রুমেনিয়ার জিপসীরা নাকি বেশ শিক্ষিত এবং তারা কম কথা বলে সেজন্য আমাকে রুমেনিয়ান জিপসী বলেই পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

হোটেলের ভেতরেই খাবার ব্যবস্থা হল। সামান্য রুটি, পেঁয়াজ সিদ্ধ এবং কফি খেয়েই রাত কাটাতে হয়েছিল। রুমেনিয়ার জিপসীরা নাকি মাখনও খায় না। বিনা

মাখনে রুটি খাওয়াটা কত কষ্টকর তা সকলে অনুভব করতে পারেনা। এত রুমেনিয়ার জিপসীরা কত দরিদ্র তার একটি নিদর্শন পেয়েছিলাম বলে মনকে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম হয়েছিলাম।

সন্ধ্যা হবার পরই শহরে, লোক দলে দলে শহরের বাইরে বেড়াবার জন্য বেরিয়ে পড়ল। উপকণ্ঠের দরিদ্র যুবতীরা শরীর বিক্রয়ার্থ নির্জন কাফেতে বসে অপেক্ষা করছিল। ধনীরা এসে তাদের কাছে বসে তাদের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে হাত ধরে অন্যত্র চলে যাচ্ছিল। কামদেবের লীলা প্রচুর পরিমাণে চলছিল। যারা শরীর বিক্রী করছিল তারা ছিল দরিদ্র, পেটের দায়ে এবং শরীরটাকে ঠাণ্ডা হতে রক্ষা করার জন্য, এরূপ অপকর্মে নিজকে বিলিয়ে দিচ্ছিল। আমার চোখে সেই অপকর্ম যেন একটু ঠেকছিল। ইহুদী যুবক আমাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য বললে, এটাও পুঁজিবাদীদের কুকর্মের ফলে। তোমাদের দেশে পুঁজিবাদ বিকশিত হয়নি বলেই সতীত্বের মাহাত্ম্য এখনও আছে, যেদিন পুঁজিবাদ সম্পূর্ণ ভাবে আত্মবিকাশ করবে সেদিন তোমাদেরও আমাদের অবস্থা হবে।

আমি এই দৃশ্য দেখতে প্রস্তুত ছিলাম না বলেই রুমে এসে শুয়ে থাকলাম।

পরের দিন যখন পথে বেরুলাম তখন আমার সাথীদের সাইকেল ক্রমাগত লাফাতে লাগল, কারণ আমরা পাথর দেওয়া পথে চলছিলাম। সেরূপ পাথরে বাঁধানো পথ হাওড়ার পুলের কাছে পূর্বে ছিল, এখন আর নেই। আমার সাইকেল বোঝাই ছিল বলে ঝাঁকানি কম অনুভব করছিলাম, আমার সাথীরা ঝাঁকানি সহ্য করতে না পেরে পায়ে হাঁটতে আরম্ভ করল। আমি ধীরে সাইকেল চালাতে পছন্দ করতাম, তাই আর সাইকেল হতে নামলাম না। পথের গাঁথুনি দেখে মনে হ'ল এরূপ গাঁথুনি দেওয়া পথ স্লাভরাই বেশির ভাগ তৈরী করে। চীনের হারবিন নামক শহরটি রুশরা গঠন করেছিল। সেখানেও এরূপ করেই পাথরের গাঁথুনি দেওয়া হয়েছে। হারবিন এবং ফিলিপোল্লীর দূরত্ব কত হাজার মাইল তা ভূগোল দেখে নির্ণয় করলেই হবে, কিন্তু এক একটি জাতের কারুকার্যের বৈশিষ্ট্য এমনি ভাবে প্রকাশিত হয় যে, স্থানের দূরত্ব নেই, বৈশিষ্ট্য লোপ করতে পারেনা।

শহরের অন্তঃস্থলে পৌঁছে আমরা যে হোটেলে গেলাম সে হোটেলে আমাদের থাকা হ'ল না। ইহুদী যুবকের একজন আত্মীয় একটি গলিতে হোটেল করেছেন। ইহুদী যুবক আমাকে তার আত্মীয়ের হোটেলে নিয়ে যাওয়াই পছন্দ করল। বড় হোটেল পরিত্যাগ করে আমরা ছোট হোটেলে গেলাম। যুবকের আত্মীয় আমাকে একখানা সজ্জিত রুম কম ভাড়াতেই দিলেন। যুবক দুটি আমাকে হোটেলে রেখেই বিদায় নিল। এদের এত তাড়াতাড়ি বিদায় নেবার কারণ হ'ল এরা পুলিশের চক্ষে ধুলি দিয়ে ঘুরে বেড়ায় এবং অপ্রকাশ্যে চাষাদের ক্ষেপাবার চেষ্টা করে।

এসব দেশে ক্ষেপানো মানেই হল বিদ্রোহ করার চেষ্টা। যে দেশের লোক বিদ্রোহ করতে যত সক্ষম সে দেশে বিদ্রোহীদের প্রতি নির্যাতন হয় তত বেশি। বুলগেরিয়ার চাষা ক্ষেপিয়ে তোলার ভার যারা নিয়েছিল তারা এমনি ভাবে অত্যাচারিত হবার পর

অনেকেরই জ্ঞান লোপ পেত। আমি ইউরোপবাসীকে ধন্যবাদ দিই কারণ অত্যাচার সহ্য করেও ইউরোপের খাঁটি লোক কখনও পথভ্রষ্ট হয় না। যে পণ করে কাজে অগ্রসর হয় সে কাজ তারা করবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়।

ফিলিপো পল্লী

সাথী দুজন চলে যাবার পর সুন্দর বিছানার উপর অনেক ক্ষণ শুয়ে থাকলাম। তখনকার দিনে কতক্ষণ শুয়ে থাকার পরই শরীরে শক্তি ফিরে আসত এবং বাইরে যাবার জন্য ইচ্ছা হ'ত। বিশ্রাম করে বাইরে বেড়িয়ে এলাম। এতে শরীরটা আরও ভাল অনুভব করতে লাগলাম। হোটেলের পাশেই একটি ছোট খাবারের দোকান ছিল। সেই দোকানে গরিব লোকই খেতে যেত। জিপ্সীরাও গরিব। তারাই খাবারের দোকানটিকে দখল করে রাখত। ঘুরে আসবার সময় কয়েকজন জিপ্সী আমাকে দেখতে পেয়ে ভেবেছিল আমিও তাদেরই একজন, সেজন্য তারা আমাকে ডাক দিল। হোটেলের মালিক দরজার কাছে বসে ছিলেন। আমাকে জিপসী অধ্যুষিত হোটেলের দিকে যেতে দেখে সেদিকে যেতে নিষেধ করলেন। আমি তাঁর কথা শুনলাম এবং হোটেলে ফিরে এলাম। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য জিপ্সীরাও হোটেলে এল এবং তাদের নিজের ভাষায় আমার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। তাদের অনেক কথা আমি বুঝতে পারলাম। হোটেলের মালিক ইংলিশ যেমন বলতে পারতেন তেমনি বলতে পারতেন জিপ্সীদের ভাষা। শুধু তাই নয়, তিনি এক জন শিক্ষিত লোক।

তিনি আমাকে বললেন ইউরোপের জিপসীদের ভাষা সর্বত্র সমান। বুলগেরিয়ার জিপ্সীরা অন্য যে কোন দেশের জিপসির ভাষা বোঝে। জিপসীরা বলকানের সর্বত্রই বাস করে। তারাই ছিল এদেশের পুরাতন বাসিন্দা। এরা বলে তারা এসেছিল পূর্বদেশ হ'তে। অতি শীত-প্রধান দেশে এরা এগিয়ে গিয়ে বসবাস করেনি। সেজন্যই জার্মাণী স্কাণ্ডেনেভিয়া প্রভৃতি দেশে এদের বসবাস দেখা যায়না। এদের একটি বিশেষ ধর্ম আছে, সেটি হল লিঙ্গ পূজা করা। লিঙ্গ, পূজা, ভগবান ইত্যাদি শব্দ দ্রবিড়দের দ্বারাই ব্যবহার করা হ'ত; পরে এই শব্দগুলিকে শুদ্ধি করে সংস্কৃত করা হয়েছে।

দশ হতে বার জন দ্রাবিড় হোটেলের বসবার ঘরে বসেছিল। তাদের অবয়ব দেখে বুঝলাম, এদের শরীরের গঠনের সঙ্গে নরডিক শরীরের গঠনের কোন প্রভেদ নাই। নরডিকগণ শ্বেতকায় আর এদের শরীরের রং হল ধূসর বর্ণের। এতদিন শীত-প্রধান দেশে থেকেও এদের শরীরের রং বদ্‌লায় নি। অনেকে বলেন শীত-প্রধান দেশে থাকলেই শরীরের রং বদলায়, তা কিন্তু সত্য নয়। অনেক নিগ্রোও শীত-প্রধান দেশে বংশ পরম্পরা বাস করে আসছে, তাদের শরীরের রং যেমনটি ছিল আজও তেমনি আছে।

হোটেলের মালিক আরও বললেন যদি দৈবাৎ কোনও জিপসী স্ত্রীলোকের দিকে শ্বেতকায়ের সন্তান হয় তবে সেই স্ত্রীলোক শ্বেতকায় সন্তানকে প্রতিপালন না করে

কোনও শ্বেতকায় পরিবারকে দিয়ে দেয়। জিপ্‌সীরা যদিও সতীত্ব বলে কোন কিছুর দাবী করেনা তবুও ভিন্ন জাতের লোকের সঙ্গে জিপ্‌সী স্ত্রীলোক কোন মতেই বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয় না। আমাদের দেশের রাজপুত রমণীরা পূর্বকালে যেমন করে আগুনে পুড়ে মরা পছন্দ করতেন তবুও ভিন্ন ধর্মের লোকের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পছন্দ করতেন না তেমনি করে জিপ্‌সী রমণীরাও ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া অপমানজনক মনে করে। শুধু তাই নয় তারা নিয়ম মত প্রতিশোধও নেয়।

যে সময়ে বল্‌কান দেশটা তুরুকদের অধীনে ছিল সে সময়ে অনেক বুলগেরী ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়, জিপ্‌সীরা কিন্তু তা করতে রাজী হয় নাই, সেজন্য তাদের স্ত্রীলোকদের ধরে তুরুক, আরব, বুলগার, রুমেনিয়ান এসব জাত বিয়ে করতে থাকে। নিরুপায় জিপ্‌সী স্ত্রীলোকগণও প্রকাশ্যে পতিভক্তি দেখাতে থাকে। খৃষ্ট এবং ইস্‌লাম ধর্মমতে চলতে থাকে কিন্তু পরে দেখা গেল জিপ্‌সী স্ত্রীলোক দু'তিনটি সন্তান হবার পরও সন্তান সমেত স্বামীকে বিষ প্রয়োগে হত্যা ক'রে নিজেও বিষ খেয়ে মরেছে। আরবের সঙ্গে মরুভূমিতে গিয়েও জিপ্‌সী স্ত্রীলোক আরবকে শান্তিতে বাস করতে দেয়নি। ঘোড়া, উট এসবের উপরও বিষ প্রয়োগ করতে জিপ্‌সী স্ত্রীলোক কসুর করত না। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে একটি জিপ্‌সী স্ত্রীলোক সম্পূর্ণ একটি আরব পরিবারকে বিষ প্রয়োগে নিশ্চিহ্ন করে নিজেও মরেছে। আজও আরব দেশে স্ত্রীহরণ প্রথা বর্তমান আছে কিন্তু জিপ্‌সী স্ত্রীলোককে কেউ হরণ করেনা, জিপসী স্ত্রী-লোকের প্রতি কেউ অত্যাচারও করেনা কারণ জিপসী স্ত্রীলোক তার নিজের জাতের কথা কখনও ভোলেনা। শিব উপাসক জিপসি পরিবার আরব দেশের সর্বত্র বিচরণ করতে দেখা যায়। আমার সঙ্গে সেরূপ পরিবারের দেখাও হয়েছে। কিন্তু কেউ তাদের প্রতি অত্যাচার করতে সাহস করেনা।

ভারতের পুরাতন সভ্যতার সংবাদ নিলে দেখতে পাওয়া যায় মহাভারতের সময়ের লোক বর্ণ-সঙ্করের ভয়ে ভীত ছিল। জিপসীরাও ঠিক তেমনি ভাবে বর্ণ-সঙ্কর যাতে তাদের মাঝে না হয় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করত। যদি তাই না হ'ত তবে জিপ্‌সীরা অন্যান্য জাতের সঙ্গে অনেক পূর্বেই মিশে গিয়ে তাদের অস্তিত্ব হারাতে বাধ্য হ'ত। সেরূপ ভাবে অস্তিত্ব হারানো স্বাভাবিক। অনেকে অপরের সঙ্গে মিশে নিজের জাতের সত্তা হারিয়েছে। এতে যারা বাদ সাধে তারা পৃথিবীতে উন্নতি করতে পারেনা। হংগেরীতে যাবার পর দেখতে পেয়েছিলাম, "মাঝারু" বলে একটা ভাষা আছে, কিন্তু মঙ্গোলিয়ান বলে একটি জাতের অস্তিত্ব নাই। ভাষা থাকে, যদি ভাষাকে পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে নেওয়া যায় নতুবা ভাষাও মরে। সংস্কৃত ভাষা আজ আর ব্যবহার হয় না, কিন্তু বাংলা, গুজরাটি, গুরুমুখী, হিন্দুস্থানী, এসব ভাষা আজও বেঁচে আছে এবং ভবিষ্যতেও বেঁচে থাকবে কারণ এসব ভাষা পরিবর্তনের দিকে এগিয়ে চলেছে। আরবী, হিব্রু এই দুটি ভাষা পৃথিবী হতে লোপ পেতে বসেছে কারণ শব্দ-সম্ভার তাতে বাড়ানো হচ্ছে না, সে জন্যই আরবী এবং হিব্রু ভাষার বদলে আরবগণ আজকাল ফ্রেঞ্চ ভাষা ব্যবহার করে।

জিপসীদের সঙ্গে আমার বেশি কথা হল না কারণ বিকেলের দিকে টলস্টয় রেঁস্তোরায় গিয়ে যাতে আমি শাকশব্জি খেতে পারি তার ব্যবস্থা হয়েছিল। ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই টলস্টয় রেঁস্তোরা বলে এক শ্রেণীর রেঁস্তোরা দেখতে পাওয়া যায় যার অপর নাম হ'ল ভেজিট্যারিয়ান্ইস্কি রেঁস্তোরা। এই নামীয় রেঁস্তোরায় মাছ মাংসের ব্যবহার হয় না এমন কি ড্রিপিংও ব্যবহার করা চলেনা। বাদাম তেল, তুলার বীজের তেল, তিলের তেল এই জাতীয় তেল দিয়েই খাদ্য পাক করা হয়। যদি কারো ইচ্ছা হয় তবে মাখন, দধি, দুগ্ধ, ঘনদুগ্ধ এবং পনির খেতে পায়। এসব জিনিসও এই রেঁস্তোরাতে আমিষ বলে গণ্য হয়। রাত প্রায় আটটার সময় ফিলিপো পল্লীর ভেজিট্যারিয়ান্ইস্কি রেঁস্তোরায় গিয়ে খেতে বসলাম। খাবার আরম্ভ করার পূর্বে হোটেলের মালিক আমাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

খাবারের দোকানে কেউ কারোকে পরিচয় করিয়ে দেয় না। আমাকে এখানে পরিচয় করিয়ে দেবার কয়েকটি কারণও ছিল। প্রথম কারণ হ'ল আমি মঁশিয়ে স্থলেমানের বন্ধু, মঁশিয়ে স্থলেমান যুবসমাজে সুপরিচিত। দ্বিতীয় কারণ হ'ল আমি ইউরোপে আরাম করে বেড়াতে আসিনি, কিছুটা জানবার এবং অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য ইউরোপ পর্যটনে বের হয়েছি। যাতে করে আমি ইউরোপ সম্বন্ধে জ্ঞাতসার হতে পারি তারই ব্যবস্থার জন্য অসময়ে লোকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। যাদের সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তারা নানা বিষয়ে পণ্ডিত ছিলেন। পণ্ডিতদের কাছ থেকে যাতে আমি কিছুটা জানতে পারি সেজন্য মঁশিয়ে ডেভিড স্থলেমান কয়েকজন পণ্ডিতকে তার রেঁস্তোরায় নিমন্ত্রণ করতেও ভোলেননি। রেঁস্তোরার মালিককে মঁশিয়ে স্থলেমান আমার খাবারের খরচ দেবেন তাও জানিয়ে দিলেন।

দোতলায় রেঁস্তোরা অবস্থিত ছিল। রেঁস্তোরার দেওয়ালে কোনরূপ ছবি ছিলনা। ঘরখানা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল। টেবিল চেয়ারগুলি সাদাসিধে তবে টেবিলের উপর যে সকল টেবিলক্লথ ছিল তাতে নানারূপ ছবি আঁকা ছিল। আমি যে টেবিলে বসেছিলাম সেই টেবিলের টেবিলক্লথে একটা মস্ত বড় চীনের ড্রাগন আঁকা ছিল। টেবিল ক্লথে কেন যে চীনা ড্রাগন অঙ্কিত ছিল তা আমি মোটেই বুঝতে পারিনি। যে সকল খাদ্য আমাকে দেওয়া হয়েছিল তা প্রায়ই সিদ্ধ তবে মুখরোচক তা আমি বলবই। সেরূপ খাদ্য আমি ক্রমাগত এক বৎসর খেলেও মুখ বদলাতে অন্যত্র যাবার দরকার মনে করতাম না। মটরশুঁটি বেশ করে সিদ্ধকরে তাতে সামান্য মুন, টমেটো এবং চিনি মিশিয়ে একটি প্লেটে দেওয়া হয়েছিল। তা হয়ত অনেকেই পছন্দ করবেন না; কিন্তু আমার কাছে এই প্লেটটি বেশ লেগেছিল। ঘনদুধের সঙ্গে চিনি মিশিয়ে রুটির সঙ্গে খেতে ভালবাসতাম বলে নীচ থেকে তা আনিয়ে খেলাম। নীচে দই এবং ঘনদুধের দোকান ছিল। চারটি দিন ফিলিপো পল্লীতে ছিলাম, এই চারদিন অন্য কোনও হোটেলে না গিয়ে ভেজিট্যারিয়ান্ইস্কি হোটেলে দুবেলা খেয়েছিলাম। এতে আমার খরচ এক পয়সাও লাগেনি উপরন্তু নানা দেশের পণ্ডিতদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুসীই হয়েছিলাম।

পণ্ডিতদের কাছে বসে সময় কাটাতে আমি পূর্বেও ভালবাসতাম এবং এখনও ভালবাসি। ফিলিপো-পল্লীতে এসে নানা দেশের পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হওয়াতে বড়ই আনন্দ হয়েছিল

রুশ্‌ জার্মান, ফ্রেঞ্চ, গ্রীক, আর্মানী, ইহুদী, রুমেনিয়ান, তুরুক, আরব, এসব জাতের পণ্ডিতদের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল। ইংলিশ, স্কচ, আইরিশ এবং আমেরিকান পণ্ডিতগণ পদার্পণ করেন না। দুঃখের বিষয় ফ্রেঞ্চ ভাষা আমার জানা না থাকায় এই পণ্ডিতদের সঙ্গে কথা বলতে বড়ই কষ্ট পেতে হয়েছিল। ইংলিশ বলতাম বলে অনেকে আমার সঙ্গে ঘৃণা করে কথা বলতেন না—আমি যা বলতাম তাই শুধু শুনে যেতেন।

পুরাতন ফিলিপো-পল্লী আর পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে থাকেনি। ফিলিপো-পল্লী এবার নতুনের গন্ধ পেয়েছে। এখানে নানা দেশের পণ্ডিতদের সমাবেশ হতে আরম্ভ হয়েছে। এবং আমি যখন সেখানে পৌঁছেছিলাম তখন নাকি বুলগেরিয়ান্‌ সরকার বিদেশাগত পণ্ডিতদের নিয়ে মহা বিপদে পড়েছিলেন। বিদেশাগত পণ্ডিতদের তাড়াবার জন্যও বন্দোবস্ত করছিলেন। এসব পণ্ডিত নানা ভাবের ভাবুক। ন্যায়, দর্শন, বিজ্ঞান এসব নিয়েই নবাগত পণ্ডিতগণ সারাদিন ব্যস্ত থাকতেন অথচ তাদের খরচ কোথা হতে কি ভাবে আস্‌ত তাই নিয়েই বুলগেরী সরকার মাথা ঘামিয়েও কুলকিনারা করে উঠতে পারছিলেন না। প্যারী, লণ্ডন, বার্লিন এবং অন্যান্য বড় বড় শহর থাকতে তাঁরা কেন এখানে এলেন তাও ছিল বিবেচ্য বিষয়। ইউরোপে সন্দেহের উপর নির্ভর করে কাউকে কারাগারে পাঠানো মহা অন্যায় কাজ, সেজন্য এই পণ্ডিত-মণ্ডলীকে দেশ থেকে বের করে দেওয়া অথবা কমিউনিষ্ট সন্দেহ করে জেলে আবদ্ধ করাও সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। পণ্ডিতগণও কমিউনিজম প্রচার করতেন না। এই পণ্ডিত-মণ্ডলী ভগবান বলে কিছু আছে বলে স্বীকারও করতেন না; আবার প্রকাশ্যে অস্বীকারও করতেন না। তবে মানুষের ইতিহাস তারা বলা কওয়া করতেন, যা পৃথিবীর প্রায় সভ্যদেশের জ্ঞানীগণকে করতে দেওয়া হয়। কিন্তু এতেও সন্দেহ ছিল। এরা কি বলতে কি বলে ফেলে তা শোনবার জন্য লোক নিযুক্ত করা হয়েছিল। এসব লোক কেউ কেউ জ্ঞানীদের সংস্পর্শে এসে সরকারী চাকরি পরিত্যাগ করত। বুলগার সরকারের চিন্তনীয় বিষয় ছিল এঁরা এমন কি কথা বলে যা শুনে সরকারী চাকর চাকরী পরিত্যাগ করে একদম উধাও হয়ে যায়। বাস্তবিকই এসব নিয়ম তান্ত্রিক সরকারের ক্ষতিকারক ছিল। রাজা বুরীশকে সকলেই ধার্মিক এবং জনসেবক বলে জানত। এরূপ রাজার রাজত্বে বেহায়া পণ্ডিতদের সমাগম হওয়া তারপর সরকারী চাকরের উধাও হয়ে যাওয়া বড়ই অন্যায় বলেই সকলেরই মনে করত।

কিন্তু ঐ পূবের আকাশে এক খণ্ড মেঘ উঠেছে। মেঘ ক্রমেই কালো হয়ে উঠছে। প্রবল বাতাস না হ'লে এই মেঘ বর্ষণ করবেই। এই কালোমেঘকে আরও পূবে হটিয়ে দেবার জন্য পশ্চিমের সাদা সূর্যের দল, প্রথম দল পাকাতে আরম্ভ করল, তাতেও কিছু হল না, সেজন্য জেকোস্লাভাকিয়ায় সোকল (Sokal), জার্মানীতে ন্যাশনাল সোসিয়েলিষ্ট, পোলাণ্ডে জমিদার সভা, রুমেনিয়ায় রাজা কেরল, গ্রীসে এন্‌টি বুলগার প্রপাগাণ্ডা, যুগস্লাভিয়ায় মণ্টেগ, আলকন, মাপারু, এদের মাঝে প্রপাগাণ্ডা আরম্ভ হল। ঐ কমিউনিজমের তুফান আসছে, বলকানের অবস্থা বিষময় হয়ে উঠবে। পূর্বের কালোমেঘকে ঠেকিয়ে রাখবার সুবন্দোবস্ত যাতে হয় তারই জন্য অনেকে অকাতরে টাকা বিতরণ করতে লাগল। নতুন নতুন সংবাদ পত্র অকালে জন্মগ্রহণ করল। কিন্তু এই ভাড়াটে লেখকদের লেখা পড়বার মত সময়

কজন পেল? রুটি, মাখন, মাংস, পোশাক এসবের দাম ক্রমাগতই বাড়তে লাগল। বুলগেরিয়ার যুগস্লাভিয়ার, হংগেরীর, চেকোস্লোভাকিয়ার, রুমেনিয়ায়, গ্রীসে, তুর্কীয়ায়, আলবেনিয়ায় সীমান্তরক্ষী যেমন করে বাড়তে লাগল, উৎপন্ন দ্রব্য, পণ্যদ্রব্য এসবেরও আমদানী এবং রপ্তানী তাড়াতাড়ি কমতে লাগল। সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ, ফ্রান্স এবং আমেরিকা বলকান রাজ্যগুলিকে পৃথক পৃথক রেখে আপনাদের মতলব উদ্ধার করতে লাগল। এমন কি সবচেয়ে ক্ষুদ্ররাজ্য স্লোভাকিয়া হুমকি দিয়ে বলতে লাগল, আমরাও স্বাধীনতা চাই। দূর থেকে আধপাগলা ফেনাটিক যুবকের দল বগল বাজিয়ে স্ব স্ব দেশের এবং স্ব স্ব রাজার জয়গান গাইতে লাগল। বলকানে যখন উচ্চনিনাদে এক দেশের লোক অন্যদেশের লোককে গাল দিচ্ছিল সেই শুভ মুহূর্তে আমি ইউরোপের দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছিলাম এবং পণ্ডিতদের সাহায্যে বলকানে এবং মধ্য ইউরোপে অনেক কিছু অনুভব করেছিলাম যা এখানে অতিবিলম্বে বলতে আরম্ভ করেছি। বিলম্বে বলায় আমার দুঃখ হচ্ছেনা কারণ আমাদের দেশের লোকের রাষ্ট্রনীতিতে জ্ঞান খুবই কম। পুরাতন কথা জানলে ক্ষতি হবেনা এটা নিশ্চয় কথা।

পণ্ডিতগণ ধর্মচর্চাও করতেন। একজন তুরুক পণ্ডিত বললেন, বুলগেরিয়া এবং গ্রীসের মধ্যে ধর্ম নিয়ে সত্বরই বোধহয় লড়াই আরম্ভ হবে। ধর্মযুদ্ধ হতে যাতে করে আমরা বাঁচতে পারি তারই আপ্রাণ চেষ্টা করবার জন্য আমি এখানে এসেছি। আমি তুর্কীয়া ভ্রমণ করে এসেছিলাম সেজন্য এই তুরুক পণ্ডিত আমাকে বড়ই ভালবাসতেন। তিনি ইংলিশ ভাষাকে পর্যন্ত ঘৃণা করতেন। সেজন্য এক জন দোভাষী নিয়ে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতেন।

মরুভূমিতে হঠাৎ ঘূর্ণি বায়ু বইতে আরম্ভ করে। ঠিক তেমনি হঠাৎ বুলগেরিদের এবং গ্রীকদের ভেতর গোঁড়া ধর্মমন্দিরগুলির মধ্যে বেশ একটা গণ্ডগোল বেধে ওঠে। হঠাৎ বুলগেরিয়াতে এক দল লোক গ্রীক পাদরীদের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। তারা রটাতে থাকে গ্রীক পাদরীরা বড়ই ব্যভিচারী। এদের ধর্মজ্ঞান ত নেইই উপরন্তু এরা রাষ্ট্রনীতি নিয়েই ব্যস্ত। অনেকে আবার গ্রীক পাদরীদের গুপ্তচর বলেও সন্দেহ করতে লাগল। গোল বেশ পেকে উঠল। অনেক গ্রীক পাদরী স্ব-ইচ্ছায় বুলগেরিয়া পরিত্যাগ করে স্বদেশে গমন করাই ভাল মনে করল। যারা প্রকৃতই ধর্মবিশ্বাসীছিল তারা কিন্তু বুলগেরিয়া পরিত্যাগ না করে স্ব স্ব স্থানেই থেকে গেল। যারা পাদরীদের গুপ্তচর বলছিল তারা পাদরীদের বিরুদ্ধে দোষের কিছুই প্রমাণ করতে পারলনা। পাদরীদের টেলিফোন, অশ্বযান, বাইসাইকেল, মোটরকার এসব কিছুই ছিলনা। তারা এসব ব্যবহারও করতেন না। তাঁরা ব্যবহার করতেন তাঁদের চরণযুগল আর স্টিফেন্‌স্‌-আবিষ্কৃত রেল পথ। অর্থডক্স্‌ পাদরীদের বদলীও একস্থান হতে অন্যস্থানে বেশি হ'ত না। এরূপ অবস্থায় তারা কি করে স্পাই-এর কাজ করতে পারে তা না বুঝেই তাদের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হ'ল। গ্রীকরাও এথেন্‌সে বুলগারদের প্রতি প্রতিশোধ নেবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হল। গ্রীক রাজা জর্জ ইংলেণ্ডে বসে মজা করে দিন গুণছিলেন। হটাৎ এথেন্‌স্‌

হতে তাঁর কাছে লোক যাতায়াত করতে লাগল। রাজারা যেমন করে নিজের সম্মান বৃদ্ধি করেন, গ্রীক রাজাও তাই করতে লাগলেন। প্রজা বুঝল রাজা শুধু রাজা নন তিনি এক জন্‌ বৌদ্ধ যাকে আমরা বর্তমান বাংলা ভাষায় বলি রাজর্ষি। রাজা ঋষি হয়ে দেশে ফিরতে সক্ষম হয়েছিলেন। যখন রাজা জর্জ দেশে ফিরেছিলেন তখন আমি বলকান পরিত্যাগ করে, ইউরোপ ভ্রমণ সমাপ্ত করার পর, ভারতে ফিরে এসে আফ্রিকার দিকে রওয়ানা হবার জন্য আয়োজন করছিলাম।

ইউরোপের সবচেয়ে দরিদ্র জাত হ'ল গ্রীক। শুধু তাই নয়, অনুপাত কষলে দেখা যায় ইউরোপে যত জাত আছে তার মধ্যে গ্রীকরাই সবচেয়ে জ্ঞানী। গ্রীকদের মাথা হতেই কমিউনিজমের শেষ স্তর এনার্কিজম বের হয়েছিল। এনার্কিজম কি এবং কি রকমে তা মানুষ ব্যবহার করবে সে বিষয় আমার বক্তব্য নয়, আমার বক্তব্য হল গ্রীকরা পলিটিক্স বেশ ভাল রকমেই বোঝে এবং নতুন নতুন থিওরীও আবিষ্কার করতে পারে। ইউরোপ ভ্রমণের সময় বিদেশী ভাষায় যত অভিজ্ঞ লোক পেয়েছি তার মধ্যে গ্রীকদের সংখ্যাই বেশি। স্তাম্বুলে যদি মঁশিয়ে নিকলাইকে না পেতাম তবে তুরুক জাত সম্বন্ধে কিছুই লিখতে পারতাম না। ফিলিপোপল্লীতে আসার পর যদি এই পণ্ডিতমণ্ডলীর দেখা না পেতাম তবে হয়ত ইউরোপে শুধু ভিক্ষা করে সে ভিক্ষার চাল চর্বণ করেই নষ্ট করে ফেলতাম। সেই পণ্ডিতদের অনুগ্রহেই বুঝতে পেরেছিলাম, ইউরোপের অন্তঃস্থল বলকানে বেশ ভাল করেই আগুন লেগেছে। সে আগুন নেবানো কারো দ্বারা সম্ভবপর হবেনা। আমেরিকার উইলকীর 'এক পৃথিবী' এবং ভারতের রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের স্বপ্ন এখান হতেই পূর্ণ হতে আরম্ভ হবে। কারণ বলকান শুধু বিদ্রোহের স্থান নয়, প্রতিশোধেরও স্থান। প্রতিশোধের স্থান বলার একটি বিশেষ কারণ আছে। বড় বড় রাষ্ট্রকেন্দ্রে স্বার্থের কথা যেমন ভাবে চিন্তা করা হয়, বলকানে তেমন করে স্বার্থের কথা চিন্তা না করে প্রতিশোধ নেবার কথা বেশি চিন্তা হয়।

মুস্তাফা কামালের জীবিতাবস্থায়ই তুর্কীয়াতে সোসিয়েলিজমের ভাবধারা তুর্কীর নবযুবকদের মধ্যে এসেছিল। আমি নিজেও তার প্রচুর প্রমাণ পেয়েছিলাম, তবে তুর্কীর কমিউনিস্টদের সঙ্গে ইচ্ছা করেই কথা বলতাম না, কারণ যাদের স্বাধীনতা অপহরণ করার জন্য বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা তৎপর ছিল, তাদের পক্ষে স্বাধীনতা বজায় রাখাই কর্তব্য। মুস্তাফা কামাল পাশাও তুর্কীর কমিউনিস্টদের কিছুই বলতেন না। এতেই বোধ হয় তুর্কীয়ার কমিউনিস্টপার্টি দেশে বিদ্রোহ আনবার চেষ্টাও করেনি। বলকানে কিন্তু কমিউনিস্টরা আত্যাচরিত হ'ত। সেজন্যই বলকান দেশগুলির কমিউনিস্ট গোপনে কাজ করতে বাধ্য হ'ত এবং তাদের কাজের প্রসারও হচ্ছিল। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা বলকানে এসে গোপনে রাজা কেরলের কানে মন্ত্র দিত। এতে রুমেনিয়ার লোককে সময় সময় মহা বিপদেও পড়তে হ'ত। রুমেনিয়ার খনিজ তৈল রুমেনিয়ার কোন কাজেই লাগতনা, অথচ সেই তৈল বৃটিশ জাহাজগুলিকে বিদেশে নিয়ে যেতে সকলেই দেখত। শুধু তাই নয়, গোটা বলকান দেশটাই—এ নয়ত সে—যে কোন সাম্রাজ্যবাদী পরোক্ষভাবে শাসন করত। কতকগুলি

লোক তা বুঝত এবং এরূপ কুকর্ম যাতে না ঘটে সেজন্য দল গঠন করে বাধা দানের চেষ্টা করত।

সাধারণ লোক কিন্তু তা বুঝেও বুঝত না। শান্তিতে বসবাস করার জন্যই আপ্রাণ চেষ্টা করত। শহরে যখন ভিক্ষা করতে বের হতাম তখন দু'একজন লোক আমার সঙ্গে থাকত। তারা সকলেই ইংলিশ জানত। তাদের অনুকম্পায় আমি সাধারণ লোকের কথা বুঝতে সক্ষম হতাম। এক দিন সকাল বেলাতেই ভিক্ষায় বের হয়েছিলাম। ভিক্ষা করার সময় একটি লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। সেই লোকটি আমার সংগের দোভাষীর সাহায্য নিতে অস্বীকার করে এবং দুপুর বেলা সে অন্য আরএক জন দোভাষী নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে জানিয়ে আমাকে বিদায় দেয়। নির্ধারিত সময়ে লোকটি একজন গ্রীক দোভাষী সমভিব্যাহারে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসে। দোভাষী আমাকে জানালেন তাঁর সঙ্গের লোকটির বিস্তর সম্পত্তি কলকাতায় ছিল। ১৯১৪-১৮-এর মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন এবং ফিরিয়ে দেবার নামটিও করছেন না। সে জানতে চাইছিল ১৯১৯ খৃঃ অব্দে যে নূতন ক্ষমতা ভারতবাসীকে দেওয়া হয়েছিল, সেই আইনের ক্ষমতায় কি ভারতবাসীই তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে চায়না? যদি ভারতবাসীই তার সম্পত্তি পাবার পক্ষে বৈরী হয়ে থাকে, তবে সে কি মহাত্মা গান্ধীর কাছে তার সম্পত্তি ফিরে পাবার জন্য আবেদন করবে? এই লোকটিই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য পারীতে গিয়েছিল কিন্তু দেখা পায়নি। যখন সে শুনল এসব বিষয়ে ভারতবাসীর কোনও হাত নেই তখন সে বলল, বৃটিশ বৈদেশিক সচিবের কাছে বার বার আবেদন করেও সম্পত্তি ফিরে পায়নি। লোকটির কথা শুনে আমার দুঃখ হয়েছিল। আমার কাছেই যাঁরা বসে ছিলেন তাঁরা কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করেননি। তারা বলেছিলেন "যুদ্ধ ছিল রাজায় রাজায়। যারা রাজভক্ত প্রজা তাদের পক্ষে দেনাপাওনার কোন কথাই উঠতে পারেনা"। অন্য লোকের মন্তব্য শুনে লোকটি কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ তার মুখের রং বদলে গেল। তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল, শুধু আমাকে বারবার ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় নিয়েছিল।

যারা আমার কাছে বসেছিলেন, সে চলে যাবার পর তাঁরা আমাকে বললেন, এই লোকটি আমাদের বিশেষ পরিচিত, সে এখনও বুঝতে পারেনি আমরা বিদেশীদ্বারা শাসিত হচ্ছি। প্রকৃত পক্ষে সারা পৃথিবীটা তিনটি রাজ্যে বিভক্ত—বৃটিশ রাজ্য, আমেরিকানরাজ্য এবং সোভিয়েট সভা। বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল সমুদায় ইউরোপ, আফ্রিকা এবং সোভিয়েট সভা বাদ দিয়ে সমুদয় এশিয়া। আমেরিকান রাজ্য হলো সমুদয় উত্তর দক্ষিণ আমেরিকা। সোভিয়েট সভার অন্তর্গত পূর্বের রুশরাজ্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এরূপ ভাবে রাজ্য বিভাগের পেছনে রয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনীতির টানাহেঁচড়া, আমি কথা না বাড়িয়ে অন্যান্য কথা আরম্ভ করলাম কারণ আমার মন পণ্ডিতগণের কাছে বসে থাকতে চাইছিল না। বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়া সহর যেন আমাকে টানছিল। অবশ্য এসব জানবার কথা নিয়ে অন্যত্রও আলোচনা করেছিলাম সেজন্য বিষয়টা এখানে ক্ষণিকের তরে চাপা দিয়ে অন্য কথা বলতে বাধ্য হলাম।

মঁশিয়ে সুলেমান্‌ এবং বুলগার বন্ধু আমাকে হোটেলে রেখে কোথায় উধাও হয়েছিল। তাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলাম। তাদের সঙ্গে কোথায় দেখা হবে সেকথা মঁশিয়ে ডেভিডের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম। মঁশিয়ে ডেভিড কতক্ষণ সে সম্বন্ধে কিছুই না বলে কতক্ষণ পর বললেন, আজ আপনি ভেজিটেরিয়ান্‌ইস্কি হোটেলে যাবেন না, আমার সঙ্গে একত্রে বসে খাবেন। বুঝলাম খানার টেবিলেই আমার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছিলনা বলে একটু বেড়িয়ে আসবার জন্য হোটেল হতে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় ঘণ্টা দুই পথে পথে ঘুরে ফেরবার পথে একটি যুবতী আমাকে থামিয়ে একটি শব্দ বললেন সেই শব্দটি হ'ল "কার্তা"। বুঝলাম তিনি আমার পরিচয়পত্র চান। পরিচয়পত্রের অপর নাম হল ভিক্ষা পাবার জন্য আবেদন পত্র। ভিক্ষাপত্র সঙ্গে না নিয়ে আমি পথে বের হতাম না। যুবতী আমার ভিক্ষাপত্র পড়ে তার মনিব্যাগটি খুলে দুটি রজতমুদ্রা দিলেন এবং আমার সঙ্গে একই হোটেলে এলেন। হোটেলের মালিক আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখা মাত্র বল্‌লেন, চলুন খেতে যাই। আমি পেছনের দিকে তাকিয়ে বললাম, এই যুবতী আমার সঙ্গে এসেছেন, দুঃখের বিষয় তাঁর সঙ্গে একটি কথাও বলতে পারিনি। তিনি আমার কাছ হতে পরিচয়পত্র নিয়ে প্রায় এক ইংলিশ পাউণ্ড দিয়েছেন এবং সঙ্গেও এসেছেন। বোধহয় তিনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান। তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন তাঁর কি জিজ্ঞাস্য বিষয় আছে। ডেভিড স্ত্রীলোকটিকেও আমাদের সঙ্গে খাবারের টেবিলে গিয়ে বসতে বললেন।

রান্নাঘরের ভেতরেই খাবার টেবিল ছিল। রান্নাঘর অতীব পরিষ্কার এবং পরিচ্ছন্ন। সুলেমানের স্ত্রী খাবার সজ্জিত করছিলেন আর আমার বুলগার বন্ধু তাঁকে সাহায্য করছিলেন। আমাদের দেখা মাত্র সকলেই বুলগার প্রথায় "আসুন বসুন" বললেন। আমরা দুজন বসার পর আমার বন্ধুদ্বয় আমার পাশে বসলেন। ডেভিড়দম্পতিও বসলেন। বিনা মন্ত্র-উচ্চারণে খাওয়া আরম্ভ হল। খাদ্য অতীব সাধারণ। রুটি, মাখন, দই।

বলতে পারিনা আমার মুখের দোষেই হোক আর শরীরের রং-এর জন্যই হোক, ইউরোপে অতি অল্প স্ত্রীলোকের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। যাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাদের বক্রদৃষ্টি আমার প্রতি পতিত হয়নি। তারা আমাকে সদয় ভাবে গ্রহণ করে যথাবিহিত সম্মান দিয়ে আদরযত্ন করেছেন। কোনোদিন তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে যাইনি অথবা তাঁরাও আমাকে তাঁদের নিয়ে কোথাও যেতে বলেন নি। তবে অনেক প্রেমের পরিণামের গল্প শুনেছি এবং অনেক ভারতবাসীকে ইংলিশ স্ত্রীলোকদের ঠেঙাতে দেখে প্রতিবাদ করেছি, অনেক স্থলে বাধা দিয়েছি, অত্যাচারীকে কিল, চড়, ঠেলা ধাক্কা অনেক করেছি। এসব কিন্তু খাস ইউরোপে একটিও ঘটেনি, ঘটেছে ইংলণ্ডে বিশেষ্য করে লণ্ডনে। তাও ছাত্রমহলে অতি কম, নাবিক মহলেই বেশি। সেজন্য নাবিক্‌দের একত্র করে লেকচার দিয়েছি, তাদের ছেলেদের ডেকে এসব অন্যায় যাতে না ঘটে তার প্রতিবিধান করতেও বলেছি। এসব সভা-সমিতিতে নাবিক এবং নাবিকদের স্ত্রীরাও থাকতেন।

খাবারঘর থেকে বের হয়ে এসে নিজের রুমে বসে সাথীদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলাম। তারা জানাল এখান থেকে সোফিয়ার দিকে একটি মাত্র বড় পথ গিয়েছে। এই বড় পথে

সকল সময়েই লোকজন চলাফেরা করে। পুলিশের লোকও থাকে। এপথে চলা বিপজ্জনক। ছোট এবং সোজা পথ আছে বটে তবে সেপথে বোঝাই করা বাইসাইকেল নিয়ে চলা সম্ভব হবেনা। যদি আমার সঙ্গের ব্যাগটি গাড়িতে করে পাঠিয়ে দিই তবে পার্বত্য পথে আমাকে নিয়ে চলতে তাদের কোন অসুবিধাই হবেনা। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম—

সোফিয়া পৌছুতে কদিন লাগবে ?

এই ছ' সাত দিন, তারপর যদি পথে বিশ্রাম করতে হয় তবে আরও দু' এক দিন।

পথে কোথায় থাকব ?

লোকের বাড়িতে। হোটেল পাওয়া যাবেনা।

খাবারের অসুবিধা হবেনা ত ?

নিশ্চয়ই না বন্ধু।

আর, পুলিশ ?

পুলিশের ভয় আপনার নেই, আমাদের আছে ; যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে বড় পথ ছেড়ে ছোট পথে কেন এসেছেন, তবে বলবেন পথ ভুলে গেছেন।

বড় পথ দেখিয়ে দেবে বলে যদি কেউ এগিয়ে আসে ?

তবে বলবেন রুমেনিয়ায় যাচ্ছেন।

ভিসা যদি দেখতে চায় ?

সীমান্তে গিয়ে ভিসা করবেন বলবেন।

কেউ যদি পথ চলে থাকেন তবে নিশ্চয়ই জানেন পথিকে যখন কয়েকদিন একত্রে পথ চলে তখন তাদের মনে কত বন্ধুভাব হয়। আমাদের মধ্যেও সেরূপ বন্ধুত্বের ভাব হয়েছিল আজ পৃথক হতে হবে বলে বড়ই দুঃখ হল, কিন্তু আমি সেই বেদনাকে মনে আর স্থান দিলাম না। পাহাড়ী ফাড়ি-পথেই তাদের সঙ্গে যাব মনস্থ করে তাদের বললাম, বন্ধুগণ, আমি আপনাদের একই সঙ্গে সোফিয়া যাব। আমার বড় পুঁটলিটির জন্য কোন চিন্তা করতে হবেনা। পরশু সকালেই আমরা রওনা হব। আপনারা প্রস্তুত হোন। আমার কাছে যে টাকা আছে তা দিয়ে তিন জনের খাবার চলবে, কিন্তু হোটেলে থাকা চলবেনা। আমার কথা শুনে উভয় যুবক লাফিয়ে উঠল এবং আরও যাতে টাকার জোগাড় হয় সেজন্য বিকালে নূতন নূতন স্থানে ভিক্ষা করতে যাবে সেকথা তারা আমাকে বলেই রুম পরিত্যাগ করল।

সেদিন বিকালে ভিক্ষা করে কয়েক পাউণ্ড জমিয়ে পরের দিনটা বিশ্রাম করলাম। তারপর সকাল না হতেই আমরা ফিলিপোপল্লী সহর পরিত্যাগ করে একটি ছোট পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। সাথীরা ভাবছিল উঁচুনীচু পার্বত্যপথ ধরে চলতে আমি পারবনা, কিন্তু কয়েক মাইল যাবার পরই তারাই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ল এবং পথের পাশে বসে বিশ্রাম করতে লাগলো। তাদের কাছে এসে বললাম, আমি কিন্তু পরিশ্রান্ত হইনি। তারা আমার কথার জবাব না দিয়ে বিশ্রাম করতে লাগল।

এটা পার্বত্য পথ। তবে হিমালয় পাহাড়ের মত এত খাড়ি-পর্বত এদিকে একটাও নেই। গোল গোল পাহাড়গুলি বেশ দেখায়। আমি চারিদিকের পাহাড়ের দৃশ্যই নয়ন ভরে দেখছিলাম। চাকরী-জীবনে অনেকগুলি উপন্যাস পড়েছিলাম। সেই উপন্যাসবর্ণিত পাহাড়গুলির সঙ্গে যেন এই পাহাড়গুলির বেশ মিল রয়েছে বলেই মনে হল। ইউরোপের উপন্যাসলেখকদের প্রতি বেশ একটি শ্রদ্ধার ভাব জেগে উঠল। পথে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল আমাদের ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্রের কথা। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রমেশচন্দ্র রাজপুতনার পর্বতমালার ছবি যেমন ভাবে এঁকেছেন তেমনটি আজ পর্যন্ত কোন ভারতীয় লেখক আঁকতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। আমাদের ডান এবং বাঁদিকে ছোট ছোট পাহাড় ক্রমেই বড় হয়ে এগিয়ে চলে আকাশের গায়ে মিশেছিল। আমি সেই দৃশ্যটিই দেখছিলাম। মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাতেও পর্বতমালার বর্ণনা করতে গিয়ে রমেশচন্দ্র যেমন ভাবে পার্বত্য পথের বন্ধুরত্ব দেখিয়েছেন এদিকে তেমন কিছু অনুভব হয় না। এদিকের পাহাড়ে কোথাও সবুজ শস্যক্ষেত্র আর কোথাও পাইন বৃক্ষের বন যত্নের সহিত সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ছোট পথটি এঁকে বেঁকে চলেছে। পথের পাশে নদী নালা কিছুই ছিলনা। পথের দুপাশে ডেফোডিলস্ জাতীয় উদ্ভিদ মাত্র গজাতে আরম্ভ করছিল, কারণ তখনও অনেক স্থানে শীতের প্রভাব প্রচুর পরিমাণেই অনুভব করছিলাম।

ঠিক দুপুরের সময় আমরা একটি ফার্মঘরের কাছে এলাম। ফার্মঘরের মালিক তখন ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রবধূ সাংসারিক কাজে ব্যস্ত ছিলেন। আমরা দরজার কাছে উপস্থিত হবা মাত্র একটি কুকুর আমাদের সম্বর্ধনা করল। অদূরে শূকরগুলি গা-ঝাড়া দিয়ে দাঁড়াল। মুরগীগুলি চেয়ে দেখল নবাগত লোকগুলির মুখ আর ফার্মের গাড়িগুলির ঘোড়া নির্ভীকভাবে ঘাস খাচ্ছিল। ঘরে পুত্রবধূও বোধহয় কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন; কিন্তু কে দরজায় তা দেখার জন্য দরজা খুলে বাইরে এসে দেখলেন আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমার সাথীরা পুত্রবধূর পরিচিত ছিল বলেই মনে হ'ল তিনি আমার সাথীদের প্রত্যেকের গালে চুম্বন করলেন এবং তারাও তাঁর গালে চুম্বন করল। চুমা দেওয়া এবং নেওয়াটা হল উত্তর দেশের লোকের সভ্যতা। তুরুক রাজত্বের সময় চুমা দেওয়া এবং নেওয়া লোপ হয়েছিল। বুলগেরিয়া তুর্কী শাসনের কবল হতে মুক্ত হবার পরই পুনরায় চুমা দেওয়া এবং নেওয়া প্রবর্তিত করেছে। চুম্বনের আদান প্রদান হয়ে গেলে আমাকে পুত্রবধূর কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। আমি শুধু মাথানত করলাম, পুত্রবধূ মাথানত করলেন না শুধু আমার হাতধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। উত্তরের সভ্যতা মতে স্ত্রীলোক কখনও কারো কাছে মাথানত করেনা। এমনকি রাজার কাছেও নয়। জারের আমলে রুশদেশে স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা রাজদরবারে কিছুটা খর্ব হয়েছিল, সেই সভ্যতা কাইজার এবং ইংলেণ্ডের রাজা আংশিক ভাবে গ্রহণ করেন। বলকান্ মধ্যইউরোপ এবং দক্ষিণ ইউরোপে সেই নিকৃষ্ট ব্যবহারের প্রবর্তন মোটেই হয়নি, প্রকৃত পক্ষে রুশের রাজা স্ত্রীলোকদের কোনরূপ হীনতা সূচক আচার ব্যবহার গ্রহণ করতে মোটেই রাজি হননি।

চাষার ঘরখানা দ্বিতল। নীচের তলায় পাঁচটি রুম। একটি বসবার, একটিতে অতিথি এলে থাকতে দেওয়া হয়, একটিতে রান্না করা হয়, একটি স্নানাগার এবং অপরটিতে খাদ্যদ্রব্য রক্ষিত হয়। দ্বিতলে পরিবারের লোক বাস করেন। আমাদের অতিথিশালা দেখিয়ে দেওয়া হল, তারপর স্নানাগারও দেখে এলাম। অতিথি-ঘরে পাঁচটি লোহার খাটে গদির উপর সুন্দর পাঁচটি বিছানা যত্নের সঙ্গে গুটিয়ে রাখা হয়েছিল। আমাদের যাবার পরই তিনখানা বিছানা খোলা হল। আমরা বিছানায় বসলাম না। রুমটির ঠিক মধ্যস্থলে কয়েক খানা চেয়ার ছিল, তাতেই বসলাম। গিন্নী তখনও রান্নাঘরেই ছিলেন। কি একটা উত্তম খাদ্য প্রস্তুতে ব্যস্ত থাকার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি আসতে পারেন নি। হাতের কাজ সেরে গিন্নী আসতেই আমার সাথীরা তাঁকেও চুম্বন করল এবং তিনিও প্রতিচুম্বন করলেন। আমি চেয়ার থেকে উঠে একটা দূর থেকে গিন্নীকে নমস্কার করলাম। গিন্নী আমার দিকে তাকিয়ে মাত্র একটু হাসলেন, তারপরই সাথীদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। কথার ভাবে বুঝলাম তিনি আমার সাথীদের শুভানুধ্যায়ী। তাদের সঙ্গে কথা শেষ করে আমার দিকে চেয়ে তিনি কি বললেন তার এক বিন্দুও বুঝলাম না। আমি আমার সাথীদের দিকে চাইতেই সুলেমান বলল "গিন্নী আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন, আপনি এখানে যতদিন ইচ্ছা থাকতে পাবেন" গিন্নীকে ধন্যবাদ জানিয়ে এক খানা চেয়ার টেনে কারো অনুমতি না নিয়েই বসে পরলাম। নিতান্ত পাড়াগাঁয়ে ফার্ম হাউসে কারো অনুমতি না নিয়ে যদি চেয়ারে বসা যায় তবে দোষের হয় না। শহরে অথবা গ্রামে কিন্তু তা হতে পারেনা, অনুমতি নিয়ে চেয়ারে বসতে হয়।

গিন্নী চলে গেলে আমরা একটু বিশ্রাম করলাম, তারপর এক এক জন করে স্নানাগারে যেতে লাগলাম। স্নানাগারে আমি সকলের শেষে গেলাম। আমার নিজেরই এক খানা গামছা ছিল তাই আমি ব্যবহার করার জন্য নিয়ে গিয়েছিলাম। স্নানাগারে গিয়ে দেখি ধব্‌ধবে তিন খানা গামছা একটি টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে। দুখানা গামছা আমার সাথীরা ব্যবহার করেছিল, অন্য খানা অব্যবহার্য অবস্থায় ছিল। অব্যবহার্য গামছা খানা পরীক্ষা করে দেখলাম তাতে ধোপাবাড়ির ছাপ নাই। বাড়িতেই ধোয়া হয়েছে। বেসিনটি আমার সাথীরা ব্যবহার করেছিল, তারা এমনি ভাবে বেসিনটিকে পরিষ্কার করে রেখে গিয়েছিল যা দেখলে মনে হয়না কেউ তা ব্যবহার করেছে। অন্যান্য স্থানেরই সেই অবস্থা। যখন আমি হাতমুখ ধুয়েছিলাম তখন আমার দেশের কথা মনে হচ্ছিল। অসংযত অবস্থায় মলমূত্র পরিত্যাগ করা, জলের অপব্যবহার করা, পরিষ্কার বস্ত্রের ব্যবহার না জানা এসবই বোধহয় জাতিভেদ সৃষ্টির ফলে হয়েছে। ভাবতে ভাবতে এমনি অবস্থায় শোবার ঘরে এসেছিলাম যা দেখে আমার বুলগার সাথী বাথরুমে গিয়ে বাথরুমকে উপযুক্ত অবস্থায় রাখতে বাধ্য হয়েছিল। আমি চিন্তায় এতই মগ্ন হয়েছিলাম যে আমার মুখ থেকে ক্রমাগত কথা বের হয়ে আসছিল। আমার বুলগার সাথী বাথরুম পরিষ্কার করে রেখে এসে সুলেমানকে কি বল্‌ল তারপর সুলেমান আমাকে বলল আপনার "মুখ থেকে অনবরত কি কথা বের হয়ে আসছিল, এর মানে কি? আপনি কি ভূত দেখছেন?" আমি বললাম "ভূত যদি থাকত তবে নিশ্চয়ই আমি ভূত দেখতে পেতাম, আমি ভূত দেখিনি,

দেশের কথা মনে হয়েছিল। দেশে লোক নানারূপ কু-আচার ক'রে একদম অমানুষ হয়ে বসবাস করছে, অথচ মুখে বলছে আধ্যাত্মবাদ। বিদেশে গিয়ে নিজের দেশের নিজের জাতের গলদ বলতে নাই, শুধু নিজের দেশের গলদ কোথায় তাই জেনে নিতে হয়। আমি ভাবছিলাম, যদি জাতিভেদ না থাকত তবে প্রত্যেকেরই নিজ নিজ আবর্জনা পরিষ্কার করতে হ'ত। তখন সর্বসাধারণ বুঝত আবর্জনা মানে কি এবং কোথায় এবং কি ভাবে সেই আবর্জনা ফেলতে হয়। মেথর বলে একটি শ্রেণী যদি না থাকত তবে সর্বসাধারণে আরও সংযত হয়ে এবং সমাজকে শক্ত করে বাস করতে পারত। একের সঙ্গে অন্যের সামাজিক পার্থক্য থাকলে তা হয় না। আমার সাথীদের পরিচয় এখনও আমি দিইনি। তার হল প্রগতিশীল। তখনকার দিনে সমুদয় ইউরোপে প্রগতিশীলদের কোথাও স্থান ছিল না। সোসিয়েলিজম সম্বন্ধে যদি কারো ঘরে কোন বই থাকত অথবা কারো পকেটে যদি সেরূপ কোন বই পাওয়া যেত তবে সেই লোকটিকে বিনা বিচারে কারাগারে পাঠানো হত। আমরা ভালভাবেই জানি বিনা বিচারে জেলে যাওয়া মানে কি? ইউরোপের কারাগারে পলিটিকেল নেতাদের কোনরূপ বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়না। আমার সাথীরা কারাগারে না যাবার জন্যই এক স্থান হতে অন্যস্থানে ক্রমাগত বেড়িয়ে বেড়াত এবং যথাসাধ্য প্রচারকার্য চালাত। তারাও বাথরুম ব্যবহার করেছিল। কিন্তু তারা বাথরুমের অপব্যবহার করেনি, যদিও তাদের মনের মাঝে অনবরত মৃত্যু বিভীষিকা দাঁত বের করে অনবরত তাণ্ডব নৃত্য করছিল। আর আমি। যার অগ্রপশ্চাৎ বলে কিছুই নেই, মুখ থেকে অনর্থক কথা বের হয়, যার দ্বারা বাথরুমের অপব্যবহার হয়। এরূপ ভুলের এক মাত্র কারণ হল, আমি যে সমাজে জন্মেছি সেই সমাজ নামে সমাজ বটে, কিন্তু এই সমাজে মানুষে মানুষে এত পার্থক্য রয়েছে, যার ফলে ভিন্ন সমাজের কথা আমরা কিছুই ধারণা করতে পারিনা। যে সমাজে এত বিভিন্নতা রয়েছে, সেই সমাজের লোক বিদেশের কথা সহজে হজম করতে পারেনা।

নিজের প্রতি, সমাজের প্রতি, বেশ রাগ হ'ল, কিছুই বলা হ'ল না। চুপ করে অনেকক্ষণ বসেছিলাম, তারপর খাবারের জন্য গিন্নী ডাকলেন। মামুলী সে খাদ্য, কিন্তু বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পেঁয়াজ সিদ্ধ, আলু সিদ্ধ আর কয়েক টুকরা মাংস ছিল। মাংস দুম্বার। দুম্বার মাংসের ব্যবস্থা নানা কারণে হয়েছিল। প্রথম কারণ হল, আমি এবং ইহুদী যুবক উভয়েই অ-বুলগার বা অনার্য। অনার্য গোমাংস খায়না এটাই বুলগারদের ধারণা।* এ ধারণাটি শুধু বুলগারদের মধ্যেই আবদ্ধ নেই, সমুদয় স্লাভ জাত, এংলো-সেকসন্, গ্রীক এবং লাটিনদের মধ্যেও এই ধারনা প্রচুর রয়েছে। তার কারণও আছে। হংগেরীয়ান্, আলবেনীয়ান্, তুরুক, আরব, এসব জাত গোমাংসের পক্ষপাতী নয়। ভোজ ইত্যাদিতে এরা মেষমাংসই ব্যবহার করে বেশির ভাগ। গরু,

* আর্য বলে কোনও জাত নাই তা অনেকেই বলেন তবে আর্য সংস্কৃতি বলে একটি সংস্কৃতি আছে যারা সেই সংস্কৃতিকে মেনে চলে তাদেরই আর্য বলা হয়। আর্য সংস্কৃতি'তে দেখতে পাওয়া যায় গব্য এবং গোমাংসই আর্যদের আদরের জিনিস।

ঘোড়া, উট পারৎপক্ষে ব্যবহার হয়না। অনেক স্থলে দেখেছি, এসব মাংস নবাগতকে দিতে অনেকেই নিজের দৈন্য অনুভব করে। অপর পক্ষে গোমাংস নরডিক সমাজ প্রকাশ্যে এবং সর্বান্তঃকরণে ব্যবহার করতেই ভালবাসে। ম্যাক্সমূলার আর্য বলে জাতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নি, তবে নরডিক বলে একটি জাতের অস্তিত্ব স্বীকার করে গেছেন। সেই জাতের কৃষ্টি এবং খাদ্যাখাদ্যের কথা বিশেষ ভাবে অনুধাবন করে কিছুই বলে যাবার মত ফুরসৎ হয়ত তাঁর হয় নাই। তা'ব'লে আমাদের মত বিদেশীর পক্ষে নরডিকদের খাদ্যাখাদ্য প্রণিধান করে দেখা অবান্তর বলে পবিত্যাগ করা সম্ভবপর ছিলনা। আমি যখন এসকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম তখন পশ্চিম ইউরোপের লোক অনেক সময় আমাকে নাজী অথবা ফ্যাসিস্ট মনে করত সেজন্য ফ্রান্সে এসে এবিষয়ে একটি কথাও উচ্চারণ করিনি।

খাওয়া বেশ তৃপ্তির সঙ্গেই সমাপ্ত হ'ল, তারপর প্রত্যেকে এক এক পেয়ালা কফি খেয়ে নিলাম। যখন আমরা খাচ্ছিলাম তখনই ডেভিড বললেন—আপনার বন্ধুগণ আর অগ্রসর হবেনা। আপনাকে একাই সোফিয়া যেতে হবে। তবে সোফিয়াতে পৌছার পর আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। তারা আপনাকে স্থানীয় সংবাদপত্র-আপিসগুলিতে নিয়ে যাবে এবং স্থানীয় লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দেবে। টাকা পয়সার অভাব আপনার এখন আর নেই। অতএব যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আগামী পরশু রওনা হলেই হবে।" আমি একটু চিন্তা করে তারপর জিজ্ঞাসা করলাম, "আমার বন্ধুগণ সঙ্গে না যাবার কারণ কি যদি জানতাম তবে বড়ই বাধিত হতাম।" মঁশিয়ে এবার একটু চিন্তিত হলেন তারপর বললেন "তাদের শরীর ভাল নয়, দ্বিতীয় কারণ হল আমার ব্যবসা তারাই চালায় কি না, সেজন্য তারা পথে পথে সময় ক্ষেপণ করতে পারবে না।" আমি আর কথা বাড়ালাম না। স্ত্রীলোকটি কি চান তাই জিজ্ঞাসা করলাম। ডেভিড বললেন, এই যুবতী তাদের পরিচিত এবং এই শহরেরই বাসিন্দা। তিনি কোনও বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী। সোফিয়াতে তিনি কাজ করেন। তার ইচ্ছা সোফিয়াতে গিয়ে আপনি তাদেরই হোটেলে থাকেন। সেখানেও ভেজিটেরিয়ান্‌স্কি রেঁস্তোরা আছে। খাবার কোন কষ্ট হবেনা।

বিলাতফেরতা ছাত্রগণ ভারতে এসে যত ভ্রমণকাহিনী লেখেন, শুনেছি তাদের ভ্রমণকাহিনীতে নারীবন্ধুর বড়ই ছড়াছড়ি। দুঃখের বিষয় ইউরোপে প্রবেশ করার পর ইনি হলেন দ্বিতীয় যুবতী যিনি দয়া করে আমাকে একই হোটেলে থাকতে বল্‌লেন। সোফিয়াতে যাবার পর এই যুবতীর সঙ্গে মাত্র দুবার দেখা হয়েছিল। যে দুবার দেখা হয়েছিল, প্রত্যেকবারই তিনি আমার বিরুদ্ধ দলের বেঞ্চে বসতেন এবং আমার কথার প্রতিবাদ করতেন। শেষের দিন তাঁকে বলেছিলাম, "আপনি যুবতী, নিশ্চয়ই আপনার ছেলেমেয়ে হবে, নিশ্চয়ই আপনি তাদের কুশল কামনা করবেন, কিন্তু মনে রাখবেন আপনার কুশল কামনা ব্যর্থ হবে। আপনার সন্তান অকালে মরবে যদি আপনাদের শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন না হয়।" তৃতীয় বার এই যুবতীর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। বোধহয় ইচ্ছা করেই তিনি আমার সঙ্গে আর দেখা করেননি। না করবারই কথা। বুলগার সেপাই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেলগ্রেদের বুকের উপর তাণ্ডব লীলা করেছিল। বেলগ্রেদের নাগরিকরা ভয়ে

পালিয়েছিল। যারা পালিয়ে যেতে পারেনি তারা অকালে না খেয়ে মরেছিল। এই ভদ্রমহিলা সেরূপ বীভৎস কাণ্ড পছন্দ করেন এবং তিনি চান সোফিয়া এবং বেলগ্রেদ এক রাজ্যে পরিণত হোক এবং রাজা বুরীশ হন সেই সংযুক্ত রাজ্যের সর্বময় কর্তা। কিন্তু রাজা বুরীশ অথবা বল্‌কানের যে কোন রাজা, পশ্চিম ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের পুতুল সে কথা তিনি স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না।

খাবার পরে আমি বসে থাকলাম না। বাইরে গিয়ে পাহাড়ের উপর উঠতে আরম্ভ করলাম। ইচ্ছা পাহাড়ের ও-পাশে কি আছে তাই দেখা। পাহাড়ের উপর উঠে দেখতে পেলাম, সুন্দর পার্বত্য ভূমি উত্তর পূর্বদিকে এগিয়ে চলে গেছে। কোথাও কোন উপত্যকা আছে বলে মনে হ'ল না। অদূরে কতকগুলি ফার্ম হাউস থেকে কুণ্ডলী ধোঁয়া উঠে আকাশে বেশ সুন্দর এক খণ্ড মেঘের সৃষ্টি করেছে। এটা কি সত্যিই মেঘ না ধোঁয়া। ভুল হয়েছে। শুধু মেঘ। মেঘ গ্রামের কাছে ক্রমেই নেমে আসছে। গ্রামের বাড়ির চিমণী থেকে ধোঁয়া বের হয়ে মেঘখণ্ডের সঙ্গে মিশে যাচ্ছিল মাত্র। এক দিকে কালো মেঘ ক্রমেই আকাশ অন্ধকার করে ফেলছিল। কোথাও কোথাও মেঘ-মালা ভেদ করে প্রখর সূর্য কিরণ পাহাড়ের গায়ে এসে পড়ছিল। ভাবুক সেই সূর্য কিরণকেই চিন্তা জগতের স্বধাম বলে কল্পনা করেছিলেন। মানুষ মনের কোণে তাই সজীব করে তুলেছে। ইউরোপের তৈলচিত্রে এরূপ চিত্র প্রায়ই দেখা যায়। শুধু তাই নয়, এরই মাঝে পাখাধারী ছোট ছোট ছেলে মেয়ে এঁকে তৈলচিত্রকে আরও হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়েছে। আজ সেই সুন্দর তৈলচিত্রের মৌলিক চিত্র জীবন্ত অবস্থায় আমার সামনে ভাসছিল দেখে নিজেকে তথাকথিত ভাগ্যবান বলে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলাম। অনেকক্ষণ বসে সেই সজীব ছবি দেখে বৃষ্টির একটু আগে ঘরে ফিরে এলাম।

ঘরে ফেরার সময় ভাবিনি আমি আমার আশ্রয় স্থলে যাচ্ছি, ভাবছিলাম আমি আমার আপন ঘরে ফিরে চলেছি। বিদেশে গিয়ে স্বদেশ এবং বিদেশ একই চোখে দেখা বড়ই কষ্টকর; কিন্তু আমার কাছে তা বড়ই সহজ ছিল তার একমাত্র কারণ হ'ল আমি নিঃস্ব ছিলাম। আমার স্বদেশ আর বিদেশ কিছুই ছিল না। আমি ভাবতাম আমি একজন মজুরের মজুর। স্বদেশ বিদেশ বলে কিছুই থাকতে পারে না। মজুর বসতবাটীর কথা ভাবে বটে কিন্তু যেদিন মজুর জানতে পারে তার মান মর্যাদার স্থান কোথায়, সেদিনই সে সব ভুলে গিয়ে কতকটা উশৃঙ্খল হয়ে পড়ে।

বৃষ্টি অনবরত প্রায় পনর মিনিট পড়ল, তারপরই আকাশ আবার পরিষ্কার হল। কৃষক তার মজুরদের নিয়ে ঘরে ফিরল। তিনজন মাত্র মজুর, একজন হল রুমেনিয়ান আর বাকি দুজন বুলগেরিয়ান্। বুলগেরিয়ান্ মজুরের শরীরের গঠনে আর রুমেনিয়ান্ লোকটির শরীরের গঠনে কোন পার্থক্য দেখলাম না। সকলেই বুলগার ভাষায় কথা বলছিল। আমাদের পরিচয় পাবার পর কৃষক যখন আমাকেও ভল্‌সী বলে ডাকছিল, তখন আমি প্রতিবাদ করে জানিয়েছিলাম আমি ভলসী নই, তবে ভলসীদের সঙ্গ নিয়েছি মাত্র। এদিকে "ভলসী" কথাটা বেশ প্রচলিত বলেই মনে হল, বিশেষ করে এই কথাটি কৃষকদের মধ্যে সম্মান সূচক শব্দে পরিণত হয়েছে। শহরে অথবা গ্রামে "ভলসী"-দের মান ইজ্জত ছিলনা। যদি কেউ

বুঝতে পারত লোকটা "ভলসী" তবে তার আর রক্ষা ছিলনা। কিন্তু কৃষক মহল, ভলসী দেখলেই ভল্সীদের আলিঙ্গন করত, ঘরে নিয়ে গিয়ে খেতে দিত, এবং রাত্রে ঘরে লুকিয়ে রাখত। প্রকৃত পক্ষে রাত্রে আমাদের অতিথিগৃহে শোয়া হয়নি। দোতলার পরিবারের সঙ্গে শুতে হয়েছিল।

রাত্রে খাবারের পরিপাট্য ছিল। পুরাতন শুকনো শূকরের মাংস প্রচুর পরিমাণে ভেজে মস্তবড় একটা থালাতে রক্ষিত ছিল। মস্ত বড় একটা ভেড়ার পা সিদ্ধ করে একটা বড় থালাতে তা রেখে চারিদিকে ভাতের পুডিং ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। কালো রুটি আর প্রচুর পরিমাণে মাখনও দেওয়া হয়েছিল। স্যুপ তৈরী করা হয়েছিল যার স্বাদ এখনও মনে হলে বেশ ক্ষুধা হয়। প্রচুর পরিমাণে ক্রিম এবং ঘন দুধেরও ব্যবস্থা ছিল। খাবার খেয়ে আমরা উপরে উঠে গিয়েছিলাম। কৃষক এবং কৃষকপত্নী তাদের দুঃখ এবং কষ্টের কথা বলছিলেন। এদিকে জার্মানীর সাজো সাজো ভাব, চেকোস্লাভাকিয়ার ফরাসী পরিচালিত সোকোলণ্মীয় যুবক লিগ্, যুগস্লাভিয়ার রাজার মৃত্যু এবং যুগস্লাভিয়ায় বৃটিশ প্রভাব, ইটালী এবং বৃটিশে মিত্রতা, আবিসিনিয়ার ধ্বংস এসব বিষয় নিয়ে বেশ আলোচনা হল। ভারতবাসী যে মুসলিনীকে পছন্দ করে না সেকথাটি আমাকে বার বার বলতে হয়েছিল। তাতেও তাদের মন উঠছিল না দেখে আমি একটু ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম। অবশেষে বুঝতে পেরেছিলাম বুলগার কৃষক ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসীকে রাষ্ট্রনীতির দিক দিয়ে মোটেই গুরুত্ব দেয়না। তারা এটা ঠিক করে নিয়েছিল, যে ভারতবর্ষে যতদিন বৃটিশ শাসন থাকবে ততদিন ভারতবাসী দুনিয়ার ক্ষতিই করতে সক্ষম হবে, উপকার ভারতবাসীর দ্বারা হবেনা। এত বড় কথাটা আমাকে বোঝবার মত ভাষা এদের কারো ছিলনা। অবশেষে গভীর রাত পর্যন্ত আমরা অন্যান্য ইউরোপীয় বিষয় নিয়ে সমালোচনা করে শুয়েছিলাম।

পরের দিন সকাল বেলা আবার আমরা পথে বের হই। অপরিসর উপত্যকা পার হয়ে সমতল ভূমিতে পৌছার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হচ্ছিল। আমরা ছোট পথ দিয়ে চলছিলাম, তাই কখন কখন আমি এবং আমার সাথীরা সাইকেল হতে পড়ে গিয়ে পায়ে বেশ আঘাতও পাচ্ছিলাম। সকাল বেলা কৃষকের বাড়ি থেকে কিছুই খেয়ে আসিনি। কৃষকপত্নী আমাদের খাবার একখানা পরিষ্কার নেকড়ায় বেঁধে দিয়েছিলেন তাও এদের হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল, খাবারের চিন্তা বড় চিন্তা। আমার সে চিন্তা ছাড়া আর কোন চিন্তা ছিলনা। পলিটিক্স আমি শুনতাম, কিন্তু কোনদিন তা কাজে পরিণত করতে হবে সে ধারণা করতাম না। সেজন্য খাবারের চিন্তাই আমাকে করতে হ'ত। সাথীরা কিন্তু খাবারের চিন্তা করত না, তারা চিন্তা করত কি করে কৃষকদের বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের হাত হতে রক্ষা করে কৃষকদের স্বাধীনতা আনয়ন করবে। প্রভেদ এখানেই। গরু ঘাস খায়, আর রাখাল ভাবে কি করে গরুকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় নির্বিঘ্নে ঘরে পৌছাবে। রাখাল খায় কম, এবং খাবারের চিন্তাটা কমই করে!

কোন মতে সূর্য ওঠবার পূর্বেই আমরা অন্য এক খানা ফার্ম হাউসের কাছে পৌছলাম, কিন্তু দাড়ালাম না; এগিয়ে চললাম। আমি যদি একা চলতাম তবে নিশ্চয়ই

এই ফার্ম হাউসে গিয়ে উঠে খাবার চাইতাম, বিশ্রাম করতাম, খাবারের মালিকের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করতাম। বোবার যেমন শত্রু থাকেনা তেমনি আমারও বিদেশে শত্রু ছিলনা। স্বদেশেও আমার শত্রু নাই, কারণ গরুর শত্রু থাকেনা। গরুকে চরাবার এবং কশাইখানায় নিয়ে গিয়ে গলা কাটার লোক থাকে !

আমার বড়ই রাগ হল, এমন সুন্দর চাষার বাড়ি পথে ফেলে তারা এগিয়ে চলছে, একটা কথাও মুখ থেকে বের করছে না, অথচ আমাকে তাদের সঙ্গে যেতে হবেই। পথের দুদিকে সুন্দর দৃশ্যাবলীও ছিল; কিন্তু শরীর যখন অচল হতে থাকে তখন সৌন্দর্য বোঝবার মত ক্ষমতা থাকলেও কেউ সেই সৌন্দর্যের দিক তাকাতে ইচ্ছা করে না। আমারও সে অবস্থাই হয়েছিল। অবশেষে বেলা বারটার সময় আমরা পাজার জিক নামক একটি গ্রামের কাছে পৌঁছি এবং বিশ্রামের জন্য দাঁড়াই। সুলেমান বল্ল "আপনি আজ এবং কাল এ শহরে থাকবেন এবং পরশু সকালে একটু রাত থাকতেই হোটেল থেকে বের হলেই আমাদের দেখা পাবেন।" এই কথা বলেই আমার সাথীরা আর একটা ছোট পথ ধরল এবং আমাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল "ঐ বড় পথ এবং এখান থেকে গ্রাম মাত্র এক মাইল দূরে"।

পাজার জিক (Pazardzik)

বড় পথটার উপরে উঠেই মনে হল কোনও শহরের কাছে এসেছি। গ্রামের কাছে যতই পৌঁছতে লাগলাম ততই লোক সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। পথের পাশে ঘাসের উপর একটা লোক শুয়েছিল। তার হাতে একখানা বাইবেল ছিল। বাইবেলখানা পড়বার সময় তার মুখ কখন বিকৃত, কখন কূট অট্টহাসি, আর কখন বা চোখ দুটি আকাশের দিকে কুঞ্চিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত। আমিও মনে মনে হেসে বলছিলাম, তোমার হাতের বইখানাই তোমার চোখের ঠুলি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রামে পৌঁছবার পর দেখলাম পর্যটনী লোক দাড়িয়ে আছে। এদের দেখলেই মনে হয় বর্বরতা তাদের মুখে ফুটে উঠেছে। বর্বরদের দেখতে মোটেই ইচ্ছা হল না। একটু এগিয়ে গিয়ে গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলের একখানা হোটেলে রুম ভাড়া করে গরম জলে হাতমুখ ধুয়ে শহর দেখতে বের হলাম। দেখলাম পুরোহিতের দল একখানা লম্বা কাপড় দুদিক থেকে টেনে ধরেছে। সেপাইরা কি কতকগুলি কথা বলে এক এক জন করে ঐ কাপড়টার নীচ দিয়ে চলে আসছে। এরূপ দৃশ্য দেখতে আমার মোটেই ভাল লাগল না। হোটেলে ফিরে যাবার পথে শুধু এক পেয়ালা কফি খেয়ে বিছানায় শোবামাত্র মনে হল জ্বর এসেছে। তারপর যেন অজ্ঞানই হয়েছিলাম। কারণ পরের দিন সকাল পর্যন্ত কি হয়েছিল তা আমার মনে ছিলনা।

সকাল বেলা যখন ঘুম থেকে উঠলাম তখন শরীর বেশ দুর্বল ছিল, তবে শরীরে জ্বর ছিলনা। অতি সন্তর্পণে দোতলা থেকে নেমে নিকটেই একটি ডাক্তারে কাছে গিয়ে কুইনিন এবং

পারগেটিভের ওষুধ কিনে আনলাম। দুপুর পর্যন্ত কিছুই খেলাম না, বিকালে বেশ করে দুধ খেয়ে আবার শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালে সেখান থেকে বের হতে হবে শুধু এই কথাটাই বার বার মনে হচ্ছিল, কিন্তু অবশেষে দেখলাম তা সম্ভবপর হবেনা। অনেকক্ষণ সঙ্গীদের কথা ভাবলাম, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত বোধহয় তখন একটা বেজেছিল। হঠাৎ দরজাটা চাবি দিয়ে কে খুলল, তারপর দু'জন লোক ঘরে প্রবেশ করে আলো জ্বালিয়ে আমার কাছে এল। একজন আমার পরিচিত, সেই বুলগার যুবক যে একটিও ইংলিশ শব্দ বলতে পারত না। কাছে এসেই সে বল্‌ল 'আগুন', মানে শরীর বেশ গরম। আমি তারই সামনে একটা এস্‌পিরিন খেলাম, তারপর নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন বেলা দশটার সময় আমার ঘুম ভাঙল। জ্বর ছিল না। শরীরে শক্তি হয়েছিল। ঘুম থেকে উঠেই দেখি বুলগার যুবক আমার পাশেই গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। তাকে আমি ডেকে উঠালাম না। হাত মুখ ধুয়ে নীচে নেমে গিয়ে দু'গ্লাস গরম দুধ খেয়ে নেবার আগে দু'শ গ্রেন কুইনিন খেলাম। তারপর নীচে হোটেলে ফিরে এলাম। বসে বসে সোফিয়ার কথাই ভাবছিলাম। বাইরে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কতক্ষণ বসে থেকে আবার শুয়ে পড়লাম। ঘুম হলনা, তবে তন্দ্রার মত হয়েছিল। বেলা একটার সময় আবার যখন উঠলাম তখন বুলগার যুবক ঘুম থেকে উঠে আমার পাশেই বসেছিল। সে আমার কাছ থেকে বিদায় নেবার পূর্বে ইঙ্গিতে বলে গেল রাত্রে সে আবার আসবে। আমার বিশ্রামের আশু প্রয়োজন, তাড়াতাড়ি করে লাভ নেই।

সেদিনও আমার শরীর বেশ দুর্বল ছিল। পরের দিন শরীরটা একটু ভাল হতেই ভিক্ষায় বের হয়ে পড়লাম। অনেক লোকের বাড়িতে এবং রেঁস্তোরাতে ভিক্ষা করলাম। অনেকেই ভিক্ষা দিল কিন্তু কেউ কথা বল্‌ল না। এদের কথা বলার ইচ্ছা ছিলনা বলেই কথা বলেনি।

সেদিন বিকাল বেলা একটু বেড়াতে ইচ্ছা হয়েছিল, সেজন্য ভিক্ষাপত্র হাতে করেই বেরিয়ে পড়লাম। কয়েকটি রেঁস্তোরা ঘোরার পর একটি ছোট্ট রেঁস্তোরায় প্রবেশ করেই দেখলাম মাত্র কয়েকজন লোক তাতে বসে আছে। প্রত্যেকেই নীরব। ভাবলাম এদের কাছেই কিছু চাওয়া যাক্! দরজার কাছেই একজন যুবতী বসেছিলেন। তাকেই সর্বপ্রথম ভিক্ষাপত্র এগিয়ে দিয়ে অন্যদের কাছে গেলাম, তারপর প্রথম ব্যক্তি অর্থাৎ যুবতীটি কিছু দেয় কিনা দেখবার জন্য সেই দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম, দেখলাম তিনি কিছুই দেননি, বুঝলাম যুবতীটির কাছে কিছুই নেই, অথচ বিদেশী পর্যটককে কিছুই দিতে সক্ষম হলেন না ভেবে সঙ্কোচে তাঁর মাথা নুইয়ে আসছিল। সেজন্য সোজা তাঁর কাছে উপস্থিত না হয়ে যুবতীর সামনে যে টেবিল ছিল তার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং বাঁ হাত দিয়ে পাঁচটি দিনার তাঁরই টেবিলে রেখে দিয়ে আবার মোড় ফিরিয়ে যুবতীর দিকে হাসিমুখে তাকিয়ে পাঁচটি দিনার থেকে দুটি দিনার উঠিয়ে পকেটস্থ করে বার বার ধন্যবাদ জানিয়ে, আর কেউ কিছু দিল কিনা তা দেখতে গেলাম। অত তাড়াতাড়ি এতগুলি রেঁস্তোরা ঘুরে আসতে পারব বলে আমার ধারনা ছিলনা।

ভিক্ষা শেষ করে হোটেলের দিকে চলেছি এমন সময় দেখতে গেলাম একটি যুবক এবং একটি যুবতী কাছাকাছি বসে কি পরামর্শ করছে। এদের এত ঘনিষ্টভাবে কথা বলতে দেখেই মনে হ'ল এরা একে অন্যকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু বিয়ে হবে কি না তাতে বেশ সন্দেহ আছে। এদের এই শুভ মিলনের অন্তরায় নিশ্চয় কিছু আছে। সেই অন্তরায়টি যদি দিব্য দৃষ্টি মেলে দেখা যায় তবে দেখা যাবে, আর্থিক দুরবস্থাই এদের মিলনের অন্তরায়। নতুবা বুল্‌গেরিয়ার সাধারণ লোক বিয়েতে সমাজ নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করে না।

হোটেলে ফিরে এসে এই যুবক যুবতীর কথা যখন ভাবছিলাম তখন হঠাৎ কে দরজায় মৃদু করাঘাত করল। দ্বার খুলে দেখি হোটেলের মালিক সবিনয়ে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর ইচ্ছা আমি নীচে নেমে আসি। নেমে গেলাম। গিয়ে দেখলাম তিনজন পাদরী বসে আছেন। তার মধ্যে একজন হলেন ইস্‌লামী পাদরী। ইস্‌লামী পাদরীটিকে দেখে আমার হাসি পেয়েছিল। হাতে ঝিনুকের মালা নিয়মিত ভাবেই ঘুরে চলছে। দাড়ি এবং মাথার পাগড়ী দেখলে মনে হয় যেন একজন আরব গরমে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ছে। অন্য দুজন হলেন যিশু-পাদরী। তাঁরা ধীরে আমার সঙ্গে ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। ফ্রেঞ্চ ভাষা আমার জানা ছিলনা সেজন্য তাদের কথা একটিও বুঝতে পারছিলাম না। আমি তাঁদের জানিয়ে দিলাম শুধু ইংলিশই বলতে পারি। উর্দূ কিছুটা জানি। ভাবছিলাম শীতের দেশের মোল্লা মহাশয় উর্দূ বলতে সক্ষম হবেন, কিন্তু তিনি উর্দূ বা ইংলিশ জানতেন না। শুধু আসা আর যাওয়াই তাঁদের সার হল। আমার কাছ থেকে কোনরূপ সুসমাচার তাঁদের পাওয়া হ'ল না। আমিও ওঁদের সঙ্গে না মিশতে পেরে সুখীই—হয়েছিলাম। পাদরীদের বিদায় দিয়ে রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত্রে পরেজ, ঘন-দুধ খেয়ে রুমে ফিরছি, তখন আমার দুজন সাথীর সঙ্গেই দেখা হল। তাদের সঙ্গে একজন জার্মানও ছিল। জার্মান লোকটি একটু বয়স্ক। তিনি রুমে এসেই আমার সাথীদের কফি আনতে বললেন। তারা তাঁর আদেশ পালন করল। রুমে কফি খাওয়া ইউরোপে এই প্রথম, কারণ রুমে কফি খায় তারা যাদের নিজের বয় রয়েছে। দরিদ্রের পক্ষে বয় রাখা সম্ভব হয় না। জার্মান লোকটির কোনও বিশেষত্ব ছিলনা। আমার মনে হচ্ছিল যাকে জার্মান বলে আমার কাছে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল তিনিও একজন বুল্‌গার অথবা স্লাভই হবেন। পরে জানলাম তিনি একজন ইহুদী। কথা প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ইহুদীরা কি জার্মানদের ক্ষতি করেনি? ইহুদী লোকটি আমার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন "আপনার কথায় মনে হচ্ছে আপনি একজন ফ্যাসিস্ট।" আমি বল্‌লাম ফ্যাসিস্ট বলে এদেশে গাল দেওয়া হয়, আর আমাদের দেশে যখন একজন অপরের সঙ্গে কোন মতেই পেরে ওঠেনা তখন "গোপনীয় পুলিশ" বলে গাল দেয়। উভয় গালের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই এটা নিশ্চয়ই। আমাকে ফ্যাসিস্ট বলছেন, আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের যে কোন গণ্যমান্য লোক এদেশে এসেছেন তারা সকলেই ফ্যাসিস্ট। সাম্রাজ্যবাদীরাও ফ্যাসিস্ট, তারা মুখে মুখে বলে ডেমোক্রাসী কিন্তু তারা ভোট ক্রয় করে সেকথা আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অতএব আমাকে ফ্যাসিস্ট বলে লাভ নেই। আমি একই তরাজুতে ফ্যাসিস্ট এবং

সাম্রাজ্যবাদীদের স্থান দিয়ে অন্য তরাজুতে সোসিয়েলিস্টদের রেখে স্থান কাল ও পাত্রের বিচার করি।

জার্মান ইহুদী ঘর থেকে বের হবার সময় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

ডাক্তার সুভাষ বোস কি ফ্যাসিস্ট ?

এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিনা।

এঁর সম্বন্ধে বুলগার সংবাদপত্র একটি কথাও ছাপায়নি, শুধু কমিউনিস্ট গুপ্ত বুলেটিন ভারতীয় দেশপ্রেমিক ডাক্তার সুভাষ বসুর ইউরোপে আগমনের কথা লিখেছে।

সুভাষ বসু "ডাক্তার" নন। তিনি পূর্বে একজন আই, সি, এস ছিলেন, কিন্তু বৃটিশের চাকুরী না নিয়ে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি কি এদেশে এসেছেন ?

নিশ্চয়ই এসেছেন, এই দেখুন আমাদের গুপ্ত বুলেটিন, এই বলেই ভদ্রলোক আমাকে তাঁর পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে দেখালেন। কাগজখানা দেখলাম বটে কিন্তু কিছুই বুঝলাম না, কারণ সেই বুলেটিন বুলগেরী ভাষায় লেখা ছিল।

আমার একটি ধাঁ-ধাঁ লাগল, এতবড় একটি লোক বিদেশে আসার পর বুলগেরী সরকার কেন তাঁর সংবাদ ছাপলে না। কাউকে কিছু বললাম না, কিন্তু ঠিক করে রাখলাম বৃটিশ কন্সালকে এসম্বন্ধে সকল কথা জিজ্ঞাসা করতে হবেই। পরে এমনি এক বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম যে জন্য বৃটিশ কনসালের সঙ্গে এসম্বন্ধে সোফিয়াতে কোন কথাই হয়নি।

জার্মান জু যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন আমি তাঁকে বলেছিলাম এরূপ ভাবে দেশ-হীন হয়ে বেড়ানোর চেয়ে দেশে থেকে মৃত্যু বরণ করা আপনাদের পক্ষে উচিত ছিল। ভদ্রলোক আমার কথার জবাব না দিয়ে শুধু বলছিলেন আপনার পক্ষে "উপদেশ দেবার সময় এখনও হয়নি" আরও একটু ভ্রমণ করুন তখন বুঝবেন ইউরোপের রাষ্ট্রনীতি কাকে বলে!" এই ভদ্রলোকের কথা পরে উপলব্ধি করেছিলাম। রাষ্ট্রনীতিতে দয়া মায়া নেই। শুধু তাই নয়, পুরাতন যুগে ধর্ম নিয়ে যে সকল লড়াই হয়েছিল তাতেও দয়া মায়া ছিল না। দয়া মায়া প্রবর্তন করার জন্য ধর্ম প্রচারকগণ অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু চোর কখনও ধর্মের কথা শোনেনি। এখানে মনে রাখতে হবে কে চোর! জার্মানীর শাসক সম্প্রদায় দয়ামায়া হীন বলেই নির্দোষ লোকদেরও জার্মানী থেকে বহিষ্কার করেছিল! বাস্তবিক পক্ষে এই নিরীহ শ্রেণীর লোক যদিও সম্বলহীন তবুও তারা এখন বুঝতে পেরেছে, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ এবং ফ্রেঞ্চরাই তাদের দেশ ছাড়বারও কারণ হবে। সেজন্য এই নিরীহ প্রকৃতির লোক এখন আর কোন দেশ অথবা জাতের বিরুদ্ধে কোন কথা বলেনা, তারা যা বলে তাতে সর্বসাধারণের উপকার হবারই কথা। ইহুদী লোকটির কথা আমার প্রাণে বড়ই আঘাত করেছিল, সেজন্যই যখন পশ্চিম ইউরোপ ভ্রমণ করেছিলাম তখন বুঝতে চেষ্টা করেছিলাম, কে এবং কারা মানব সমাজের অবনতির প্রথম কারণ হয়েছিল।

পরের দিন সকাল বেলা আবার আমরা ফাড়ি পথে ভ্রমণ আরম্ভ করি। এবার থেকে মশারী ছাড়া শোবনা বলে স্থির করেছিলাম এবং সাথীদের সে সম্বন্ধে উপযুক্ত

ব্যবস্থা করতেও বলেছিলাম। সাথীরা মশারী কাকে বলে জানতনা। এদিকের লোক মশারী ব্যবহার করেনা। অতি কষ্ট করে সাথীদের বুঝালাম কাপড়ের ঘরের ভেতর না থাকলে মশা এবং পোকায় দংশন করে। ফাড়িপথে যে সকল ফার্ম হাউস পাওয়া যেত তাতে প্রায়ই কালো কালো এক রকমের পোকার উপদ্রব ছিল। কালো পোকা কামড়ালেই আমার জ্বর হ'ত। এই কালো পোকার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যই মশারীর দরকার হয়েছিল। সুখের বিষয় সাথীরা আমাকে এমনি ফাড়ি পথে সোফিয়ার দিকে এনেছিল, যাতে করে আমাকে আর ফার্মহাউসে রাত কাটাতে হয়নি।

দুপুর বেলা আমরা একটি ছোট ফার্ম হাউসে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বাড়িতে ছিলেন পুত্রবধূ এবং শাশুড়ী। তাদের বাড়িতে আমরা সামান্য জলযোগও করেছিলাম। জলযোগের জন্য আমরা দাম দিয়েছিলাম। আমার সাথীরা খাবারের দাম পুত্রবধূর হাতে দিয়েছিল। এতে শাশুড়ীর বড়ই রাগ হয়। শাশুড়ী তেড়ে গিয়ে পুত্রবধূকে নানা রকমের মন্দবাক্য বলেছিলেন বলে মনে হ'ল, কিন্তু পুত্রবধূও ছাড়ার পাত্র নন্। তিনি শাশুড়ীকে বেশ দুকথা শুনিয়েছিলেন। শাশুড়ী এবং পুত্রবধূর বিবাদ অনেকক্ষণ দেখার পর স্বদেশের শাশুড়ী পুত্রবধূর কথা মনে হয়েছিল। ইউরোপে সাধারণত পুত্রবধূ শাশুড়ীর ঘরে থাকেনা। সাথীদের কাছে শুনলাম, পুত্রের মায়া কাটাতে পারেনা বলে পুত্রবধূকে স্বগৃহে স্থান দিয়েছেন। পুত্রবধূ কন্যার স্থান দখল করে মাকে শাসাতে কসুর করছেনা তাই স্বচক্ষে দেখলাম। আমি কখনও মনে করতামনা ইউরোপের দরিদ্র পরিবারে আমাদের দেশের মতই কলহ ইত্যাদি হয়ে থাকে। আমার সাথীরা কিন্তু এই বিষয়টার অন্য ব্যাখ্যা করলেন। তারা বললেন "যদি এই পরিবারের আর্থিক অনটন না থাকত তবে এরূপ সামান্য পয়সা নিয়ে কখনও ঝগড়া হ'ত না। শাশুড়ী পুত্রবধূর ঝগড়া দেখে যখন পথে নামলাম তখন আমার সাথীরা বললেন "বন্ধু এখন আমরা বিদায় নেব। ঐ সামনেই বড় রাস্তা, এই পথ ধরে এগিয়ে গেলে বিকাল পর্যন্ত আপনি সোফিয়ায় পৌছবেন। সোফিয়াতে আমরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম "এখন আপনারা যাবেন কোথায়?" ইহুদী লোকটি বল্‌ল "এখন আমাদের আত্মগোপন করতে হবে, আমরা "নিজবাস ভূমে-ও পরবাসী" We are foreigners to our own land" আমার মনে হ'ল আমাদের দেশের কবির কবিতা "নিজবাস ভূমে, পরবাসী হলে"। এদের বিদায় দিতে বেশ কষ্ট হয়েছিল যারা সাম্রাজ্যবাদী তারা দয়ামাহীন, তারা বন্ধুতে বন্ধুতে বিচ্ছেদ ঘটায়, পিতার সামনে পুত্র হত্যা করে, মাতার কোল থেকে শিশু নিয়ে হত্যা করতে কসুর করেনা। আমি মনে মনে সম্রাজ্যবাদীদের নিপাত কামনা করিনি, শুধু ভাবছিলাম রাজা বুরীশের এমন কি স্বার্থ আছে যাতে করে তিনি পৃথিবীর অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে পারেন?

বিকালের দিকে বৃষ্টিতে ভিজে বাঁকা পথ ধ'রে চলতে লাগলাম। সহরের পূর্বদিকে যে পথটা এসেছে তা হঠাৎ দক্ষিণ দিকে চলে গিয়েছে। সেই পথটাই আবার হঠাৎ মোড ফিরে (sharp curving) উত্তর দিকে চলেছে। এরূপ মোড়

ফেরা পথে প্রায়ই এক্‌সিডেন্ট হয়। সেজন্য পথের পাশে মরা মানুষের কঙ্কালের চিত্র টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই পথটা অতিসন্তর্পণে এগিয়ে যাবার পরই সোফিয়া সহরের দেখা পেলাম। সহরের দেখা পাবার সঙ্গে সঙ্গেই রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের কথা মনে হ'ল। পিকিনে থাকার সময় তিনি একদিন বলেছিলেন "আমার একটি বড় ট্রাঙ্ক সোফিয়াতে ফেলে এসেছিলাম, তা ফিরিয়ে নিতে গিয়ে আমার বেশ একটু বেগ পেতে হয়েছিল"। কেন তিনি একথাটি বলেছিলেন এবং কেনই বা সোফিয়া দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর কথাটি মনে হয়েছিল তা জানবার কৌতূহল পাঠক পাঠিকার নিশ্চয়ই হবে।

সোফিয়া যদিও ছোট একটি সহর, তবুও তার, আন্তর্জাতিক গুণ গরিমা বেশ আছে। সেই গুণ গরিমার মোহে পতিত হয়ে অনেক পলিটিকেল-ম্যান এদিকে আসেন এবং সময় সময় বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন বলেও শোনা যায়। এখানে এসে আমিও একদিন বিপদে পড়েছিলাম। কিরূপ সে বিপদ তারই কথা বলছি।

সোফিয়ায় প্রায় দশদিন থাকার পর যখন আমার সম্বন্ধে একটি নগণ্য দৈনিক সংবাদ পত্র কিছু সংবাদ প্রকাশ করল তখন পথের ওপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ একজন লোক আমাকে ডাকল। আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম। লোকটি আমাকে কফি খেতে নিমন্ত্রণ করল এবং একটি কাফেতে নিয়ে গেল। আমরা উভয়ে যখন কফি খাচ্ছিলাম তখন পেছন দিক হতে দুটা লোক এসে আমার ঘাড়েব ওপর লাফিয়ে পড়ে এবং আমার দুখানা হাত এমনি ভাবে চেপে ধরে যে আমার আর নড়বার ক্ষমতা ছিলনা। আমাকে যখন লোক দুটা করায়ত্ব করতে সক্ষম হল তখন আমি অপরিচিত লোকদুটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে নিয়ে তারা কি করতে চায়? তারা কোন কথা না বলেই পুলিশকে ডাকল এবং পুলিশের কাছে আমাকে দিয়ে দিল। পুলিশের কাছে আসার পর আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম। আমি ভেবেছিলাম এরা গুণ্ডা হবে, আমাকে হয়রান করা এবং আমার ম্যনিব্যাগ আত্মসাৎ করাই বোধহয় তাদের ইচ্ছা।

পুলিশ যখন আমাকে অপিসে নিয়ে গেল তখন আমার সঙ্গে কথা বলার উপযুক্ত দোভাষী ছিলনা। বাধ্য হয়েই তাদের বৃটিশ কন্‌সালকে ডাকতে হয়েছিল। বৃটিশ কন্‌সাল নিজে না এসে তাঁর সহকারীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কেরাণীটি এসেই আমাকে্ চিনতে পারলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন "আবার কি বিপদ হয়েছে?" আমি বল্‌লাম "কি জানি বন্ধু কিছুই তো বুঝতে পারছিনা, এদের জিজ্ঞাসা করুন। সহকারী কনসাল তখন ইমিগ্রেসন অফিসারকে সকল কথা জিজ্ঞাসা করার পর বললেন, আপনার ছিল ট্রেনজিট ভিসা, তার মেয়াদ পার হয়ে গিয়েছে, আপনাকে আজই বুলগেরিয়ার সীমান্ত পার হয়ে যেতে হবে।" সহকারী কনসালের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনি কি এবিষয়ে আমাকে সাহায্য করতে পারেন না? সহকারী কন্‌সাল বল্‌লেন "নিশ্চয়ই পারি, তবে আজ কিছুই করতে পারবনা, আজ আমি আপনার জন্য জামিন হচ্ছি, আগামী কাল বারটা পর্যন্ত আপনি হোটেল থেকে বের হবেন না। কেমন তাতে রাজি আছেন ত? আপনার দেখছি অনেক সঙ্গী জুটেছে, এদের মায়া বুঝি

কাটাতে পারছেন না?" আমি হেসে বললাম, আপনার মায়া কাটানোই কষ্টকর হয়ে উঠেছে। সহকারী কনসাল তৎক্ষণাৎ একখানা কাগজে সই করে দিয়ে আমাকে সে দিনের জন্য খালাস করে নিয়ে এসেছিলেন। আমি যখন হোটেলে ফিরে যাই তখন তাঁকে চোখের ইঙ্গিতে বিকালে আমার হোটেলে আসতে বলেছিলাম।

পরের দিন যথাবিহিত সময়ে ইমিগ্রেসন অফিসে উপস্থিত হয়ে আরও পনর দিন বুলগেরিয়াতে থাকার আদেশ নিয়েছিলাম। এরূপ অহেতুক অত্যাচারের কারণ ছিল। কেন এমন হয়েছিল তা পরবর্তী ঘটনায় প্রকাশিত হচ্ছে।

আমার নিয়ম ছিল, কোন বড় সহরে পৌঁছেই সহরের যে স্থানে বড় বড় দোকান, অফিস এবং হোটেল থাকে সেই স্থানটিতে যাওয়া। সোফিয়াতে পৌঁছেও তাই করলাম। সোফিয়ার ডালহৌসী স্কোয়ার তখনও ভালভাবে গড়ে ওঠেনি। তবে বড় বড় কয়েকটি হোটেল আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। একটি হোটেলের সামনেই লেখাছিল "English speaking here" লেখাটা দেখেই খুশি হয়েছিলাম। দরজা ঠেলে বসবার ঘরে গিয়ে দেখি অনেকগুলি লোক বসে আছে, অনেকে আবার সামান্য খাবারও খাচ্ছে। ঘরটায় প্রবেশ করা মাত্র সকলের দৃষ্টি আমার ওপর আকৃষ্ট হল। আমি তা লক্ষ্য করে এক জন বয়কে ডাকলাম।

আপনি কি ইংলিশ বলতে পারেন?

নিশ্চয়ই, কি করতে হবে বলুন।

একটি থাকবার জায়গা খুঁজছি, আপনি দয়া করে তার কি কোন ব্যবস্থা করতে পারেন?

এখানেই তো থাকতে পারেন।

এখানে কত দিতে হয়?

এই এক পাউণ্ড থেকে দেড় ইংলিশ পাউণ্ড।

বললাম, এখানে আমার থাকা হবে না, একটি সস্তা হোটেলের নাম বলে দিন যেখানে ছয় হতে আট পেনিতে থাকা চলে। আমি একজন ভারতীয় ভূপর্যটক, আমি সাইকেলে পৃথিবী ভ্রমণ করছি।

হ্যাঁ তাই বলুন, এখানে একটু দাঁড়ান ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বয় টেলিফোনের কাছে গিয়ে কাকে ডাকলে, তারপর আমার কাছে এসে বুলগেরী ভাষায় এক খানা কাগজ রেখে দিয়ে বল্লে, "বাইরে লোক আছে সে আপনাকে নিয়ে যাবে।" বাইরে হাজারো লোক আছে, সে লোক কে, যে আমাকে হোটেল দেখাবে? মনের কথা মনেই চাপা দিলাম, তারপর বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই একজন লোক আমার হাত ধরে তার সঙ্গে যেতে ইঙ্গিত করল। তার পেছন পেছন চল্লাম। কতদূর যাবার পরই আমরা একটি মধ্যম গোছের হোটেলের কাছে এলাম। লোকটি এবার মুখ খুলল এবং বলল এতেই হবে, তেত্রিশ দিনার মাত্র। আমি তাতেই রাজি হলাম।

হোটেল দোতলা। নীচে তলায় রেঁস্তোরা। সাইকেল সমেত দোতলায় ওঠা কষ্টকর, সেজন্য সাহায্য চাইতেই অন্য আর একটি যুবক কোথা থেকে এসে বিশুদ্ধ ইংলিশ ভাষায় বলল, "আমি আপনাকে সাহায্য করব। আপনি বোঝাটা খুলে ঘাড়ে নিন আর আমি

খালি সাইকেলটা উঠিয়ে নিচ্ছি।" কিন্তু যুবক জানতনা, সাইকেলের সঙ্গে যে বাক্সটা ছিল তাতেও অনেক মাল ছিল। সে সাইকেল উঠাতে চেষ্টা করল কিন্তু উঠাতে পারলনা। অবশেষে আমিই সাইকেলটা উঠালাম এবং সে নিল বোঝাটি। উভয়ে যখন দোতলায় উঠলাম তখন এক জন প্রৌঢ় মহিলা এসে একখানা রুমের দরজা খুলে দিয়ে বললেন ঐ রুমটাতে আপনি থাকবেন। সাইকেল-খানা রুমের ভেতর না নিয়ে বাইরেই রাখলাম। পিঠ-ঝোলাটি রুমের ভেতর নিয়ে ইউরোপের নিয়ম মত দরজা বন্ধ করে দিয়ে একখানা চেয়ারে বসে ইংলিশ-ভাষী যুবককে একখানা চেয়ারে বসতে বললাম। মহিলা কিন্তু বসলেন না। তিনি বাইরে গিয়ে এক বোতল গরম জল রেখে দিয়ে বললেন এটা হ'ল হাত মুখ ধোবার জল। স্নান করার পৃথক ঘর আছে চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি। তাঁর সঙ্গে গিয়ে বাথরুমটিও দেখে এলাম।

রুমে যে যুবকটি বসেছিল, পরিচয় না জিজ্ঞাসা করে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "এখন বলত তুমি আমাকে কি করে চিনলে?" যুবক একটুও চিন্তা না করে বলল, "আমি আপনাকে চিনব না সে কেমন কথা? ধরে নিন্ আমি একজন পুলিশের লোক, পুলিশের লোকের প্রত্যেক বিদেশীর গমনাগমনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। আপনি ইউরোপীয়ান ত নন, শরীরের রঙ্ লুকাতে পারবেন না, আপনাকে সকলেই অনায়াসে চিনতে পারে। তবে, আসল কথা হ'ল আমি পুলিশের লোক নই, আমি মাত্র একজন বুলগার যুবক, নবাগতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বিদেশের সংবাদ অবগত হতে ভালবাসি সেজন্যই এত কষ্ট করে আপনার সঙ্গে পরিচয় করা। এখন যদি কিছু খেয়ে বিশ্রাম করতে চান ত চলুন আমি আপনাকে একটি খাবারের দোকানে নিয়ে যাচ্ছি।" যুবকের কথা আমার বেশ ভাল লাগছিল। তাকে নিয়েই খেতে গেলাম। খাবার ভালই হল। তারপর যুবককে বিদায় দিয়ে নিদ্রার আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম।

বেলা বোধহয় তখন ছটা হবে। পশ্চিমের স্নিগ্ধ সূর্য-কিরণ সোফিয়া নগরীর ক্লান্তি দূর করে আরও পশ্চিমের দিকে চলে যাচ্ছিল। আমি বের হয়ে রাজপথে এলাম। লোকের চলাফেরা দেখতে লাগলাম। জিপসীরা আমার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। হোটেলের পাশেই একটি মসজিদ, আমাকে পথে দেখে মোল্লা মহাশয়ের মনের কোণে ভাবতরঙ্গ বইতে লাগল। আমি কিন্তু দাঁড়িয়ে মোল্লাকে সন্তুষ্ট করতে পারলাম না, এগিয়ে চল্লাম। যেদিকে চাইতে লাগলাম আমার কাছে প্রস্ফুটিত সুগন্ধযুক্ত ফুল বলেই মনে হতে লাগল। আমি সেই ফুলের মধু আহরণকারী ভ্রমর ছাড়া আর কিছুই নই!

কিন্তু জানতাম না আমি বারুদের স্তূপের উপর দিয়ে হেঁটে চলছিলাম। বুলগেরিয়ার ছোট থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই থর থর করে কাঁপছিল। লোকে বলত ভেনোইস্কি কখন কাকে দ্বিখণ্ডিত করে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। দ্বিখণ্ডিত মানে মাথা কেটে ফেলা। ইংলেণ্ডে যাবার পর ভেনোইস্কি কারা তা জানতে পেরেছিলাম। আসল কথাটা হ'ল "ZVENO" ভেনো শব্দের অপর নাম হ'ল Captain League (ক্যাপ্টেন লিগ)।

ক্যাপ্টেন লিগের রাজত্ব আরম্ভ হয় ১৯৩২ সালে। সে সময় হতেই, বুলগেরিয়ার ন্যাশনালিস্ট, কমিউনিস্ট এবং অন্যান্য দল বে-আইনী বলে ঘোষিত হয় এবং বুলগেরিয়ার লোকের দুর্দিন এসে দেখা দেয়। এই দুর্দিনেই আমি বুলগেরিয়াতে পৌঁছে ছিলাম।

বড় পথটির উপর আসার পর দেখলাম কেউ কারো সঙ্গে কথা না বলে চলেছে। লক্ষ্য করলাম যদিও কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না, তবুও যেন চোখের ইঙ্গিতে অনেকে অনেক কথাই বলে ফেলছে। সেজন্যই বলেছিলাম ইউরোপের পলিটিক্স অন্য ধরনের। ইউরোপের কোথাও যদি দশ হাজার লোক জড়ো হতে পারে তবে অনেক বড় কাজ সমাধা করতে সক্ষম হয়। যাতে করে লোক একত্র না হতে পারে সেজন্য শাসক সম্প্রদায় প্রাণপণ চেষ্টা করতে কসুর করে না। অনেকে পেট ভরে না খেতে পেয়ে নিকৃষ্টতর সরকারী কাজ গ্রহণ করত এবং দেশদ্রোহী কাজ করতেও কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ করত না। বুলগেরিয়াতে সেরূপ লোকের অভাব ছিল না। ধনীর দল শাসক সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করার জন্যই ব্যস্ত থাকত। ধনীরা তাদের ধন এবং অন্যান্য সম্পত্তি রক্ষার জন্য বুলগার সরকারকে উপযাচক হয়ে সাহায্য করত। যে দেশের পথে-ঘাটে লোকের কথা বলার অধিকার নেই সে দেশের লোক কত কষ্টে থাকে তা সর্বসাধারণ অনুভব করতে পারে না। নামে স্বাধীন হওয়া বড়ই বালাই!

বড় পথটার ডান এবং বাঁদিকে বড় বড় রেঁস্তোরা ছিল। এই রেঁস্তোরাগুলিতে বিয়ার থেকে আরম্ভ করে কফি পর্যন্ত বিক্রী হ'ত। আমি একটি কাফেতে প্রবেশ করে আমার ভিক্ষাপত্র বিতরণ করতে লাগলাম। ভিক্ষাপত্র অনেকেই আগ্রহ সহকারে পাঠ করল কিন্তু কেউ আমাকে ডাকল না অথচ সকলে আনন্দের সঙ্গে আমাকে অর্থ সাহায্য করল। দুটি বড় বড় রেঁস্তোরায় গিয়েছিলাম, তাতেই আমাদের দেশের প্রায় ছাব্বিশ টাকা উঠেছিল। বুলগেরিয়া সস্তা দেশ। ছাব্বিশ টাকায় পরদিন বেশ ভাল করেই থাকা খাওয়া চলে। ভিক্ষা করতে আর ইচ্ছা হল না, ইংলিশ স্পিকিং হোটেলে গিয়ে লণ্ডন টাইম্‌স্ সংবাদপত্রখানা চেয়ে নিয়ে পড়লাম এবং দুগ্লাস গরম দুধ খেয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

কাপ্তান লিগ

কাপ্তান লিগ বুলগেরিয়া শাসন করত। কাপ্তান লিগ কি একটা মানুষ না আর কিছু সে সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম। হোটেলের রুমখানা বড়ই নির্জন মনে হচ্ছিল সেজন্য হোটেলের ভেতর দিকের বারান্দায় পাইচারী করছিলাম। একটি বয় আমাকে পাইচারী করতে দেখে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সে কি বলতে চায় তাই জানবার আগ্রহ হল কিন্তু তার কথা কিছুই বুঝতে পারলাম'না। আমি ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলাম।

পৃথিবীতে যত হোটেল আছে তার মালিক এবং বয়রা প্রায়ই গুপ্তচরের কাজ করে সেকথাটা আমার বিশেষ ভাবে জানা ছিল। তবে এমনও হোটেল-বয় দেখেছি যারা পুলিসের মাইনে খেয়েও পুলিশের বিরুদ্ধে কাজ করে। আমার উচিত ছিল

এখানে মনিব শব্দটি ব্যবহার করা। কিন্তু আমার বইয়ের পাঠক পাঠিকা মনিব কাকে বলে সে কথা ভাল করেই জানেন বলে মনিব শব্দের ব্যবহার করা হ'লনা। "যার নুন খাই তার গুণ গাই" সে যুগ আর নাই। সেজন্যই অসংলগ্ন কথার ব্যবহার কমই করেছি। রুমে বসে বয়টির কথাই চিন্তা করতে লাগলাম। এ বয়টি কিন্তু অন্য ধরণের। সে নিশ্চয়ই ডবল মাইনে পেত, তাতে আমার কোন ভুল হয়নি, তবে সেকি পুলিশের বিরুদ্ধাচরণ করে? করে করুক, তাতে আমার কি এল আর গেল। আমি পর্যটক মাত্র, এখানে পলিটিক্স করতে আসিনি এই ভেবেই মনকে সান্ত্বনা দিয়েছিলাম।

রাত বোধ হয় তখন দশটা হবে। দরজায় মৃদু করাঘাত। বয় আমার বিনা অনুমতিতেই রুমে প্রবেশ করে ভেতর থেকে রুমের তালায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতে একটি মাঝারি শিশি ছিল। ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিল সেই ওষুধটা হাতে পায়ে ঘসে দিলে শরীর সবল হয়। আমি উঠে একখানা চেয়ারে বসলাম, বয়টি বিনা বাক্যবেয়ে ক্রিম জাতীয় একটি ওষুধ শিশি থেকে বের করে হাতে পায়ে লাগিয়ে দিয়ে বিদায় নেবার সময়, তার বুকের উপর ডান হাতের বৃদ্ধ অঙ্গুলি রেখে বলল "এন্‌তি কাপিতাম লিগ্"। এর মানে হ'ল, বয়টি কাপ্তান লিগের শাসনের বিরুদ্ধ মত পোষণ করে। কিন্তু কথা হ'ল কে সেই কাপ্তান লিগ্। বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম "কাপ্তান লিগ্?" বয় বুঝল আমি কি জিজ্ঞাসা করেছি? সে বললে "ইংলিসী, ফ্রাংসে, ইতালীয়ানো, জাঁপোন, দচ্; আমারিকান্, কাপিতালিস্ট; কাপিতান লিগ"। বয়ের কথা বুঝলাম কিন্তু কিছুই বল্‌লাম না। সেরাত্রে ঘুমে যেন চোখ ভেঙ্গে আনছিল। কোন মতবাদ অথবা কোনদেশের কিছুই জানবার প্রবৃত্তি লোপ পেয়েছিল। ঘুম আমাকে সকল চিন্তা থেকে মুক্তি দিয়েছিল।

পরের দিন সকাল বেলা পিটার এসে দেখা দিল। পিটার আগের দিন হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করেছিল এবং আমাকে হোটেলে উঠতে সাহায্য করেছিল। পিটারের পিতা স্লাভন, মা আইরিশ সেজন্যই সে মাতৃভাষা বেশ ভাল করেই বলতে শিখেছিল। পিটার আসার পরই তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "কাপ্তান লিগ মানে কি হে?" "পিটার অনেকক্ষণ সে সম্বন্ধে কিছুই বলল না। তারপর আমাকে বলল "এসম্বন্ধে আপনার জানবার অনেক কিছু আছে, তবে যতদিন এদেশে থাকবেন ততদিন আমি যে সকল কথা বলব তা মুখে আনবেন না।"

পিটার বলতে লাগল "১৯৩২ খৃঃ অব্দে আমাদের দেশের একদল লোক 'লিগ্ অব্ নেশন' থেকে কতকগুলি টাকা ধার করে আনে এবং দেশের দৈন্য অপসারণ করবে ব'লে সকলকে বলে। 'লিগ্ অব্ নেশন' থেকে টাকা ধার করাটা রাজা বুরীশের মতে ছিলনা। ঐটাকা সর্বপ্রথমেই সোফিয়া থেকে কমিউনিস্টদের বিতরণ করা হয় এবং যে সকল মেসিডোনিয়ান্ বুলগেরিয়ার উন্নতির জন্য কাজ করত তাদেরও দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।" তার কথায় বাধা দিয়ে বললাম মেসিডোনিয়ানরা কি বুলগার নয়? পিটার আরও গম্ভীর হয়ে বলল "তারাও বুলগার, গত মহাযুদ্ধের ক্ষতি পূরণ স্বরূপ গ্রীস্‌কে এই

স্থানটুকু দেওয়া হয়েছে। যে স্থানটুকু দেওয়া হয়েছে তার সকল অধিবাসীই বুলগার। বুলগেরিয়ার যাতে উন্নতি হয়, ছেড়ে দেওয়া মাতৃভূমির অংশ যাতে মাতৃভূমিতে পুনরায় সংযোগ হয়, সেজন্য যারা বর্তমানের বুলগেরিয়াতে বাস করে তারা তত মাথা ঘামায় না, যতটুকু মাথা ঘামায় মেসিডোনিয়া এবং যুগস্লাভিয়ার বুলগার।

যে লোকগুলি 'লিগ্‌ অব্‌ নেশন' থেকে টাকা ধার করে এনেছিল তারা কতকগুলি জেনারেলকে বশীভূত করে পূর্বের সরকারকে ঠেলে ফেলে দেয় এবং বর্তমানে যারা রাজ্য চালাচ্ছে তারা বাস্তবিকই দেশদ্রোহী এবং বিদেশী ধনীদের উপদেশ মত চলে। তারা অত্যাচার করতে কসুর করেনা, দেশের লোকের ভালমন্দ কিছুই দেখেনা। বুলগার হয়ে বুলগেরিয়ানদের প্রতি, কাপ্তান লিগের দ্বারা পরিচালিত লোক যে এত অত্যাচার করতে সক্ষম হবে তা কেউ ধারণাও করেনি। পূর্বে এদেশে বেকার মজুর এবং ধনী কৃষকগণ সরকার থেকে সাহায্য পেত, এখন সেসব কিছুই নেই। বৃদ্ধদের পেন্‌সন্‌ দেবার বন্দোবস্ত হয়েছিল, কাপ্তান লিগের দল তাও উঠিয়েছে। কর্ণেল ভেলচেপ্‌ই বর্তমানে দেশের সর্বময় কর্তা।"

পিটার আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল অমনি দরজায় এসে কে টোকা দিল। আমি নিজে গিয়ে দরজা খুলে দিলাম। এক জন পল্টনী অফিসার ঘরে প্রবেশ করেই আমার কাছে পাসপোর্ট চাইলেন। আমি তাকে আমার পাসপোর্ট দিলাম। তিনি আমার পাসপোর্ট খানা দেখেই মুখের রকম বদ্‌লিয়ে ফেললেন। পিটারের মারফতে কথা বলতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে বয়কে ডেকে কি ভাল খাদ্য আনতে আদেশ দিলেন। যে লোকটি পাসপোর্ট দেখেই সন্তুষ্ট হ'ল তাকে অটোগ্রাফ-বই-খানা দেখাতে ইচ্ছা হল। অটোগ্রাফ-বই-খানা তার হাতে দিয়ে বললাম "কোনও পলিটিক্যাল-ম্যান এরূপ করে সময় কাটাতে পারে না। আমি পৃথিবী দেখতে এসেছি, শুধু পৃথিবী দেখেই চলে যাব।" মিলিটারী অফিসার পিটারকে আদেশ দিলেন, সে যেন আজই আমাকে স্থানীয় সংবাদ পত্র অপিসে নিয়ে যায় এবং আমার বক্তব্য অনুবাদ করে সংবাদপত্রের সম্পাদককে বলে। পিটারের সেদিনের মজুরী আমার সামনেই দেওয়া হল। হিসাব করে দেখলাম পিটারকে যা দেওয়া হয়েছে তা আমাদের দেশের আট আনার সমান।

মিলিটারী অফিসার রুম থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে পিটারও রুম থেকে বেরিয়ে গিয়ে কতক্ষণ পর ফিরে এল। পিটার ফিরে আসবার পর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম "কি কথা হচ্ছিল হে?" সে বললে "যা চেয়েছিলাম তাই পেয়েছি। আজ থেকে আমি আপনার পেছন পেছন ঘুরব এবং যতদিন আপনি সোফিয়াতে থাকবেন ততদিন দৈনিক মজুরী পাব। আমার কার্যকাল সকাল আটটা থেকে বেলা তিনটা পর্যন্ত।" পিটারের কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম, তারপর পিটারকে বললাম "কোন সভ্যদেশে স্কুলের ছেলে মেয়েকে গোপনীয় পুলিশের কাজে নিযুক্ত করা আইন বিরুদ্ধ। তোমাদের দেশ এখন বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা তোমাদের ভালমন্দ কিছুই দেখছে না এবং ভবিষ্যতেও দেখবে না। সাম্রাজ্যবাদী নরপশু পিশাচ।" পিটার মাথা নেড়ে বলল "দেখা যাক কি করা যায়।"

আমরা রুমে বেশিক্ষণ বসলাম না। পিটারকে সঙ্গে করে একটা দৈনিক পত্রিকার আপিসে গেলাম। সম্পাদক আমাকে দেখে বেশি সুখী হলেন না। টেলিফোন উঠিয়ে আর্মি আপিসে কথা বলে যখন আমার সম্বন্ধে কিছু লিখতে আদেশ পেলেন তখন মুখের আকৃতি বদল করে বল্‌লেন—

তবে আপনি রবীন্দ্রনাথের দেশের লোক?

হ্যাঁ, মহাশয়।

রবীন্দ্রনাথ যে ভাষায় লেখেন, সে ভাষা আপনার জানা আছে কি?

সম্পাদক এবং মিলিটারী আপিসে ফোনে কথা বলতে একঘণ্টা সময় লেগেছিল, আমি সে কথাটাই ভাবছিলাম। হঠাৎ যখন সুমধুর ভাষায় ভালকথা সম্পাদকের মুখ হতে বের হল তখন বললাম "আজ্ঞে হ্যাঁ আপনার ধারণা অবিকল সত্য, যদি ইচ্ছা হয় তবে এখনই রবীন্দ্রনাথের একটি পদ্য তাঁরই একটি কবিতা তাঁরই ভাষায় তাঁরই ব্যবহৃত অক্ষরে লিখে দিতে পারি।"

সম্পাদক তৎক্ষণাৎ একখানা কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললেন—"কিছু লিখুন।" আমি লিখতে লাগলুম।

"আমার মাথা নত করে দাওহে তোমার চরণ ধূলার তলে"—দুটি লাইন লিখে কাগজখানা দেবার সময় সম্পাদক বললেন আপনিও কিছু লিখে দিন। আমি লিখলাম "আমার বুলগার ভাই-বোনরা, তোমরা সকল রকমে স্বাধীন হয়ে পৃথিবীর পতিত এবং নির্যাতিত লোকের সাহায্য করতে অগ্রসর হবে এই আমার সবচেয়ে বড় ধারণা। এই ধারণা পোষণ করে তোমাদের দেশ হ'তে বিদায় নেব।" লেখা হয়ে গেলে সম্পাদকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে আমার হাতের লেখা ব্লক হয়ে বুলগেরী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'ল। আমি তারই এক কপি সংবাদপত্র থেকে কেটে আমার এল্‌বামে রেখেছিলাম এবং ইংলণ্ড থেকে যখন ভারতে ফিরে আসি তখন সঙ্গে করে নিয়েও এসেছিলাম। কিন্তু ১৯৩৬ সালে ৩৭নং হ্যারিসন রোডের বোর্ডিং-এ থাকবার সময় হঠাৎ একদিন একটি টেলিফোনে কল্‌ এল। আমি ভেবেছিলাম কোনও দাতা আমাকে কিছু দেবার জন্য ডাকছেন। কিন্তু ফোনের কাছে দাঁড়িয়ে যখন কথা বলতে লাগলাম তখন বুঝলাম কার সঙ্গে কথা বলছি। কর্কশ স্বরে কে বলল "লর্ড সিংহ রোড জানেন না, দুনিয়া ঘুরে এসেও লর্ড সিংহ রোডের সংবাদ......" ইত্যাদি। পরদিন পরিশ্রম করে খুঁজে লর্ড সিংহ রোড বের ক'রে আমাদের দেশের "আক্কেলওয়ালা" পুলিসের আপিসে গেলাম। সেদিনই আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু ইউরোপের প্রেসকাটিং খানা তাদের আপিসেই রয়ে গিয়েছিল, আর ফিরে পাইনি। যদি আজ সেই প্রেসকাটিং আমার কাছে থাকত তবে বাঙালী জাতেরই গৌরব বাড়ত। বাঙালী বুঝতে পারত তাদের দেশের রবীন্দ্রনাথকে বিদেশের লোক কত ভালবাসে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন "রেখেছ বাঙালী ক'রে মানুষ করনি" অতএব যা হস্তগত করে আমারই বাঙালী ভাই তৃপ্ত হয়েছিলেন এবং ভেবেছিলেন পদবী বাড়বে তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই!

পিটারও আমার জন্য একখানা সংবাদপত্রের কাটিং এনেছিল এবং আমার হাতে দিয়ে আমার সম্বন্ধে কি লেখা হয়েছে তাই অনুবাদ করে বলেছিল। আমরা সকাল বেলায়ই অন্য আর একখানা সংবাদপত্র কিনে তার আগাগোড়া পড়ছিলাম। পিটার যখন

সংবাদপত্র পড়ে শোনাচ্ছিল তখন বৃটিশ কন্‌সালের আপিস থেকে লোক এসে হাতের সংবাদ পত্রখানা দেখিয়ে বলেছিল—

এটা কি আপনারই হাতের লেখা ?

নিশ্চয়ই, বসুন।

সহকারী কন্‌সাল একখানা চেয়ারে বসে আমার সঙ্গে নানা বিষয়ে কথা বলতে লাগলেন। কোন্ কোন্ দেশ বেড়িয়েছি তার একটি বিস্তারিত তালিকাও মনের কোণে অঙ্কণ করছিলেন। তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে আমি বললাম "সকল কথা মনে রাখতে পারবেন না, এই নিন কাগজ, আমি বলে যাচ্ছি আপনি লিখে নিন।" কনসাল লিখলেন না, শুধু বললেন "আপনি একজন ভবঘুরে আপনার সম্বন্ধে লেখার কিছুই নেই। এখন থেকে আমরা বন্ধু। ভুলে যান আমি একজন সহকারী কন্‌সাল।" আমিও তাকে বন্ধু ভাবেই গ্রহণ করলাম।

কন্‌সাল বললেন "কখনও এদেশে ট্রেণে উঠবেন না; এতে আমাদের বড়ই বিপদে পড়তে হয়। যারা ট্রেণে বেড়ায় অথচ পর্যটক বলে পরিচয় দেয় তাদের লোকে বড়ই সন্দেহের চক্ষে দেখে। এই গেলবার একটি লোক একটি সাইকেলের বাক্স নিয়ে গাড়ীতে ভ্রমণ করছিল, তাকে নিয়ে আমাদের বড়ই বিপদে পড়তে হয়। বুলগার সরকার তাকে অতিকষ্টে ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই হাঙ্গামা আমাকেই পোয়াতে হয়েছিল।" কন্‌সালকে বললাম "পারতপক্ষে এ কাজটি করব না মশাই।" তারপর কন্‌সাল আমার অটোগ্রাফ বইখানা দেখতে চান। অটোগ্রাফ বইখানা তার হাতে দেওয়ায়। কন্‌সাল অনেকক্ষণ বসে বইখানা দেখে এতই আনন্দিত্ হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর আনন্দের ফোয়ারা চেপে না রাখতে পেরে কতকগুলি কথা বল্‌লেন। আমি বুঝতে পেরেছিলাম সত্যিকারের পরিশ্রমের কাছে সকলেই মাথা নত করতে বাধ্য হয়। মনে প্রাণে যে কাজ করা যায়, তাতে শত্রুও সায় দেয়। কন্‌সালের কথায় আমিও এত আনন্দ পেয়েছিলাম যে, সে আনন্দের কথা এখনও ভুলতে পারিনি। এর পর থেকে আমরা যখন কথা বলতাম তখন "প্লিজ" অথবা থ্যাঙ্কইউ শব্দের ব্যবহার করতাম না। যখন এদুটি শব্দের ব্যবহার হয় না তখন কোনও ইংলিশ ছত্রের অনুবাদের সময় তুমি শব্দটি ব্যবহার করা চলে।

সোফিয়াতে একটি আমেরিকার কলেজ আছে। এই কলেজে বুলগার ছাত্রদের ইংলিশ শিক্ষা দেওয়া হয়। পিটারও সে কলেজে পড়ত। পিটার আমাকে বলল "চলুন একবার আমাদের কলেজের প্রফেসরদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসবেন।" বিনা আপত্তিতে তার সঙ্গে চললাম। কতক্ষণ যাবার পরই তাদের একজন প্রফেসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। আমিই প্রথম কথা বললাম কিন্তু প্রফেসার মহাশয় এতই কম কথা বলেন যে, আমার ভদ্রতাসূচক কথার উত্তর দু'এক কথায় শেষ করে আকাশের দিকে চেয়ে থাকলেন। প্রফেসর মহাশয়ের কথাগুলি আমার মোটেই ভাল লাগছিল না, সেজন্যই একটু জোরে বল্‌লাম "প্রফেসর মহাশয় আকাশের দিকে তাকালে দিনের বেলা সূর্য আর নীল আকাশই দেখবেন। রাত্রে চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজি দেখতে পাবেন। বৃষ্টি এবং বরফপাতের সময় এ দুটি ছাড়া আর

কিছুই দেখতে পাবেন না। ভাবছেন ঈশ্বর বলে .কিছু আছে, তা কিন্তু নেই, ঈশ্বর শব্দ মাত্র, তাও মানুষের কল্পিত। মানুষের ঠোঁট নাড়ার সঙ্গেই তার উৎপত্তি এবং মানুষের ঠোঁট যখনই বন্ধ হয় তখনই তার শেষ।"

প্রফেসর আমার দিকে চেয়ে বললেন "কি বলবেন?" আমি বললাম "আমি একজন হিন্দু, আমাদের পূর্বপুরুষই ঈশ্বর বলে একটি শব্দ তৈরী করেছিল, সেই শব্দটিকে আপনারা নিজস্ব করে নিয়েছেন। এই শব্দটির লোপ করার অধিকার আমাদেরই আছে আপনাদের নেই। এখন আসি।" পিটারের হাত ধরে আমরা অন্য দিকে চ'লে গেলাম।

তুর্কীতে আইন মতে করকুষ্ঠি এবং এই জাতীয় অর্থকরী-বিদ্যা অথবা এই প্রকারের অন্য কিছু যদি কেউ ব্যবহার করতে চেষ্টা করে তবে আইন মতে কঠোর শাস্তি পায়। সে কঠোর শাস্তির কথা লোকে আর এখন বলেনা, কারণ বর্তমানে কেউই হস্তরেখার ইত্যাদির প্রতি চেয়েও দেখেনা, কিন্তু সোফিয়ার প্রত্যেকটি রেঁস্তোরায়, কাফে অথবা কাবেরাতে জিপসীরা লোকের ভাগ্য পরীক্ষা করে। অনেকে জিপসীদের অকাতরে অর্থ বিতরণ করে। আমরা আজ একটি কাফেতে গিয়ে সেই রকমের কিছু পরীক্ষা করতে বসলাম। পিটার এক জন জিপসীকে না ডেকে একজন বিশেষজ্ঞ বুলগারকে আমার হাত পরীক্ষা করাতে আনল। তিনি নাকি এদেশের একজন বিশেষ লোক। তিনি মানুষকে যা বল্‌লেন তাই সত্য হয়। তিনি আমার কাছে এসে বল্‌লেন "আপনার শরীর অসুস্থ, মন দুর্বল, অর্থাভাব লেগেই আছে, অনেক দেশ পর্যটন করেছেন, ভবিষ্যতে একজন বড় লোক হবেন" ইত্যাদি নানান্ কথা। তারপর আমার হাত দেখে বললেন, আমার বিয়ে হয়েছে, ছেলেপিলেও আছে, দেশে ফিরে যাবার জন্য আমার মন অস্থির হয়েছে। গণক ঠাকুরকে কিছু না বলে পিটারকে জিজ্ঞাসা করলাম "এরূপ বর্বরদের শাস্তি দেবার জন্য এদেশে কি কোনও আইন নেই!" পিটার হেসে বল্‌ল, "এদেশে কেন, ইউরোপের কোথাও সেরূপ কোন আইন এখন পর্যন্ত গড়ে উঠেনি।" অকাল্‌টিস্ট, পমিস্‌ট, স্পিরিচুয়েলিস্ট এদের সংখ্যা বুলগেরিয়া, যুগস্লাভিয়া, হাঙ্গেরী, অষ্ট্রিয়া এবং বেলজিয়মে যেমন দেখেছি তেমনি অন্যত্র খুব কমই দেখেছি। ইত্যাকার জীব আমার কাছে এসে তাদের বিদ্যা জাহির করত। আমি তাদের বলতাম "তোমাদের নিজের ভাগ্যটা একবার দেখনা বাপু, অপরের ভাগ্য গুণে কি লাভ হবে? যদি নিজের ভাগ্য নিজে গুণতে পার তবেইত সকল লেঠার আপদ চুকে যায়।"

এই ভাবে যখন আমি হস্তরেখাতত্ত্ববিদকে উপদেশ দিচ্ছিলাম তখন অনেক লোকই আমার কাছে দাঁড়িয়ে জটলা করছিল। কতকগুলি লোক আমাকে "কমিউনিস্ট" বলে গাল দিতেও কসুর করেনি। পিটারকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম বলকানে কমিউনিস্ট শব্দটি গাল রূপেই গণ্য হয়। যখনই কেউ আমাকে কমিউনিস্ট বলে গাল দিত তখনই আমার আনন্দ হ'ত কারণ এই পৃথিবীতে যারা চিরদিন সৎকে অবহেলা করে আসছে, মিথ্যাকে যারা আপন করে তুলেছে তারাই নতুনকে গ্রহণ করতে ভয় পেয়েছে। আমার কাছে কমিউনিজমও নতুন বলেই মনে হ'ত।

কাপ্তান লিগ, বৃটিশ, ফরাসী, জাপানী এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ যেখানেই থাকুক না কেন, ভাগ্যচক্র থাকবেই। এসব হল সাম্রাজ্যবাদীদের অর্থনীতির প্রথম নম্বরের দোষ। কাফে থেকে ফিরে আসার পথে কয়েক জন লোক আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করল। তাদের উদ্দেশ্য আমি কমিউনিস্ট কিনা তা জানতে চায়। তাদের মুখের উপর পরিষ্কার ভাষায় বলেছিলাম "কমিউনিস্ট আমি হতে পারবনা, সে সাহস আমার নাই।"

এরূপ ভাবে কথা বলা বড়ই অন্যায় কাজ। প্রতিফল যা পেয়েছিলাম তা পূর্বেই বলেছি। মামুলী কারণে দুটা লোক ঘাড়ের উপর ঝাপিয়ে পড়া কি কম কথা। এদের অত্যাচারে আমি দমিনি, শুধু অনুভব করেছিলাম বুলগেরিয়াতে যারা সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করছে তাদের যখন ধরা হয় তখন তাদের কত অত্যাচার করা হয়।

বৃটিশ কন্‌সালের সাহায্যে আরও পনর দিন সোফিয়াতে থাকবার আদেশ পেয়েছিলাম। এই পনরদিন কি করে কাটানো যায় তারই একটা হিসাব করে দেখলাম এখানে পনর দিন থাকা যেতে পারেনা। বেশীর পক্ষে আর তিন দিন থাকা চলে। এই তিনটি দিন শুধু বিশ্রাম করে এবং পিটারের কাছ থেকে নানারূপ সংবাদ সংগ্রহ করেই কাটিয়ে দিলাম।

সোফিয়া হইতে বিদায়

মানুষ বেশীক্ষণ ঘুমিয়ে থাকতে পারে না। মানুষ জাগে, কাজ করে, সমাজের উন্নতি সাধন করে। এতে যদি কেউ বাধা দেয়, তবে মানুষ বিদ্রোহ করে। অনেক নরদেহ ধারী অমানুষ জীবিত অবস্থায়ও মৃত, তারা বিদ্রোহ করে না। জিপ্‌সীরা সে রকমেরই অমানুষ। তারা কতকগুলি অপরিবর্তনীয় সামাজিক নিয়মকে মেনে চলাই একমাত্র করণীয় বলে ঠিক করেছে, সে জন্য তারা মরতে বসেছে। শুনেছি হিটলার নাকি জিপ্‌সী নির্বংশ করেছেন। এতে দুঃখ করার কিছুই নেই। আফগানিস্থানের হিন্দুর নিপাত পাঠানরা করেনি, তারা আপনি নিপাত হয়েছে। কিন্তু বুলগারদের কেউ ধ্বংস করতে সক্ষম হয়নি এবং হবেও না, কারণ তারা সময়ের সঙ্গে পা ফেলে চলেছে। ঐ যে পুরোহিতগণ চর্বিত চর্বণ করে পুরাতন কথা বুলগারদের শোনাবেন, তা কি বুলগাররা ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেয়? কখনই না। তারা ভাবে, এসব বাজে কথা। মানুষের অন্ন বস্ত্রের সংস্থান মানুষকেই করতে হবে। ছোট বড় হয়ে অর্থাৎ ধনী এবং নির্ধন হয়ে কেউ জন্মায়নি, মানুষই মানুষকে দরিদ্র করে রেখেছে এই দারিদ্র্যের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে রাজশক্তিকে খর্ব করতে হবে। সর্বসাধারণ সেই শক্তি ছিনিয়ে নিয়ে সমাজের সেবা করবে। এতে রক্তপাত অনিবার্য। বুলগেরিয়ার প্রগতিশীল লোক রক্তপাতের জন্য প্রস্তুত হয়ে সেদিকে অগ্রসর হচ্ছে দেখে মনে বেশ আনন্দ হয়েছিল। কাপ্তান লিগ্ ভাঙতে আরম্ভ করেছিল। যারা কাপ্তান লিগের কর্ণধার ছিলেন এবং ডেমোক্রেসী বলে চীৎকার করছিলেন তাদের দেনা পাওনার হিসাব অর্থাৎ শোষণ এবং শাসনের ফিরিস্তি মস্ত বড় ছিল। সেজন্য অনেকে লিগ পরিত্যাগ করে নিজের ইচ্ছামত শোষণ এবং শাসনের ব্যবস্থা নিজেই করছিল। সে ছিল ১৯৩৫ সাল, আর এটা হ'ল ১৯৪৫ সাল। এই দশ বৎসরের মধ্যেই বুলগেরিয়া কাপ্তান লিগের ঘাড়ে পদাঘাত করতে সক্ষম হয়েছে। পরিবর্তন ইউরোপের দ্বারদেশে এসে দাঁড়িয়েছে। বুলডগ্ আর কতদিন কুকুর হয়ে মানুষকে আটকে রাখতে সক্ষম হবে?

সোফিয়া ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, তবুও একটা অজানা বাসনা আমাকে বেলগ্রেদের দিক টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। দুসপ্তাহের পরিচয় বেশ ঘনীভূত হয়ে বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। অনেক পলিটিকেল পার্টির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। অনেকে এসে কথা বলত। অনেকে উপদেশ দিত। ক্লাবে ডেকে নিয়ে যেত আর কেউ বলত লোকটা বেশ টাকা পিটছে।

যাবার দিন ঠিক হল। পিটার্ আমাকে জিজ্ঞাসা করল "আপনি প্রায় কথার শেষেই বলেন ভারতবর্ষ পরাধীন, আপনারা কিরূপ স্বাধীনতা চান?" পিটারের কথা আমাকে অবাক করে দিয়েছিল। আমি কতক্ষণ তার কথায় জবাব দিতে পারিনি।

তারপরই পিটার বল্‌ল "স্বাধীনতা পাবার জন্য আপনারা কি করা কর্তব্য হবে তা কি ঠিক করে নিয়েছেন?" বাস্তবিকই পিটার আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছিল। প্রথম কথা হল কি রকমের স্বাধীনতা চাই, তারপরই প্রশ্ন হ'ল স্বাধীনতা অর্জন করার জন্য কিরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে তার একটা পদ্ধতি ঠিক করা চাই। ভারতে সে সম্বন্ধে কিরূপ নিয়ম নির্ধারিত করা হয়েছিল তা আমার জানা ছিল না

বুলগেরিয়াতে ম্যাসিডোনিয়ান্‌রা রাজা বুরীশের সামনে স্ট্রীট ফাইট করছে। কমিউনিস্টরা নির্বাচনে একবার সোফিয়ার সর্বময় কর্তা হয়েছে তারপর এসেছে বৈদেশিক লিগ-অব্‌ নেশনের শাসন। এটাকেও বুলগারগণ উৎখাত করতে বসেছে। এত ছোট একটা জাত, তাদের রাজা আছে, রাজ্য আছে, তবুও তারা শাস্তিতে নেই। এরই বা কারণ কি? এসব কথা আমি বিশেষ ভাবে আলোচনা করতে সক্ষম হইনি বলেই, আজ পিটারের মুখে এই নতুন প্রশ্ন। আমি তার জবাব কি দিয়েছিলাম তা বলে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হবেনা।

দ্বিতীয় বিষয়টি হল, স্বাধীনতা অর্জন করার প্রোগ্রাম যিনিই দেবেন তাকেই বেশ বেগ পেতে হবে, অতএব আসল কথা থেকে দূরে সরে থাকাই ভাল। স্বাধীনতা পাবার জন্য কি প্রকারের কাজ করতে হবে, একথাটা কোন মতেই আমার মত লোকের পক্ষে বলা সম্ভব নয় সেখানে কি রকমের স্বাধীনতা হওয়া দরকার তার কোন প্রশ্নই উঠতে পারেনা। আমি তাকে বলেছিলাম, এসব বিষয় নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

আমার কথা শুনে পিটার বিদায় নিয়েছিল, সে আর আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। সে বুঝতে পেরেছিল, আমি একটি অপদার্থ। অপদার্থের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করা প্রগতিশীলরা মোটেই পছন্দ করে না! পিটারের দেখা না পেয়ে আমিও সত্বর সোফিয়া পরিত্যাগ করব ঠিক করলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই সাইকেল্‌খানাকে সাজিয়ে নিয়ে, হোটেলের দেনা মিটিয়ে দিলাম। হোটেল-বয় হোটেল থেকে বের হয়ে আমার করমর্দন করল এবং বলল, সে আমাকে শহরের বাইরে রেখে আসবে। তার কথায় প্রতিবাদ করলাম না। সে-ও একখানা সাইকেল নিয়ে আমার সঙ্গে চলল। শহর থেকে বের হবার জন্য আমাদের পনর মিনিট সময় লেগেছিল। শহরের বাইরে এসে হোটেল-বয় আমাকে বললে, "ঐ যে দেখছেন পথটা, এই পথটি বেলগ্রেদের দিকে চলে গেছে। এখান থেকে বুলগেরিয়া সীমান্ত বেশী দূরে নয়। যদি ইচ্ছা করেন তবে পথে একটি ছোট্ট গ্রাম পাবেন, সেই গ্রামে রাত কাটিয়ে সকাল বেলা রওনা হলেই ভাল হবে। যুগোস্লাভ্‌ সীমান্তে বড়ই কড়াকড়ি হয়, সেখানে হয়ত আপনাকে কয়েক ঘণ্টা বসিয়েও রাখতে পারে।"

যুবককে বিদায় দিয়ে পাহাড়ের পথ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলাম। কয়েক মাইল যাবার পরেই পূর্ব পরিচিত ইহুদী যুবক এবং বুলগার যুবকের সঙ্গে দেখা হ'ল। সোফিয়ায় তাদের সঙ্গে আমার মোটেই দেখা হয় নি। কেন যে তারা আমার সঙ্গে দেখা করে

নি সে কথা আমার মনেও আসছিলনা। সোফিয়ার লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এবং নানা বিষয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গিয়ে এদের কথা একদম ভুলে গিয়েছিলাম।

বুলগাররা আমাদেরই মত আলিঙ্গন করে। অনেক দিন পর পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমি উভয়ের সঙ্গে আলিঙ্গন করলাম এবং তাদের জিজ্ঞাসা করলাম সোফিয়ায় কেন তারা আমার সঙ্গে দেখা করে নি? ইহুদী যুবক বলল "সোফিয়ায় আমার সঙ্গে তাদের দেখা করবার কোনরূপ সুযোগ এবং সুবিধা ছিল না সেজন্যই দেখা করেনি। যারা দেশসেবা করে তাদের অনেক বিপদ আপদ স্বেচ্ছায় বরণ করে নিতে হয়। এই যুবকদ্বয় দেশসেবী। তারা দেশের জন্য প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিল সেজন্যই আমার মত ভবঘুরের সঙ্গে সোফিয়ায় দেখা করেনি। আমি তাদের একই সঙ্গে পথ চলতে লাগলাম এবং তাদের জানিয়ে দিলাম কাছের কোন গ্রামে গিয়ে আমরা রাত কাটাব এবং পরের দিন তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যুগোশ্লাভিয়ার দিকে রওনা হব।

এখান থেকে পার্বত্য পথ আরম্ভ হয়েছে। ক্রমেই পথ উঁচু হতে উঁচু হয়ে চলেছে। খাড়ি পথে বাইসাইকেল চালানো বড়ই কষ্টকর। আমি কখন সাইকেল থেকে নেমে, কখন পায়ে হেঁটে আবার কখন বা সাইকেল ঠেলে পথ চলতে লাগলাম। ত্রিশ কিলোমিটার পথ চলতে প্রায় ছয় ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়েছিল। তারপরই এল গ্রাম, গ্রাম খুবই ছোট। গ্রামের বাসিন্দা পনরটি পরিবারের বেশি নয়। এরই মধ্যে দুটি হোটেল এবং কয়েকটি খাবারের দোকানও ছিল। আমরা সতের দিনার করে তিন খানা রুম ভাড়া নিলাম এবং প্রত্যেকেই আপন আপন রুমে গিয়ে ঘণ্টা খানেক বিশ্রাম করে আবার একত্র হলাম। প্রথমেই আমরা একটি ছোট্ট নিরিবিলি খাবারের দোকানে গিয়ে খাবার খেতে বসলাম। খেতে বসে কম কথাই বলেছিলাম, কারণ সীমান্তের বাড়িঘরের দেওয়ালেরও শ্রবণশক্তি রয়েছে এ কথাটি সকলেই জানে। খাওয়া শেষ করে রুমে এসে আমরা কাগজ কলম নিয়ে কথা বলতে বসলাম।

সাথীরা আমাকে জানিয়ে দিল, আজ রাতেই তারা পদব্রজে সীমান্ত পার হবে এবং হংগেরীতে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করবে। পথে তারা ফলের ব্যবস্থা করবে। এরূপ ভাবে লুকিয়ে জীবন কাটানো সকলের পক্ষে সম্ভব না। যাদের মনে প্রবল বাসনা রয়েছে তারাই এমন করে লুকিয়ে থাকতে পারে।

রাত বোধহয় দশটা হবে। আমার সাথীরা আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে অন্ধকার রাত্রেই ঘরের বের হয়ে পড়ল। রাত যখন দুটো হবে, তখন কয়জন বুলগার পুলিশ এসে আমার দরজায় করাঘাত করল। উঠে দরজা খুলে দিলাম। পুলিশের লোক পাশের ঘরের লোক কোথায় জিজ্ঞাসা করল। পাশের ঘরের লোক কোথায় গেছে তা আমি কি করে বলব? অঙ্গুলি সঙ্কেতে জানিয়ে দিলাম "অনেক দূর চলে গেছে।"

সকাল হবার আগেই এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। বৃষ্টিতে আর ধুলো নেই। সুপ্রভাতে নবশক্তিতে বলীয়ান হয়ে আমি পথ ধরলাম। চলার পথের দুদিকের প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য বড়ই সুন্দর। হরিদ্বারের কাছে সেরূপ দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। হরিদ্বারের পাহাড়গুলির সঙ্গে বুলগার পার্বত্যভূমির পথগুলির সঙ্গে তুলনা করতে লাগলাম। পথ ক্রমেই আরও উঁচু হয়ে চলেছে। কতকগুলি বুলগার কৃষক তাদের উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে পীরট নামক শহরের দিকে চলেছে। পীরট যুগস্লাভিয়ার একটি শহর। নিরীহ কৃষকদের পথ ছেড়ে দিয়ে দাঁড়ালাম। তারা আমার দিকে চাইল। তারা আমাকে দেখে কি ভেবেছিল তারাই জানে, কিন্তু তাদের সীমান্ত যন্ত্রণা আমাকে কাতর করে তুলছিল।

কতক্ষণ যাবার পরই দেখতে পেলাম কতকগুলি লোহার খুঁটি কোথা থেকে আরম্ভ হয়ে উত্তর দিকে চলে গিয়েছে। খুঁটিগুলির উভয় দিক তিন চেন্‌ (chain) করে পরিষ্কার করা হয়েছে। অনুমানে বুঝলাম এটাই হবে বুলগার-যুগস্লাভ সীমান্ত। পাহাড়ের গা বেয়ে পথ। সেই পথ ধরে এগিয়ে গেলাম। ইউরোপের একটি দেশ ভ্রমণ শেষ করেছি, অপরটিতে সবেমাত্র পদার্পণ করব এতে আনন্দ হবারই কথা। আমি সেই আনন্দে বিভোর হয়ে যখন পথ চলছিলাম তখন ডানদিক থেকে কে আমাকে লক্ষ্য করে ডাকল বলেই মনে হল। চেয়ে দেখলাম সমতল ভূমিতে একটা লোক দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকছে। শুধু ডাকছে নয়, সে যেন রাগান্ধ বলেই মনে হ'ল। লোকটার মনের ভাব দূর থেকেই বুঝতে পেরে তার দিকে এগিয়ে গেলাম।

মাঠের ঠিক মাঝখনে একটা ঘর। তারই সামনে একটা লম্বা মোটা কাঠের মাথায় প্রকাণ্ড একখানা যুগস্লাভ পতাকা পত্‌ পত্‌ করছিল। পতাকার কাছে দাঁড়িয়ে লোকটা গুরুগম্ভীর ভাবে আমার কাছে পাসপোর্ট চাইল। আমিও পকেট থেকে পাসপোর্ট খানা বের করে দিয়ে বল্‌লাম "এই নাও পাসপোর্ট"। ভিসা আমার ছিলই। শুধু প্রশ্ন ছিল বাইসাইকেলের Trip Tick (ত্রিপ টিক) এর বিষয়। এই বিষয়টা লোকটি আমাকে কোন মতেই বুঝাতে পারছিল না। আমি ইঙ্গিতে লোকটাকে তার ঘরের ভেতর যেতে বল্‌লাম এবং সেখানে বসে কথা হলেই আমি সাইকেলের জন্য কিছু টাকা জমা দিতে পারব। অবশেষ অনিচ্ছায় লোকটা তার ঘরে গেল কিন্তু আমাকে কিছুতেই চেয়ারে বসতে দেবে না গোঁ ধরল! আমিও চেয়ারে না বসে কথা বলব না বলে গোঁ ধরলাম। অবশেষে আমাকে একখানা চেয়ার দেখিয়ে দিল, আমি তাতে বসলাম। ইত্যবসরে লোকটা একটি কোট গায়ে দিয়ে অন্য একটা সাইকেল নিয়ে পীরটের দিকে চলতে বল্‌ল। আমিও তার পিছু নিলাম।

বেলগ্রেদের পথে

মাইল দুই যাবার পরই আমরা একটি ময়দানে পৌছুলাম। ময়দানের অদূরেই পীরট গ্রাম।—ময়দানে মস্ত দোতলা একটা ঘর। সেই ঘরে অনেকগুলি লোক বসে ছিল। আমাকেও সেখানে যেতে হল। সেখানে গিয়ে সবাইকে নমস্কার করে একখানা চেয়ার টেনে বসে পড়লাম এবং ঠিক করলাম এদের সঙ্গে আজ একটু খেলতে হবে।

এটা হল স্থানীয় ইমিগ্রেসেন আপিস। বুলগেরিয়া, গ্রীস এবং রুমানিয়া থেকে যত লোক এদিকে ঘোড়ার গাড়িতে করে আসে তাদের কাছে থেকে ট্যাক্স নিয়ে যুগস্লাভিয়ায়

প্রবেশ করার পারমিট দেওয়া হয়। কি রকম করে পারমিট দেওয়া হয় তাই দেখার জন্য নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। কয়েকজন লোক আমার কাছে 'ট্রিপ টিক'-ও চাইল, আমি যেন তাদের কথা কিছুই বুঝিনি এই ভাণ করে বসে রইলাম। বেলা সাড়ে নয়টার মধ্যেই অনেক কৃষক তাদের উৎপন্ন দ্রব্য নিয়ে ঘরটার সামনে এসে দাঁড়াল। এদের দেখামাত্র কয়জন অফিসার নীচে নেমে গিয়ে হামকী তুমকী করে মালের হিসাব লিখতে আরম্ভ করলেন। আমাদের দেশে যারা হাম্‌কী তুম্‌কী করে তাদের মানসিক ভাব যে প্রকারেরই থাকুক না কেন, যাদের প্রতি হামকী তুম্‌কী করা হয় তারা কিন্তু হাম্‌কী তুম্‌কীর কথা মনে রাখেনা। এটা ইউরোপ, এখানকার লোকের প্রকৃতি ভিন্ন রকমের। বিশেষ করে লক্ষ্য করলাম, যারা হাম্‌কী তুম্‌কী করছে তারা যেন একটা প্রতিশোধ নীচ্ছে, এবং যারা এই হাম্‌কী তুম্‌কী নীরবে সহ্য করছে তারাও এক দিন প্রতিশোধ নেবার জন্যই তৈরী হচ্ছে।

এটা হল ভার্‌সাই সন্ধির প্রতিফল। প্রকৃতপক্ষে পীরট (Pirot) পূর্বে বুলগেরিয়ার অন্তর্গত ছিল এবং স্থানীয় অধিবাসীরাও জাতে বুলগার। ইউরোপ দেশটার অনুপাতে রাষ্ট্রের সংখ্যা বেশি। কিন্তু এতগুলি রাষ্ট্র গড়ার মূলে রয়েছে পশ্চিম ইউরোপের কূটনৈতিক ধুরন্ধরগণ। এই তথ্যটা আবার সকলে বোঝেনা। বলকানের পাদরীরা টাকা খেয়ে বলে "এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা, রাষ্ট্রচালকগণ বলে এটা হল জাতীয়তাবাদ, আর দূর থেকে পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রনীতিবিদগণ বলে এটা তাদেরই ইচ্ছা। কিন্তু যারা প্রগতিশীল অর্থাৎ কমিউনিস্ট তারাই সকল কথা বুঝতে সক্ষম হয়েছিল এবং যে প্রকারে বলকান থেকে বৃটিশ, ফ্রেঞ্চ্ সাম্রাজ্যবাদীদের চালবাজী আর না চলে তারই জন্যে আজীবন কারাবরণ, মৃত্যুদণ্ড, নানারূপ অমানুষিক অত্যাচার নীরবে সবই সহ্য করছিল।

কৃষকদের মাল ওজন এবং তার ট্যাক্স্ নেওয়া দেখে পকেট থেকে দুটি ইংলিশ ষ্টারলিংএর নোট বের করে দিয়ে বল্‌লাম "এই নাও ত্রিপ টিক"। দুটি পাউণ্ড দেখে কাস্টম অফিসারগণ তৎক্ষণাৎ আমাকে একখানা ত্রিপ টিকের রসিদ দিয়ে বললেন "কিপ্ টু দি রাইট" অর্থাৎ সাইকেল চালাবার সময় ডানদিকে সাইকেল চালাবেন।

অনেক সাম্রাজ্যবাদী নরপিশাচ বলে "ভারতের লোকের কথার ঠিক নেই, ভারতের লোক মিথ্যা বলে", এবং আরও নানারূপ বদনাম দেয় কিন্তু এই নরপিশাচগুলি জানেনা এটা ভারতবাসীর দোষ নয়, এটা হল সাম্রাজ্যবাদের দোষ। আমার সঙ্গে বিদেশে কয়েকজন দেশীয় রাজা, এবং ভারতীয় উচ্চ কর্মচারীর দেখা হয়, তারাও ঐ ইউরোপীয় নরপিশাচদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলেছিল "এটা আমাদের জাতেরই দোষ" কিন্তু এই হৃদয়হীন নরপিশাচগণ জান্‌তনা এটা জাতের দোষ নয় এটা হল সাম্রাজ্যবাদের দোষ। ত্রিপটিকও সাম্রাজ্যবাদীদেরই একটি চাল।

জার্মানী, ডেনমার্ক, হংগেরী এবং ইংলণ্ডে বাইসাইকেল ইন্‌ডাষ্ট্রি বেশ ভাল থাকায় ঐ দেশগুলিতে বাইসাইকেল, পঁচিশ টাকায়ও পাওয়া যেত, অথচ বলকানে বাইসাইকেল ইন্‌ডাসট্রি না থাকায় বেশি দামে বাইসাইকেল বিক্রী হ'ত। বলকানের ধনীরা দেখলে, যদি

তারা বাইসাইকেলের উপর প্রচুর ট্যাক্স বসায় তবে বলকানের লোক বিনা আপত্তিতে সেই ট্যাক্স মেনে নেবে। তা ভেবেই বিদেশ থেকে আনা প্রত্যেকখানা সাইকেলের উপর সাতাশ টাকা করে ট্যাক্স বসান হয়েছিল। সেই সংবাদটি, যে সকল দেশে সাইকেল তৈরী হ'ত তারা নিশ্চয়ই জানত, কিন্তু ট্যাক্স ফাঁকি দেবার জন্য সেই দেশগুলি বলকানের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে ছোট ছোট দোকান বসাতে লাগল। কোথা থেকে কতগুলি লোক ভূপর্যটক সেজে ঐ দোকান থেকে একখানা করে বাইসাইকেল নিয়ে বলকানে প্রবেশ করে বাইসাইকেলখানা কারো কাছে চোরাই বাজার দরে বিক্রী করে চলে যেতে লাগল। ভূপর্যটক চোরাই বাজার থেকে রেহাই পাবার জন্য, বিদেশাগত মোটরকার, ট্রাক্ মোটর বাইক এবং এমন কি বাইসাইকেলের উপরও নতুন করে আর একটি ট্যাক্স বসান হ'ল। এই করে বলকানে চোরা বাজার বন্ধ হ'ল। নতুন ট্যাক্সের নাম হ'ল 'ট্রিপ টিকেট', ইউরোপের লোক তাকেই "ত্রিপ টিক" বলত আর বৃটিশরা বলত 'ট্রিপ টিকেট'। ইংলিশ, স্কচ এবং ওয়েলস্‌রা 'ত' অক্ষর উচ্চারণ করতে পারেনা, তারা 'ত' কে 'ট' বলেই উচ্চারণ করে।

সীমান্ত ঘাটি পার হয়ে পীরট গ্রামের সবচেয়ে বড় হোটেলে গিয়ে একখানা রুম ভাড়া নিলাম। সাহস অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল এবং ইউরোপীয়ান ভীতি একদম চলে গিয়েছিল। পীরটের বড় হোটেলের মালিক ইংলিশ জানতেন সেজন্য আমার বেশ সুবিধা হয়েছিল। তাঁরই দয়ায় অনেকে আমার ভিক্ষাপত্র কিনেছিল এবং কয়েকটি পাউণ্ডও জমাতে সক্ষম হয়েছিলাম।

টাকা পাওয়া আর পেট ভরে খেয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকতাম না। দেখতাম এবং শুনতামও। পীরট হ'ল গ্রাম। গ্রামের বাসিন্দা সকলেই বুলগার। ঐ ছোট্ট গ্রামকে যারা শাসন করছিল তারা হল সারভিয়ান্‌। সারভিয়ান্‌রা রাজবংশীয়, সেজন্যই তাদের বেশ অহঙ্কার ছিল হোটেলের মালিক হতে ক্ষুদে চাপরাশী পর্যন্ত সকলেই সারভিয়ান্‌। তাদের হাত পা নেড়ে চলা এবং কথায় কথায় বুলগারদের শ্লেষ করে কথা বলা অনবরত চলত। আমি শুধু সার্ভিয়ানদের সঙ্গে কথা বলেই সুখী থাকতাম না; বুলগারদের সঙ্গে-ও কথা বলতাম। উভয় জাতের মধ্যেই একে অন্যকে ঘৃণা করা যেন একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার ইচ্ছা হ'ল পীরটে কয়েকদিন থেকে স্থানীয় হাবভাব এবং যুগস্লাভিয়ার ভেতরে রাষ্ট্রনীতি নিয়ে কিছু আলোচনা করি, সেজন্য আরও দুদিনের রুমের ভাড়া দিয়ে উপরেই চুপ করে বসে থাকতাম আর দেখতাম মানুষের মুখ।

আমি যখন চুপ করে বসে খিড়কি দরজা দিয়ে মানুষের আসা যাওয়া দেখছিলাম তখন কয়েক জন লোকের পদশব্দ শুনতে পেলাম। আমি ভাবছিলাম হয়ত নবাগত লোকগুলি পাশের রুমে কারো সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কিন্তু তা নয়, তারা আমারই রুমে করাঘাত করল। ইউরোপের রুমে কড়া থাকেনা সেজন্য কেউ কড়া নাড়তে পারেনা। আস্তে আঘাতই করে। যদি ইচ্ছা না হয় তবে দরজা না খুলেও রুমে বসে থাকা যায়। বাইরে থেকে কেউ টের পায়না, লোক ঘরে আছে কি না। আমি চুপ করে বসে রইলাম না, অনিচ্ছায় দরজা খুলে দিলাম। দরজা খুলে দেবা মাত্র কয়েক জন ভদ্রলোক আমার কাছে ঘরে

প্রবেশ করার জন্য, ফ্রেঞ্চ ভাষায় অধিকার চাইলেন। তাদের বললাম্ আমি ফ্রেঞ্চ বলতে পারিনা। তখন অন্য একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন তিনি ইংলিশ জানেন, আমি আর আপত্তি করলাম না। ভদ্র লোকদের বসতে বললাম।

যে ভদ্রলোক ইংলিশে কথা বলেছিলেন, তিনি বেশ মন খুলেই কথা বলতে লাগলেন। আমিও বিনা দ্বিধায় তাঁর সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে লাগলাম, যদিও ভাল করেই জানতাম সকল সময় মন খুলে কথা বলা উচিত নয়। কতক্ষণ পর ভদ্রলোকরা আমার কাছে তাদের পরিচয় দিলেন। বল্লেন তারা সকলেই সংবাদ-পত্রের রিপোর্টার। । আমি তাদের বল্লাম "মশাইরা ভুল করেছেন, যাকে আপনারা চান আমি সেই লোক নই, আমি একজন মামুলী ভারতীয় পর্যটক, আমার সম্বন্ধে কোনও রিপোর্ট আপনারা কোনও সংবাদ-পত্রে ছাপাতে পারবেন না।"

"বেশ মশাই, আমরা যদি আপনার সংবাদই সংবাদ পত্রে ছাপবার ব্যবস্থা করি তবে ঠেকাবে কে?" আমি ভদ্রলোকের কথা শুনে শুধু হাসলাম। কালো মুখের হাসি তাঁদের কারো ভাল লাগছিল না। অবশেষে বল্লাম, "আমার সম্বন্ধে যদি কোনও সংবাদ আপনাদের ছাপতে হয় তবে আপনাদের ঘরে যারা বসে আছেন তাদের আদেশ নিতে হবে। এর মানে কি জানেন?" ভদ্রলোক বল্লেন "কিছুই বুঝতে পারছিনা"। আমি বললাম "এর মানে হ'ল ভারতবাসীর সম্বন্ধে যদি কোন সংবাদ আপনাদের ছাপাতে হয় তবে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কাছ থেকে আদেশ নিতে হবে। ভাববেন না, আপনারা মস্তবড় কেউ-কেটা। আমি যখন বেলগ্রেদ যাব তখন বৃটিশ কন্সালের সঙ্গে দেখা করে বলব, আমি একজন মামুলী পর্যটক। আমার কথায় যদি কন্সাল আস্থা স্থাপন করেন তবে তিনিই আমার সংবাদ আপনাদের নিউজ্ এজেন্সীতে পাঠিয়ে দেবেন।"

"আপনি কি বলতে চান, আপনার আসার সংবাদ আমরা স্বাধীন ভাবে ছাপতে পারব না?"

"একবার চেষ্টা করে দেখুন, আপনাদের দ্বারা তা সম্ভব কি না?"

আমাব কথা শুনে রিপোর্টারদের মুখ সাদা হয়ে গেল। আমি ভাবছিলাম, তারা আমার কিছু অনিষ্ট করতে চাইবে, কিন্তু তা করেনি। আমারও ভয়ের কারণ ছিল না। "দেশ হতে বের হয়ে যাও" বলে যদি কোন আদেশ হ'ত তবে আমি রেলগাড়ীতে চেপে ত্রিয়েস্তি পৌছতে পারতাম। তারপরই ছিল ইতালী। ইতালী প্রবেশ করতে বৃটিশ প্রজার পক্ষে ভিসার দরকার হ'ত না। ইতালী থেকে আমি বিনা ক্লেশে ইংলণ্ডে পৌছতে পারতাম।

এবার ভদ্রলোকদের চৈতন্য হ'ল, এবং অন্যান্য কথা বলতে লাগলেন। কতকগুলি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীর চাকর বাকরদের অভ্যাসই হ'ল ভারতের বদনাম গেয়ে বেড়ানো! সামনে যদি কোন ভারতবাসী পায় তবে তো সোনায় সোহাগা হয়। কিন্তু এই ভদ্রলোকেরা ভারতের কথা না বলে, সোভিয়েট রুশের কথা আরম্ভ করলেন। সোভিয়েট রুশ তাদের চক্ষে মহাপাপী।

ঈশ্বরে সোভিয়েট রুশের লোকের বিশ্বাস নেই। ধনী দরিদ্র বলে কিছুই নেই। জ্ঞানী অথবা অজ্ঞান বলে মজুরীর কোন বিচার নাই। সর্বশেষ কথা হল, নারী জাতটাই হল সর্বসাধারণের সম্পত্তি। নারী জাতের অপমান করাই হ'ল সোভিয়েট রুশের একমাত্র কর্তব্য। এদের বাচালতা শুনে আমি আর ঠিক থাকতে পারলাম না। তাদের লক্ষ্য করে বললাম্ "সোভিয়েট রুশের নারীদের সম্বন্ধে আপনারা অনেক কথাই বলেছেন, কিন্তু পীরটের নারীদের সংবাদ আপনারা রাখেন কি? যদি এ সম্বন্ধে আপনাদের কোন জ্ঞান না থাকে তবে এখনই আমি কয়েকটি নারীকে কয়েক ঘণ্টার জন্য কিনে এনে আপনাদের সামনে হাজির করতে পারি।" আমার কথা শুনে সাংবাদিকগণ আমাকে অপমান করেন নি, শুধু সকলে সমস্বরে আমাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন লোকটা "ভলসী" অর্থাৎ বলসেভিক।

একদিন আমাদের দেশে পাঁচ জনে মিলে একজনকে আক্রমণ করলে তাদের কাপুরুষ বলা হ'ত। অভিমন্যুকে সপ্তরথী মিলে হত্যা করেছিল বলে মহাভারতে সপ্তরথীর বদনাম করা হয়েছে। আজকাল আমাদের দেশে সে শিক্ষা লোপ পেয়েছে। কিন্তু ইউরোপের লোকদের মধ্যে আমাদের দেশের পুরাতন সভ্যতা এখনও দেখতে পাওয়া যায়। পাঁচ ছয়জন সাংবাদিক আমাকে এই কটুবাক্য বলার জন্য আক্রমণ করেনি। তারা নীরবেই রুম পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। কিন্তু লাহোরের বার লাইব্রেরীর মত স্থানে সত্য কথা বলার জন্য একবার আমাকে অপমানিত হতে হয়। সত্যকথা বলাও যে আমাদের দেশে অনেক ক্ষেত্রে নিরাপদ নয়, তার সংবাদ কজন রাখে?

বুলগেরিয়াতে প্রবেশ করার পর মাসুডেনিয়ান্ বলে একশ্রেণীর লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। জিপসীরা যেমন নিজের দোষে অপরের দ্বারা অপমানিত এবং ঘৃণিত হ'ত, মাসুডেনিয়ান্দের সেরূপ ভাবে অপমান অথবা ঘৃণা করা হ'ত না। পূর্বকালে এদের নাকি বেশ প্রতিপত্তি ছিল। এরা নাকি গ্রীকদের চেয়েও পুরাতন জাত এবং আলেকজেণ্ডার দি-গ্রেট নাকি তাদের জাতের লোকই ছিলেন। যদিও কয়েকটি পুরাতন কথা এদেব সম্বন্ধে বলে ফেল্‌লাম, কিন্তু আমি পুরাতন নিয়ে খাটতে রাজি নই। এদের সম্বন্ধে যা বলেছি তা সত্য নাও হতে পারে তবে এরা সকলের দ্বারা ঘৃণিত হয় একথাটা ঠিক। অনেকে মাসুদ-(মাসুডেনিয়ান) দের ইউরোপীয়ান বলে স্বীকারও করে না। বর্তমানের গ্রীকরাও যেন এদের এড়িয়ে চলতেই চেষ্টা করে। কিন্তু এরা সর্বস্ব হারিয়েও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকেনি। সর্বপ্রথম এরা এদের একটা রিপাবলিক গড়ে উঠাতে চায়, কিন্তু এদের জাতের লোক সার্ভিয়া, মন্তেনিগ্রো, বুলগেরিয়া এবং গ্রীস দেশের এলাকায়-ও বাস করে। এতগুলি রাষ্ট্রের সঙ্গে একই সঙ্গে লড়াই করা কষ্টকর কাজ, সেজন্য এরা কমিউনিজম্ গ্রহণ করে যাতে করে সমুদয় বলকানে কমিউনিজম্ প্রচলিত হয় তারই জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। মাইনরিটির যদি বেচে থাকতে হয় মানুষের মত হয়ে, তবে এই গতি ছাড়া তাদের আর অন্যগতি নেই।

বুলগেরিয়ায় তারা কমিউনিস্ট প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। বলকানের বৃহৎ ভূমিখণ্ডে তারা স্লাভদের বিভীষিকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

পীরটে গিয়েই দেখলাম এক শ্রেণীর লোক কালো ফিতা বাঁ হাতে বেঁধে চলাফেরা করছে। সংবাদ নিয়ে জানলাম স্লাভ রাজা এলেক্সজেণ্ডারকে মারসেলিসে কে হত্যা করেছে। তাই শোক প্রকাশ করার জন্যই রাজ-কর্মচারীরা কালোফিতা বাঁ হাতে বেঁধে রেখেছে। দুঃখের বিষয় রাজ-হত্যার পেছনে অনেক কারণও ছিল। সেই কারণগুলির কোন প্রতিকার কিছুই করা হয়নি। ভারতের পাপেট রাজারা যেমন করে বৃটিশ রেসিডেণ্টের আজ্ঞা বহন ক'রে চুটিয়ে রাজত্ব করে, এখানেও তারই ব্যবস্থা দেখলাম। এখানেও ফ্রেঞ্চ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর আওতায় থেকে যুগস্লাভিয়ার পাপেট রিজেণ্ট পরোক্ষ ভাবে চুটিয়ে রাজত্ব করছে। পাপেট রিজেণ্ট যেন রাজহত্যার প্রতিশোধ নেবার বন্দোবস্ত করেই আসরে নেমেছে। কিন্তু কি কারণে রাজহত্যা হয় তার কোন প্রতিকার করবার দরকার অনুভব করছে না।

পীরট থেকে নীশ্ মাত্র সাতষট্টি কিলমিটার পথ। এই পথ একদিনেই সাইকেলে যাওয়া যায়, কিন্তু তা না করে মাসুডোনিয়ানদের আচার ব্যবহার দেখবার জন্য তাদেরই একটি গ্রামে একদিন থেকে যাই। গ্রাম বহু পুরাতন। ছোট-ছোট পথের দুদিকে ফুটপাথ। প্রত্যেক ঘরের পেছনে পাইপ লাইন রয়েছে। তাই দিয়ে গ্রামের পাইখানার আবর্জনা চলে গিয়ে একটা 'ঢালুস্থানে পড়ছে। মেথর বলতে কেউ নাই। গ্রামের অধিবাসী জিপসীরাও ছিল। জিপসী এবং মাসুডেনিয়ান্দের মধ্যে প্রভেদ কিছুই দেখতে পেলাম না। মাসুদদের ভেতর মুসলমানও ছিল, কিন্তু পোশাক দেখে বুঝতে পারিনি কে মুসলমান আর কে খৃষ্টান। খৃষ্টান হ'ক আর মুসলমান হ'ক সকলেই রাষ্ট্রনীতি নিয়ে বেশ চর্চা করে, এমন কি গোপনে রাজহত্যাকারীর প্রশংসা-ও করে। কি করে তা আমি বুঝেছিলাম তারই কথা বলছি।

যে হোটেলে ছিলাম সেই হোটেলের মালিক ছিল একজন মুসলমান মাসুদ। সে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে খাইয়েছিল। পরিবারে পরদা প্রথা মোটেই ছিলনা। কথা প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন সে হাতে কালো ফিতা ব্যবহার করছে না। সে আমাকে অতি সন্তর্পণে বললে "এন্‌তি মনারকিস্ট" অর্থাৎ রাজা সে মোটেই পছন্দ করেনা। ভেবেছিলাম হয়ত সুলতান পছন্দ করে, সেজন্য জিজ্ঞাসা করলাম সে প্রোসুলতানিষ্ট কি না? সে জিভ কেটে গলায় বাঁধা একটি ক্রসের মত জিনিস দেখালে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় তার গলায় যেন একটি ক্রস্ ঝুলছে, কিন্তু সেই জিনিসটা হাতে নিয়ে দেখলাম একখানা সিল্‌ভার প্লেটে কাস্তে হাতুড়ি সুন্দর ভাবে অঙ্কিত রয়েছে। বুঝলাম লোকটি কমিউনিস্ট। এদিকের মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা প্রায়ই কমিউনিস্ট কিন্তু কেন যে তারা কমিউনিস্ট তা তাদের নিজেব মুখ থেকে শুনতে পাইনি। পরে নীশে গিয়ে একজন তুরুকের কাছ থেকে শুনেছিলাম, মাইনরিটি-মেজরিটি এবং ছোট ছোট সীমান্ত ডিঙানো তাদের মোটেই ভাল লাগেনা। তারা চায় সকলে সমান ভাবে বসবাস করতে। সীমান্ত পরিবর্তনের সঙ্গে বসত-ভিটির পরিবর্তন মোটেই তারা পছন্দ করে না। এটা হল প্রথম কারণ। দ্বিতীয় কারণটি অন্য এবং দ্বিতীয় কারণটিই সকলে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছে।

বলকানের ইতিহাস এত বৈচিত্র্যময় যে অন্য কোন দেশের ইতিহাসে তত বৈচিত্র্য নাই। ছোট ছোট প্রবল পরাক্রান্ত জাত; নিয়ম কানুন মেনে যারা চলে এবং শান্তভাবে বাস করে তাদের প্রতি যুগে যুগে অত্যাচার করেছে। সেই আক্রমণকারীদের কেউ কেউ তাদের পুরান প্রাধান্য এখনও সমাজে বজায় রাখতে পেরেছে। ক্রীট এবং মন্তেনিগ্রোদের মধ্যে কতকগুলি অহঙ্কারী এবং স্লাভদের রাজা এবং তাদের বংশধরগণ এখনও বড়লোক বলে সকলের কাছে সম্মান আদায় করতে কসুর করেনা। এসব লোকের হাত হতে রেহাই পেতে হলে কমিউনিজম ছাড়া আর উপায় নাই। তারপর মাসোডেনিয়ান মন্তেনিগ্রো, নাই সেডের মুসলমান, এরা অন্যান্যদের দ্বারা সকল রকমে ঘৃণিত হয়। ইহুদীরা ত মানুষ বলেই সর্বত্র পরিচয় দিতে পারেনা। এরা হল মাইনরিটি। এরা কোন-দিনই মেজরিটি খৃষ্টানদের সমকক্ষ হতে পারবেনা; একথাটা এরা বেশ বুঝতে পেরেছে। আরও বুঝেছে, যদি তাদের বলকানে থাকতে হয় তবে কোনও বিশেষ এলাকা তাদের জন্য কেউ নির্ধারণ করে দেবেনা। এরূপ ক্ষেত্রে মাইনরিটিদের বেঁচে থাকবার একমাত্র উপায় হ'ল কমিউনিজম গ্রহণ করা। প্যান-ইস্‌লাম, প্যান-আরব, প্যান-স্লাভ, প্যান-খৃষ্টান, প্যান-ইহুদী, এসব শব্দ লণ্ডন এবং প্যারী নগরদ্বয়ের ধূর্ত পুঁজিবাদীদের দ্বারা তৈরী হয় এবং সামান্য বেতনভুক প্রপাগাণ্ডিস্ট তা দেশ-বিদেশে প্রচার করে। বল্‌কানের লোক এসব বাজে কথায় কর্ণপাত করেনা। তারা এত নীচ স্তরের লোকও নয়। এসব নানা কারণে বলকানের লোকের মধ্যে কমিউনিজম প্রবলভাবে আপনি এসে পড়ছিল। বৃটিশ, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইটালিয়ান পুঁজিবাদীরা তা দেখে সেই ভাবটি দাবিয়ে দেবার জন্য নানারকম অস্ত্র প্রয়োগ করছিল। কিন্তু তারা জানত কমিউনিজম কলেরার জার্ম থেকেও মারাত্মক, একবার যেখানে সেই জার্ম গিয়ে পড়ে সেখানে পুঁজিবাদীদের স্ববংশে নির্বংশ করেই। তা বলে কি পুঁজিবাদীরা অসহায় হয়ে বসে রয়েছিল? নিশ্চয়ই না। বলকানের পুঁজিবাদীরা বিদেশীদের সাহায্যে কমিউনিজমের বীজ যাতে ধ্বংস হয় তারই ব্যবস্থা করছিল।

ছোট্ট গ্রাম থেকে বের হয়ে নীশের পথে কয়েক কিলমিটার চলার পরই কতকগুলি রোড-কুলির সঙ্গে দেখা হ'ল। রোড কুলিরা তখন মন দিয়ে কাজ করছিল, কিন্তু আমাকে দেখা মাত্রই তারা উঠে দাঁড়াল। রোড-কুলিরা উঠে দাঁড়িয়েছে দেখে আমিও সাইকেল থামালাম এবং স্লাভভাষায় লিখিত আমার পরিচয় পত্র সকলকেই একখানা করে দিলাম। আমার পরিচয়পত্র রোড-কুলিরা প্রত্যেকে মন দিয়ে পড়েছিল। প্রত্যেকটি কুলিকে স্লাভভাষা পড়তে দেখে নিজের দেশের ছাপড়া জেলার নৃণীয়া শ্রেণীর কুলিদের নিরক্ষরতার কথা মনে পড়ল। আমার পরিচয়পত্র পেয়ে কুলিরা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল এবং অনেকেই ইন্‌টারন্যাশনাল পলেটিক্স সম্বন্ধে আমাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। যতটুক সম্ভব তাদের কথার জবাব দিয়ে আমি বিদায় নিতে যাব, এমন সময় প্রত্যেকেই এক একটি করে দিনার আমার হাতে দিয়ে আনন্দ-ধ্বনি করতে লাগল। তাদের আনন্দ-প্রকাশের মধ্যেই আমি বিদায় নিয়েছিলাম আর ভাবছিলাম আমাদের দেশের রোড-কুলির কথা।

এরপর পথ বেশ প্রশস্ত হয়ে চলছে। পথের দুপাশে বড় বড় মাঠ। মাঠে তখন আঙুরের গাছ বড় হয়ে উঠছিল। কৃষক মজুরের দল আঙুর গাছের আশপাশে কাজ করছিল। আঙুর বাগানের দৃশ্য বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। বাগানের সৌন্দর্য আমাকে বিশেষ ভাবে টানত না, আমার মন টানত মানুষের কাজের শৃঙ্খলা দেখে এবং কষ্টকর কাজের ভেতরও যুবক যুবতী একে অন্যের সঙ্গে হাসি-খুশিতে মেতে রয়েছে দেখে।

একটি যুবতী মন দিয়ে আঙুর গাছের গোড়া খুদে দিচ্ছিল। সেরূপ কাজে আরও অনেক মজুর নিযুক্ত ছিল। অন্য লাইনের পেছন দিক থেকে এসে একটি যুবক কর্মরত যুবতীর পেছনে দাঁড়িয়ে একটি মাটির ঢেলা তার মাথার উপর রেখে চলে যায়। যুবতী ভান করেছিল, কেউ যেন তার মাথার ওপর কিছুই দেয়নি। কতক্ষণ পর যুবতী কি করছে দেখবার জন্য যখন যুবক ফিরে এল, তখন হঠাৎ যুবতী দাঁড়িয়ে যুবকের মুখে কতকগুলি শুকনো মাটি আবিরের মত মাখিয়ে দেয়। এতে যুবক একটুও রাগ না করে গালে-দুটো মুছতে মুছতে কাজের জায়গায় চলে যায়। এর পর আর কি হয় তা দেখার জন্য সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়ালাম। যুবক কিন্তু আর ফিরে আসেনি।

ইউরোপের মজুর-জীবন নানা রকমের। চাষের কাজ করা-ও তারই একটি অঙ্গ। আমার মনে হয় অনেকেই চাষের কাজ করে মনে আনন্দ, শরীরে বল পায়। সেজন্যই ইউরোপের লোক গ্রামে বাস করে, খামারে গিয়ে কাজ করতে ভালবাসে।

বিকাল তিনটার সময় নীশ্ শহরে পৌঁছি। নীশ্ বহু পুরাতন শহর। শহরের বাড়িঘরের অবস্থা দেখলেই তা বোঝা যায়। প্রথম মহাযুদ্ধের ধাক্কা এ শহরে বেশ লেগেছিল। জার্মানদের কামানের গোলায় যে সকল গর্ত হয়েছিল, নীশের লোক তখনও তা বুজিয়ে দিতে পারেনি। বাড়িঘরও অনেক নষ্ট হয়েছিল, তার কতক মেরামত করা হয়েছিল এবং আমার পৌঁছার পরও দেখতে পেয়েছিলাম এ শহরে গৃহশিল্পীদের অনেক কাজ ছিল, কিন্তু অর্থের অভাবে সকল গৃহশিল্পীকেই ঘর তৈরীর কাজে নিযুক্ত করা সম্ভবপর ছিলনা, সেজন্য তারা অন্যান্য কাজ করতেও বাধ্য হ'ত।

নীশ্ শহরের পেছনের দিক দিয়ে আমি প্রবেশ করেছিলাম। যদিও বেলা তখন তিনটা, তবুও মনে হচ্ছিল এই এগার বারটা বেজেছে মাত্র। শহরের কাছেই মাঠ। মাঠের ঘাস, যব এবং বৃক্ষরাজিতে যেন একটা পূর্ণ যৌবন এসে দেখা দিয়েছিল! নানা রূপ মক্ষিকা সর্বত্র বেড়িয়ে মধু আহরণ করছিল। তখনও বাজার পুরা দমেই চলছিল। নানা রকমের পোশাকে আবৃত হয়ে নরনারী বেচাকেনা করছিল। দূর থেকেই দেখতে পেলাম ল্যাটিন অক্ষরে এক জায়গা লেখা রয়েছে Hotel (হোটেল)। বাজার পেরিয়ে গিয়ে হোটেলের সামনে দাঁড়ালাম। কেউ আমার কথা বুঝলনা। 'অবশেষে সেই হোটেল মালিক আমাকে ডাকলেন। তিনি এস্পেরেন্ত জানতেন। এসপেরেন্ত ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—

হোটেল চাই কি?

হাঁ মশাই।

আপনি কি পর্যটক?

হাঁ মশাই!

টাকা আছে?

আছে।

এখানে দৈনিক ত্রিশ দিনার দিতে হবে; তা দিতে পারবেন?

নিশ্চয়ই, এই নিন।

হোটেল মালিক দিনারগুলি গুণে নিয়ে বললেন—

আমি ভাবছিলাম আপনিও বোধ হয় জার্মানদের মতই পর্যটক হবেন।

সে কেমন মশাই?

সে কথা জানেন না! যখন জার্মানীতে যাবেন তখন দেখবেন। এখন রুমখানা গিয়ে দেখুন। এই বলেই একটি স্ত্রীলোককে তিনি চীৎকার করে ডাকলেন। স্ত্রীলোকটি বেরিয়ে আসতেই হোটেল মালিক আবার চীৎকার করে বললেন, এই ভদ্রলোককে তোমার পাশের রুমটি দেখিয়ে দাও। হোটেল মালিক স্লাভ ভাষায় যা বলছিলেন তাই তিনি আমাকে এস্‌পেরেন্ত ভাষায় বুঝিয়ে বল্‌লেন। আমি বিনাবাক্য ব্যয়ে স্ত্রীলোকটির পেছনে চললাম। স্ত্রীলোকটির পায়ের জুতা দেখেই মনে হল স্ত্রীলোকটি দরিদ্র। শরীরের অবস্থা আরও খারাপ। খাদ্যের অভাব নিশ্চয়ই আছে। স্ত্রীলোকটি একটি রুমের দরজা খুলে দিয়ে আঙুল দেখিয়ে বলল, এই বিছানা। আমি সাইকেল সমেত রুমে প্রবেশ করলাম। রুমের বিছানা এবং অন্যান্য সরঞ্জাম দেখে মনে হ'ল এরূপ রুমের ভাড়া অন্তত পক্ষে আমাদের দেশের পনর টাকা হওয়া উচিত। দাঁড়িয়ে যখন আমি রুমটি দেখছিলাম তখন স্ত্রীলোকটি একটি বেসিনে করে গরম জল নিয়ে এসে একটি লোহার স্ট্যাণ্ডে তা রেখে দিয়ে দরজা ভেজিয়ে চলে গেল। আমি দরজায় খিল দিয়ে কাপড় ছেড়ে শরীরটাকে বেশ করে মুছে নিয়ে পোশাক প'রে রুম থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু পথেই দেখা হল স্ত্রীলোকটির সঙ্গে। সে আমাকে তার রুমে বসিয়ে খাবার খেতে দিল। স্ত্রীলোকটির দেওয়া খাদ্য বেশ ভাল ছিল। খাবার খেয়ে বিলের জন্য আর অপেক্ষা করতে হ'ল না; একখানা ছোট্ট কাগজে ল্যাটিন্ অক্ষরে লেখা কুড়ি দিনারের এক খানা বিল্ পেলাম। রমণীকে খাবারের দাম দিয়ে রুমে এসে সজ্জিত বিছানায় শুয়ে পড়লাম। তখন আমার আর কিছুই ভাববার সময় ছিলনা। ঘুমে চোখ দুটো আপনি বুজে আসছিল।

শুয়েছিলাম যুগস্লাভিয়ার নীশ্ নামক শহরে একটি হোটেলে, আর স্বপ্নে দেখছিলাম ব্রহ্ম দেশের পেগু শহর। পেগুতে থাকতাম একটি মেসে। সেই মেসে এসে খেতেন এক জন পণ্ডিতমশাই। তিনি আমাকে দেখেই বলেছিলেন একটি শ্লোক। সেই শ্লোকের মানেই হল, ভবঘুরেদের শান্তি হয় তখনই, যখন সে মরে। সেই পণ্ডিতের কথা যেন আমার কানে বাজ্‌ছিল, আর সেই পণ্ডিত যেন আরও চীৎকার করে বলছিল "হে ভবঘুরে, না মরলে শান্তি পাবেনা।" ঘুম বেশি হ'ল না, হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠেই দেখি আমি পেগুতে নেই, আমার পাশে শৈলেন নাই, আমি তক্তাপোষের বদলে নরম

বিছানায় শুয়ে। আমার পাশে কেউ নাই। আমার কাছেই আমার সাইকেলখানা দাঁড় করানো। সাইকেল যেন হাসছে! আমি আর রুমে বসে থাকলাম না। বেরিয়ে এসে দেখি তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। চারিদিকে বিজলী বাতি জ্বলে উঠেছে। বিজলী বাতির আলো আমার চোখে ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দিয়েছিল। আমি আবার রুমে আসতেই স্ত্রীলোকটি আর এক বেসিন জল এনে ইংরেজীতে বল্‌ল সে জাতে জিপ্‌সী। পূর্বেই বলেছি জিপসীরা কারো সঙ্গে প্রেম করেনা। জিপসীর প্রেম আর সর্পদংশন একই কথা। রমণীর পরিচয় পেয়ে বুঝলাম, আমাকে খাইয়ে এবং সেবা করে কিছু বক্‌শিসের আশা রাখে। তখন স্ত্রীলোকটিকে কাজ করতে আদেশ দিতে, আমার মনে কিছুই বাধল না। তাকে ইঙ্গিতে রান্না করতে বললাম। কিন্তু ভাত কি রকম চিজ তা তার জানা ছিলনা। ভাবলাম, যদি চাল পাই তবে কিনে এনে দেব। স্ত্রীলোকটি চাল দেখলেই বুঝতে পারবে ভাত কি করে রান্না করতে হবে।

ভাতের চিন্তা আমাকে পেয়ে বসেছিল। এদিকে ভাত খেতে হলে অর্থের দরকার, সেকথা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। আবার বের হবার আগে কয়েক শ' ভিক্ষাপত্র এবং অটোগ্রাফ-বই-খানা সঙ্গে করে নিতে ভুলিনি। বাজারের পাশ দিয়েই একটা বড় পথ বেরিয়ে রেল-স্টেশনের দিকে চলে গিয়েছে। ভাবলাম ঐ পথটাই বেড়িয়ে আসা যাক, কিন্তু পথের কাদা দেখে আর মনে হ'ল না সে দিকে পা বাড়াই। ফুটপাথগুলি কিন্তু বড়ই সুন্দর ছিল। তবুও ইচ্ছা হলনা সেদিকে যেতে। পাশের কাফেতে কয়েক জন বিদেশী লোক বসেছিল। তাদেরও আমি পরিচয়-পত্র দেব ঠিক করে যেই সে দিকে অগ্রসর হচ্ছিলাম, ঠিক সেই সময় পেছন দিক থেকে একজন এসে আমাকে বল্‌ল "মশাই এদিকে আসুন"। লোকটির "স্যার" কথাটা আমার মোটেই ভাল লাগেনি। স্যার কথার নানারূপ অর্থ আছে। আমেরিকানরা যখন কেউ বার বার স্যার বলতে থাকে তখন মনে করতে হবে অতি সত্বরই মারামারি আরম্ভ হবে। সেই স্যার শব্দের তখন মানে হয় "আজ্ঞে হাঁ"। ইংলণ্ডে স্যার কথার ব্যবহার হয় বেশিই। কিন্তু সেই "স্যার" শব্দ শ্রেণীভেদ স্মরণ করিয়ে দেয় অনবরত, আর আমাকে যে "স্যার" বলা হয়েছিল সেই "স্যার" হল "সাভেরই" অনুরূপ।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোকটার সঙ্গে চল্লাম। সে আমাকে একটা বড় কাফেতে নিয়ে গেল। কাফেতে তখন অনেক লোক। সিগারেটের ধোঁয়ায় ঘরটা প্রায় অন্ধকার। সকলেই নানারকম আলাপ-আলোচনায় ব্যস্ত। আমার মত নবাগতকে কেউ কেউ চেয়ে দেখে আবার নিজের কথায় মন দিয়েছিল। আমার কাছে কিন্তু এরূপ অপরিষ্কার জনবহুল কাফেতে যাওয়া মোটেই ভাল লাগছিলনা। এটা ইউরোপ।

ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী স্থানগুলিতে এরূপ ঘরে এত লোক একত্রে বসে কথা বলা এবং পানাহার করা স্বাস্থ্যহানিকর বলেই মনে হয়েছিল। অনেকেরই চোখ ওয়াতকীর ভটকার নেশায় লাল হয়ে উঠেছিল। এদিকে ওয়াতকীর অপর নাম হল "কুন্যাক"। কুন্যাক মদ আমাদের দেশে ধেনো মদের মতই কাজ করে, তবে কুন্যাক বৈজ্ঞানিক প্রথা

মতে তৈরী হয়, আর ধেনো মদ শুধু ডিস্টিল্ড এলকোহল ছাড়া আর কিছুই নয়। কুম্যুক বা ওয়াতকীতে জল মেশালে চূণের জলের মত সাদা হয়। ওয়াতকী খাচ্ছিল সাদা রাশিয়ানরা। এরা জারের উপাসক এবং সোভিয়েট-রুশের বিদ্রোহী। এরা নানা ভাষায় অভিজ্ঞ এবং চতুর। আমাকে নিয়ে যে লোকটি কাফেতে প্রবেশ করেছিল, তাকে দেখতে অনেকটা মাস্থডেনিয়ান্ বলেই মনে হয়েছিল। মাস্থডেনিয়ানরা কমিউনিষ্ট মতবাদ বড়ই পছন্দ করে। কিন্তু লোকটি ভেবেছিল আমিও সাদা রুশদের মতই রাজতন্ত্রী এবং ডগ্‌মিস্ট, সেই ভেবেই সে আমাকে সর্বপ্রথম সাদা রুশের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

একটি সাদা রুশ আমাদের দেশের বেদ এবং বেদান্তের বড়ই প্রশংসা করল এবং বাইবেলের সঙ্গে এসবের বেশ মিল রয়েছে তাও বলল। আমি লোকটির কথায় কোন প্রতিবাদ না করে থ মেরে বসে থাকার জন্য, হঠাৎ সে রেগে যায় এবং আমাকে বলে—

কথা বলছেন্ না যে?

এসব হ'ল অন্য ধরনের কথা, আমি এদেশে এসেছি এদেশের লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে, এবং বর্তমানে এদের কি অবস্থা তাই জান্‌তে। পুরানো কেতাবগুলি চর্চা করে সময় কাটাতে হলে আমার নিজের দেশেই অনেক পণ্ডিত রয়েছেন। তাদের সঙ্গে আজীবন এসব কথা বলে সময় কাটাতে পারব।

এদেশে নতুন কি হচ্ছে জানতে চান নাকি?

আমার উদ্দেশ্য বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছেন বলে ধন্যবাদ।

এদেশের লোক ক্রমেই বলসেভিক হতে চলেছে, এর বেশি আপনার কিছুই জানবার মতো নেই। জেনে রাখুন বল্‌সেভিকরা ভগবানে বিশ্বাস করেনা, স্ত্রীলোকদের সর্বসাধারণের সম্পত্তি করে নিয়েছে, সকলকে পেট ভরে খেতে দেয় না, ইত্যাদি।

মিথ্যা কথা, এসব বাজে কথা আমি আর শুনবোনা মশাই, আমি এখন চল্লাম, বলেই চেয়ার থেকে উঠে পড়লাম। ম্যাসিডোনিয়ান লোকটিও আমার সঙ্গে গেল এবং অন্যত্র গিয়ে অনেকগুলি ভিক্ষাপত্র লোকদের কাছে বিতরণ করে প্রায় পঁচিশ টাকার মত ভিক্ষা জোগাড় করে আমার হাতে দিয়ে বললে "আমি আপনাকে জানতাম না, সেজন্য ক্ষমা করবেন। আচ্ছা বলুন ত মরলে পরে কি হয়?"

কি আর হবে? মানুষ মরে যায়।

তারপর?

আর কিছুই নয়।

তবে আপনি পুনর্জন্ম বিশ্বাস করেন না?

আমি অন্তত করিনা, তবে অনেকেই করে।

লোকটি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্‌ল, "আপনার কথা আমার বেশ ভাল লেগেছে, আমি আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করতে চাই, তাতে কি আপনার আপত্তি আছে?"

নিশ্চয়ই না ; যেখানে ইচ্ছা আমার সঙ্গে যেতে পারেন।

লোকটি আমাকে বল্‌ল পরদিন সকালে সে আসবে এবং নাইসেড্ পর্যন্ত যাবে। এর বেশি সে যেতে পারবেনা। সেদিন আমি অসুস্থ থাকায় আর কোথাও না গিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম, লোকটি আমাকে হোটেল পর্যন্ত রেখে বিদায় নিয়েছিল। চাল আন্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম। ভাত খাওয়া আমার হয়নি।

নবপরিচিত লোকটির নাম মহম্মদ এড্‌ওয়ার্ড জন্। নাম বলবার পরই জন বলেছিল, তার মাতামহীকে একজন তুরুক জোর করে বিয়ে করেছিল। সেই থেকেই তাদের নামের পূর্বে মহম্মদ শব্দ এসে যোগ হয়। মাতামহী একটি মাত্র মেয়ে রেখে আত্মহত্যা করেন। আত্মহত্যা করার পূর্বে, মেয়েকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য বলে যান। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময় জনের মা সার্ভদের হয়ে গুপ্তচরের কাজ করেন এবং তুরুকরা যখন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয় তখন ছেলেমেয়েকে নিয়ে নীশ পরিত্যাগ করে নাইসেডে (Nai Said) বসবাস করতে থাকেন। তার স্বামী নাকি বৃটিশের দ্বারা যুদ্ধের কয়েদী হয়ে রেঙ্গুনে গিয়েছিলেন। তিনি তখনও ফিরে আসেননি। ছেলে কিন্তু খৃষ্টান এবং ইস্‌লাম উভয় ধর্মকেই পরিত্যাগ করে নিরীশ্বরবাদী হয়েছিল এবং যাতে করে বলকান থেকে ধর্মের বুজরুকী লোপ পায় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। জন দেশ বিদেশে প্রায়ই ভ্রমণ করত। সে সোভিয়েট রুশও ভ্রমণ করেছিল। সোভিয়েট রুশ ভ্রমণ করেছে শুনে আমি সুখী হয়েছিলাম এবং সোভিয়েট রুশ সম্বন্ধে তাকে নানা প্রশ্ন করলাম। সোভিয়েট রুশ ভ্রমণকারী আর একজন পর্যটকের সঙ্গে আমার সাইগনে সাক্ষাৎ হয়। তার নাম হল মঁশিয়ে পারেয়ারী। সোভিয়েট রুশের বিশেষ প্রশংসা কররার জন্য ইন্দোচীনে তাঁকে আটক করে রাখা হয়েছিল, সে কথাটা তিনি আমাকে বলেছিলেন।

বিদেশে গেলে যদি স্থানীয় লোককে সঙ্গী পাওয়া যায় তবে অনেক কথা জানতে পারা যায়। তবে সকল সময়ই বাজে কথা এবং সত্য কথা বেছে নেবার মত বিবেক বুদ্ধি রাখা বিশেষ দরকার। জন্ আমাকে অনেক কথাই বলেছিল, কিন্তু সকল কথা আমি লিপিবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত মনে করিনি। জনের কথায় অনেক সময় জাতক্রোধের বেশ প্রমাণ পাওয়া যেত।

একদিন কথা প্রসঙ্গে বলেছিল যদিও তার পূর্বপুরুষ তুরুক তবুও তার মায়ের দুঃখ এ জীবনে ভুলতে পারবে না। তার মাকে তার পিতামহ একজন আরবের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে আরব দেশে পাঠাবার বন্দোবস্ত করছিলেন। সেই সংবাদটি তার মা পেয়ে যান এবং বেশ কষ্ট করে গ্রামেরই একজন তুরুকের সঙ্গে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হয়ে স্বামী-গৃহে লুকিয়ে থাকেন। জনের পিতামহ এতে মহা ক্রুদ্ধ হয়ে তুরুক যুবককে হত্যা করার বন্দোবস্ত করেন। তুরুক যুবক নিরুপায় হয়ে নিজে চলে আসেন এবং গোপনে এক গ্রীক মিশনারীর শরণাপন্ন হন। গ্রীক মিশনারী শুধু তাঁকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করেননি, একেবারে গ্রীক প্রজা করে ফেলেন। এতেই তার পিতা রক্ষা পান। তখনকার দিনে

তুরুক সরকার বৈদেশিক কোন প্রজার প্রতি অন্যায় করলে সেজন্য রীতিমত বেগ পেত এবং সেজন্য যদি কোন তুরুক কোন বিদেশীকে হত্যা করত তবে সেই শুধু শাস্তি পেতনা, তার পরিবারের লোকও নানা রকমে কষ্ট পেত। জন্ বলত, 'ধর্মের কঠোরতা বল্‌কান হতে লোপ পেতে বসেছে, এবার আরম্ভ হয়েছে জাতীয়তা দলনের বর্বরতা।

জনের বাড়ি হল স্কপালজে (Skoplse). জাতে সে ম্যাসিডোনিয়ান। যে সকল ম্যাসিডোনিয়ান তুরুক রাজত্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তুরুকরা তাদের সমান ভাবে সম্মান দিত না। গোলামের মতই ভাবত। এখনও তুরুকরা ম্যাসিডোনিয়ানদের সমকক্ষ ভাবেনা। ম্যাসিডোনিয়ানরা খৃষ্টান অথবা মুসলমানই হোক, ধনী তুরুকগণ তাদের নীচস্তরের লোক গণ্য করে, কমিউনিস্ট বলে উপহাস করে। এর মাঝেই হ'ল, যত নিকৃষ্ট, অপদার্থ এবং পদানত, তারাই ধনী তুরুকদের মতে কমিউনিস্ট। জন্ যখন আমার কাছে তার জাতের এবং তার দেশের ধনীদের কথা বলত তখন তার চোখ দিয়ে অনবরত জল পড়ত। সে আর এক দিন পথের পাশে দাড়িয়ে ছুটি তুরুক যুবতীদের দেখিয়ে বল্‌ল, "এদের ইচ্ছা মত বিয়ে হবে না। এদের মা বাবা তাদের স্বামী স্থির করবে। তুর্কীতে এসব কুপ্রথা আর নাই, কিন্তু যুগস্লাভিয়ার রাজা এসব অন্যায় কাজ উঠিয়ে দেবার জন্য আজ পর্যন্ত কোন আইনের প্রণয়ন করেননি, এতে নাকি যুগস্লাভিয়ার মুসলমানদের প্রতি অন্যায় করা হবে। কিন্তু এখনও যুগস্লাভিয়ায় এত ব্যভিচার চলে যা দেখে শাসক সম্প্রদায় একটুও চিন্তা করেনা, ভবিষ্যতে এদের কি দুর্দশা হবে।" মিঃ জনের ব্যক্তিগত কথা আর বাড়িয়ে লাভ নেই, কারণ তাতে ক'রে ভ্রমণ কথা বলায় বাধা পড়বে।

পরের দিন সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই দেখি কতকগুলি যুবক যুবতী হোটেলের পাশে এসে ভীড় করেছে। তারাও পর্যটক। পর্যটক এসেছে শুনেই ইচ্ছা করে তাদের সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। তাদের সংখ্যা হবে কুড়ি থেকে পঁচিশ। তারা জাতে জার্মান্। আমি তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারছিনা দেখে, হোটেলের মালিক এসে আমাকে বল্‌লেন, "এরা আপনার মত সখের পর্যটক নয়, এরা হল খাঁটি পর্যটক। শরীর গঠন করতে এবং বিদেশের খুঁটি নাটি সংবাদ নেবার জন্য বের হয়েছে, এদের সঙ্গে কথা বলে আপনি সুখী হতে পারবেন না। এরা হিটলারের ইউথ্ লিগের যুবক যুবতী।" হোটেল মালিকের কথা শুনে তাদের সঙ্গে আর কথা না বলে এদের পোশাক এবং শরীরের গঠন দেখতে লাগলাম। এরা সবাই হল কামজয়ী। যুবক এবং যুবতীরা যদিও জোড়া বেধে চলেছে, তবুও এদের দেখলে মনে হয় এরা এই যেন ঘর থেকে স্নান করে বেরিয়ে এসেছে। এদের শরীরের রক্ত যেন টগবগ্ করছে। প্রত্যেকটি নরনারীর গালে যেন গোলাপ ফুল ফুটে রয়েছে। সাধারণত বিবাহের পর ইউরোপের যুবক যুবতীর গণ্ডদেশ থেকে গোলাপী রং চলে যায়। অনেক বিবাহিত স্ত্রীলোককে সেজন্য গণ্ডদেশ গোলাপী রং লাগিয়ে ঘরের বাইরে আসতে দেখা যায়। কিন্তু এরা মুখে

রং মাখেনি অথচ তারা কেমন করে এরূপ সুন্দর স্বাস্থ্য বজায় রেখেছে তাই ছিল আমার ভাববার বিষয়। বিনা বাক্য ব্যয়ে রুমে এসে ভাবতে লাগলাম কবে জার্মানীতে গিয়ে পৌঁছব।

কতক্ষণ পর জন্ এসে হাজির। জনের বয়সও বেশি নয়, পঁচিশ ছাব্বিশ হবে, কিন্তু আমার কাছে মনে হ'ত অন্তত পক্ষে জনের বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে। জন এসেই বল্‌ল "জার্মান পর্যটকদের দেখেননি?" হাঁ বলেই আমি জনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। জন্ বলল, "ঐ যে জার্মান পর্যটক দেখছেন্ তারা হ'ল হিটলারের ইউথ্ লিগের লোক, তারা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করছে জার্মান জাতের শক্তি অর্জনের জন্য, এরা আপনার মত পর্যটক নয়। এদের কথা শোনার আগে আমার কথা শুনুন। আপনি নিশ্চয়ই জানেন ম্যাসিডোনিয়ানরা একদিন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত রাজ্য জয় করতে বের হয়েছিল, সেই ম্যাসিডোনিয়ানরা পরে তুরুকদের অধীনতা স্বীকার করে। তুরুকদের হটিয়ে দেবার জন্য তারা নানারূপ উপায়ও বেছে নেয়। তুরুকদের হাত থেকে রেহাই পাবার পর ম্যাসিডোনিয়ান্‌দের নিজেদের মধ্যেই ঘোর বিপ্লব আরম্ভ হয়। এই সুযোগে বুলগেরিয়ান, গ্রীক্ এবং স্লাভরা আবার আমাদের দেশ বিভক্ত করে নেয়। আমাদের দেশের লোক বিদেশ গিয়ে, ম্যাসিডোনিয়ান্‌দের একত্র করার জন্য অনেকরকম সংবাদপত্রও বের করেছিল। কিন্তু কথা হ'ল ম্যাসিডোনিয়ান্‌রা যদিও একই রক্তের লোক, কিন্তু সকলের ভাষা এক নয়। আমাদের মধ্যে যারা স্লাভ ভাষায় কথা বলে তারা চায় বুলগেরিয়ার ভেতর থাকতে। যারা গ্রীক ভাষায় কথা বলে তারা চায় গ্রীকের অন্তর্ভুক্ত হতে। কেউ কেউ আবার অন্যান্য ভাষাও বলে। উপরন্তু জিপসীরাও আমাদের দেশে প্রচুরই আছে। এরূপ ক্ষেত্রে আমাদের কি করা উচিত বলুন তো?" লোকটির কথা শুনে আমি কি জবাব দেব তার কিছুই খুঁজে পেলাম না, শুধু বল্‌লাম, "যুগস্লাভিয়া বেড়িয়ে দেখি তারপর আপনাদের কি করা উচিত তা বলব।" জন্-এর সঙ্গে অনেক দিন দেশ ভ্রমণ করেছিলাম। তার সাহায্যে অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম কিন্তু তার প্রশ্নের জবাব দিইনি। এই প্রশ্নের জবাব জন্‌ই পরে আমাকে দিয়েছিল। জন বলেছিল "যদি দেশে অর্থনীতির দুর্গতি না হয় তবে জাতীয়ভাবে দেশের কোন অবনতি আনতে পারেনা। অর্থনীতির দুর্গতির সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বংসাত্মক জাতীয়তাভাব এসে যায়। তখন লোক আপনা হতেই জাতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য এগিয়ে আসে। পেছনের অর্থনীতির দুর্গতির কথা মোটেই ভাবেনা। বল্‌কানের লোক যেদিন এই কথাটি বুঝবে সেদিন থেকে বল্‌কান থেকে যুদ্ধের বিভীষিকা লোপ পাবে।"

নীশের পথ-ঘাট যদিও অপরিষ্কার তবুও এই শহরটিকে বলকানের প্যারী বললে কোন দোষ হয় না। প্যারীর এত সুনাম কেন? সেখানের রুটি তত ভাল নয়, পথ-ঘাট-ও তত সুন্দর নয়, তবে কেন প্যারীর এত সুনাম? প্যারীতে মনের আনন্দে কামরিপু চরিতার্থ করা যায় বলেই ধনী পর্যটকগণ প্যারীর এত সুনাম করে থাকে।

ধনীরা দিনের বেলায় ঘুমায়, আর রাত্রে দিনের মত ঘুরে বেড়ায়। নীশেও সেরূপ লোক দেখতে পাওয়া যায়। দিনের বেলায় কামুকরা নাক ডাকিয়ে ঘুমায়, আর সন্ধ্যার পর সুদানী লতা খেয়ে কামদেবতার উপাসনা করে।

আফ্রিকার সুদান দেশে এক প্রকারের লতা হয়, সেই লতা আমাদের দেশের সজিনার ডাঁটার মতই দেখায়। সেই লতা খেলে ঘুম কম হয় এবং রিপুর উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সুদানে এই লতা টাকায় একটি করে পাওয়া যায় আর নীশে সেই লতা তের টাকাতে একটি মেলে। জন আমাকে তারই একটি দিয়েছিল। আমি সেই লতা দিনের বেলায় খাই এবং ক্রমাগত আশী মাইল সাইকেল চালাতে সক্ষম হই, কিন্তু পরের দিন আশী মাইল পথ চলতে অন্তত পক্ষে আটবার সাইকেল থেকে নামতে হয়েছিল। শরীর দুর্বল বোধ করেছিলাম এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ভবিষ্যতে এরূপ উত্তেজক বনস্পতি আর স্পর্শও করব না। পরে এই বনস্পতিটি খাওয়ার জন্য আরও কষ্ট পেয়েছিলাম, মনে হ'ত যেন আমার জ্বর হয়েছে। সাইকেলের প্যাডল যেন ঘুরতে চাইত না।

যুগস্লাভিয়া, উত্তর গ্রীস এবং রুমেনিয়ার কতক অংশে ভ্রমণ করে দেখা যায় এ অঞ্চলের লোক প্রায়ই বর্ণসঙ্কর। তা বলে তাদের স্ত্রীজাত ব্যভিচারী নয়। আমাদের দেশে পর্দার আড়ালে স্ত্রীলোকদের রেখে যারা ভাবেন তাদের মধ্যে বর্ণসঙ্কর অথবা ব্যভিচার আসবেনা তারা বড়ই ভুল করেন। নিজের দোষ, নিজের পরিবারের দোষ, নিজের গ্রামের লোকের দোষ এসব সহজে টের পাওয়া যায় না। যারা টের পায় তারাই হয় সমাজ সংস্কারক, যাকে প্রথম প্রথম বলা হয় সমাজ-ধ্বংসী। নীশে এসেই বুঝলাম, কি করে বর্ণসঙ্করের সৃষ্টি হয়। যুবতীরা একদম স্বাধীন। তারা যাকে ইচ্ছা তাকেই বিয়ে করতে পারে, আবার বাজারে বারবনিতাবৃত্তিও গ্রহণ করতে পারে। পুরুষ যদি ভাল করে স্ত্রীচরিত্র পাঠ করে তবে দেখতে পাবে কোন স্ত্রীলোক দুটো বিয়ে করতে রাজি হয়না। অর্থাভাবই তাদের ব্যাভিচারী করে তোলে। জন্‌কে নিয়ে আমি একটি 'স্ট্রীটে' গিয়েছিলাম যাকে এদেশে বলা হয় পল্লী। পল্লীতে নানা জাতের লোকের বাস। পল্লীতে কয়টি জাতের লোকের বাস তা নোট বইএ ভাল করে লিখেছিলাম। আমার নোট বইএ প্রায়ই বাংলাতেই লিখতাম সেজন্য হয়ত উচ্চারণ সঠিক না-ও হতে পারে। পল্লীতে ছিল জিপসী, বুলগার, গ্রীক, স্পেন্ দেশীয় ইহুদী, সারবিয়ান, তুরুক, ম্যাসিডোনিয়ান্, কুশো-ওয়ালা এবং স্থানীয় ইহুদী। এত জাতের লোক একত্রে বাস করতে দেখলাম কিন্তু তুরুক ছাড়া আর কারো পোশাকের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পেলাম না। তুরুক স্ত্রীলোকগণ-ও ইউরোপীয়ান পোশাকই পরে কিন্তু তারা একটু বিশেষ লাজুক বলেই মনে হ'ল। ভবিষ্যতে তা আর থাকবেনা। কিন্তু পল্লীতে কোনরূপ কুআচার আছে বলে মনে হলনা।

লোকে বলে পূর্বদেশীয় আচার ব্যবহার, আর পশ্চিম দেশীয় আচার ব্যবহারের বেশ পার্থক্য আছে। আমি তা স্বীকার করব না। চীন, জাপান এবং কোরিয়া তারাও

পূর্বদেশীয় লোক। তাদের আচার ব্যবহারের সঙ্গে ইউরোপের আচার ব্যবহারের বেশ মিল আছে। চীনা জাপানী এরা হাত দিয়ে খায়না, ইউরোপীয়গণও তাই করে। আরব দেশ থেকে আরম্ভ করে ইন্দোচীনের কম্বোজ পর্যন্ত লোকই হাত দিয়ে খায়। পোশাকের দিক দিয়েও পূর্বপশ্চিম বলে কিছুই নেই। আবহাওয়ার ওপর পোশাক পরিচ্ছদের গড়ন সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই ছোট পল্লীতে এসে পূর্ব এবং পশ্চিম দেশীয় সভ্যতা এক হয়েছে, অর্থাৎ পূর্বদেশীয় সভ্যতা লোপ পেয়ে গিয়ে পশ্চিম দেশীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে। ভাল আচার ব্যবহার মানুষ গ্রহণ করে, অব্যবহার্য আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করে, এটাই হল মানুষের ধর্ম। এখানেও তাই ফুটে উঠেছে।

এবার আমার নীশ্-পরিত্যাগের পালা। জন্ আমার সঙ্গে যাবে সেজন্যে সে সাইকেলও জোগাড় করেছিল, কিন্তু সাইকেলখানা এতই হাল্কা ছিল, যে, তাকে সেই সাইকেল বয়ে নিয়ে যেতে পারছিল না। তবুও সে আমার সঙ্গে চলতে লাগল। আমরা চলছিলাম বেলগ্রেদের দিকে। পথের প্রত্যেকটি গ্রামে এক দিন করে থাকব ঠিক করেছিলাম, সেজন্য আমাদের দৈনিক পঁচিশ থেকে ত্রিশ কিলোমিটারের বেশি চলতে হ'ত না।

নীশ পরিত্যাগ করে আমরা সর্বপ্রথম যে গ্রামটি পাই, তার নাম হল আলেক্সিজিনিক। এ-গ্রামে ম্যাসিডোনিয়ান, জিপ্সী এবং স্লাভরা বাস করে। গ্রামে একটিও মুসলমান পরিবার ছিলনা। গ্রামের ঠিক মাঝখানে একটি গীর্জা। তাকে কেন্দ্র করেই গ্রামের পত্তন হয়েছে। গত মহাযুদ্ধে এগ্রাম ধ্বংস হয়েছিল। বুলগারগণ এই গ্রামটিকে একেবারে ছারখার করেছিল। সেজন্য এগ্রামের প্রত্যেকটি ঘর নতুন। আমরা একটি হোটেলে দুখানা রুম ভাড়া নিয়েছিলাম। হোটেলের প্রত্যেকটি রুমই সুন্দর ছিল। কি কারণে বলতে পারিনা, হঠাৎ হোটেলের মালিক এসে আমাকে দোতলার একখানা রুমে নিয়ে গিয়ে ইঙ্গিতে বললেন সেই রুমেই আমাকে থাকতে হবে। আমার খাবারের বন্দোবস্তও তারই সঙ্গে হবে জানিয়ে দিলেন। জন্ এতে একটুও প্রতিবাদ করল না।

সেদিন ছিল রবিবার। আমরা যে সময়ে আলেক্সিজিনিকে পৌঁছেছিলাম সে সময়ে চার্চ থেকে লোকজন বেরিয়ে এসেছিল। প্রত্যেকেই গ্রাম্য হোটেল এবং রেঁস্তোরায় বসে খানাপিনা করছিল। আমরা যে হোটেলে ছিলাম সে হোটেলে খাবারের কোন বন্দোবস্তই ছিলনা, শুধু শোবারই বন্দোবস্ত ছিল। আমার রুম পরিবর্তন হয়ে গেল, হোটেলমালিকের যুবতী কন্যা আমাকে হাতমুখ ধোবার জন্য গরম জল দিয়ে রুমের এক পাশে দাঁড়িয়ে রইল। আমি তাদেরই প্রথামত হাতমুখ ধুয়ে ফেললাম। ভুলেও কুল্কুচি করলাম না, কারণ মুখ ধোবার সময় আরবরাই কুল্কুচি করে। তুরুকগণও তা পছন্দ করেনা। যদিও বা তাই করে তবে লোকের সামনে নয়। আমার হাত মুখ ধোয়া হয়ে গেলে, যুবতী তার সঙ্গে আমাকে অনুসরণ করতে বলল। আমিও দরজাটি বন্ধ করে তার পেছন পেছন এক তলায় নেমে গেলাম।

এক তলার একটি ঘরে খাবার সাজানো ছিল। হোটেল-ওয়ালা সেখানে বসেছিলেন। তাকে দেখেই আমি মুখ খুলতে সক্ষম হলাম। লোকটি অনেকরকম ভাষার

সাহায্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমার জাত কি? আমি বললাম আমার জাত হিন্দু। এদেশেও আমাদের হিন্দুই বলে। এতে লোকটি আরও সুখী হল। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন আপনি নিশ্চয়ই ন্যাশনালিস্ট এবং নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট নন। তার উত্তরেও আমি বললাম "হিন্দু"। লোকটি আর কোন কথা বল্‌ল না, তারপর খাবার দেওয়া হলে সে খৃষ্টানী প্রথায় প্রার্থনা করতে লাগল। আমি তার প্রার্থনায় যোগ না দিয়ে সামান্য কতটুকু রুটি, পণীর, কপিসিদ্ধ ছোট্ট একখানা প্লেটে উঠিয়ে রেখে একটু জল তাতে দিয়ে দিলাম। তারপর বেশ ভাল করেই খেয়ে নিলাম।

খাওয়া হয়ে গেলে জন্‌ এসে বসার ঘরে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। আমি জনকে বল্‌লাম, "দেখুন মশাই যা বলি তাই অনুবাদ করে লোকটিকে বলবেন, কমবেশি কোন কথাই বলবেন না। এই ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন আমি ন্যাশনালিস্ট না কমিউনিস্ট। উত্তরে বলেছি আমি মাত্র হিন্দু, কারণ যাদের স্বাধীনতা নেই তাদের এসব বালাইও নাই। আমরা সর্বপ্রথম স্বাধীন হই তারপর দলের কথা ঠিক করব।" আমার কথাগুলি জন্‌ হোটেলওয়ালাকে বুঝিয়ে দিল। এতে হোটেলওয়ালা বেশ সুখীই হয়েছিলেন এবং বিকেলে বলনাচে নিয়ে যাবেন বলে জানিয়ে দিলেন।

বলনাচের ঘরটা হোটেলের কাছেই ছিল। ঘরখানা একতলা। আমাদের দেশের সিনেমা ঘরগুলির মতই। একটি মাত্র দরজা। ঘরের ভেতর দেওয়ালের সঙ্গে ঘেঁসে প্রায় দু'শ চেয়ার সাজানো। হোটেলওয়ালার সঙ্গে গিয়ে আমরা দুখানা চেয়ার দখল করলাম। সর্বপ্রথম ছয়টি যুবতী দাঁড়াল এবং পাঁচজন পুরুষকে নিয়ে নাচতে লাগল। একটি যুবতী আমার কাছে এসে দাঁড়াল এবং আমাকে নিয়ে নাচবে বলে ইঙ্গিত করল। আমি চেয়ার থেকে না উঠেই বললাম "আমি নাচতে জানিনা, অতএব ক্ষমা করবেন।" যুবতী অন্য যুবককে নিয়ে নাচতে লাগল। যুবক যুবতীর নৃত্য বড়ই সুন্দর। ভারতের লোক বল্‌নাচকে বড়ই খারাপ চক্ষে দেখে, কিন্তু আমার কাছে সে নৃত্য একটুও খারাপ মনে হ'ল না। নাচের ভেতর দিয়েই যেন যুবক যুবতী তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের চিন্তাধারা ঠিক করে নিচ্ছে। কামের একটু গন্ধও তাতে আমি পাচ্ছিলাম না। যখন যুবক যুবতী নৃত্য করছিল তখন আমার অনেক কথাই মনে হচ্ছিল। মালয়রা ধর্মে মুসলমান। মালয় বলতেই মুসলমান বোঝায়, কিন্তু এখনও তাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে একত্রে নৃত্য করার প্রথা রয়েছে। আমাদের দেশেও পূর্বে ছিল। কিন্তু মধ্য-যুগের আরব সভ্যতা যতই আমাদের দেশে প্রবেশ করছিল ততই স্ত্রী-পুরুষের অমিলন বেড়ে চলছিল। পরে এমন হয়েছিল যে অন্তঃপুরের সৃষ্টি করা হয়েছিল। স্ত্রী-পুরুষ সম্পূর্ণ বিভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইউরোপ আরব সভ্যতা মাথা পেতে নেয় নি। তারা প্রাকৃতিক নিয়ম কানুন বজায় রেখেছিল।

এক দফা নৃত্য শেষ হয়ে যাবার পর প্রত্যেক যুবক দু'গ্লাস করে বিয়ার কিনে যে সব যুবতী তাদের সঙ্গে নেচেছে তাদের এক গ্লাস ক'রে দিল। আর নিজেরা এক গ্লাস ক'রে পান করতে লাগল। সাধারণত হয়ে থাকে, তবে আজ তার একটু পার্থক্য। হোটেলওয়ালা এবং

আমাদের দুটি খালি গ্লাস দেওয়া হ'ল। সেই খালি গ্লাসগুলিতে প্রত্যেক যুবক যুবতী একটু করে বিয়ার ঢেলে দিতে লাগল। আমাদের গ্লাস যখন ভর্তি হয়ে গেল তখন বারজন যুবক যুবতী আমাদের ঘিরে আনন্দধ্বনি করে আমাদের গ্লাসের সঙ্গে তাদের গ্লাস ছুঁইয়ে বিয়ার পান করতে লাগল। এমনি করে বার গ্লাস বিয়ার খাবার পর আমার বেশ নেশা হয়ে গেল। আমি আর বিয়ার খেতে পারছিনা দেখে তের বারের যুবক যুবতী আমার মাথায় কিছুটা বিয়ার ঢেলে দিল। এতে আমার মাথা ত ভিজলই, এমনকি গায়ের সার্টটি পর্যন্ত ভিজে গেল। বিষয়টা যখন চরমে দাঁড়াল তখন আর আমি বসে থাকা ভাল মনে করলাম না, উঠে দাঁড়ালাম। আমি উঠে দাঁড়াতেই হোটেলওয়ালা আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর মেয়েটিকে তিনি ইঙ্গিতে ডাকলেন। মেয়েটি বের হয়ে আসার পর আমাকে হোটেলে নিয়ে যাবার জন্য তাকে বললেন। আরও বললেন আমাকে শুইয়ে দিয়ে যেন একখানা তোয়ালে গরম জলে ভিজিয়ে আমার শরীরটা মুছে দেয়। লক্ষ্য করলাম হোটেলওয়ালার মেয়ে আমাকে তার আত্মীয়ের মতই দেখছে, একটুও ঘৃণা করছে না। সে আমাকে তন্দ্রাবস্থায় রেখে চলে গিয়েছিল। আমি রুমটিতে ক'টি বরগা, কখানা চিত্র তাই গুণছিলাম তারপর গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হলাম। রাত্রে খাবার খেতে কেউ আমাকে ডাকেনি।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই জন্‌কে ডাকলাম। জন্ হোটেলওয়ালার সঙ্গে তখন কথা বলছিল। জন্ আমাকে ডেকে নিয়ে বসার ঘরে বললে এবং আমাদের সভ্যতা সম্বন্ধে কথা উঠাল। ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে আমি যা অবগত ছিলাম তাই আমি বিশেষ ভাবে বলতে লাগলাম। আদিযুগ থেকে মধ্যযুগের ভারতীয় সভ্যতা সম্বন্ধে হোটেল-ওয়ালা এবং আমি এক মতেরই ছিলাম, কিন্তু বর্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে আমি এক মত হ'তে পারিনি। দোভাষীর মারফতে কথা বলেই আমরা বেশ সুখী হয়েছিলাম। হোটেলের মালিক দুপুরে তাঁর গৃহে পুনরায় খেতে বললেন এবং বিকালের দিকে রওনা হতে উপদেশ দিলেন। বিকালের দিকে আমি কোথাও যাই না, সেজন্য দুপুরে হোটেলের মালিকের নিমন্ত্রণ আর গ্রহণ না করে রেঁস্তোরায় খাবারের বন্দোবস্ত করলাম। সেদিন আমরা আর স্থান ত্যাগ করতে সক্ষম হলাম না। সারাটা বিকালবেলা বিশ্রাম করে কাটিয়ে পরের দিন সকাল বেলা আবার পথে বের হলাম।

আমাদের যেতে হবে একচল্লিশ কিলমিটার। যে শহরে যাচ্ছিলাম তার নাম এতই অস্পষ্ট করে নোটবুকে লিখেছিলাম যা এখন আর বুঝতেও পারছিনা কি লিখেছি! অথচ সেরূপ ম্যাপ এদেশে এখন আর পাওয়া যাবেনা। তবে সেই শহরটির নয় কিলমিটার উত্তরে আর একটি শহরে গিয়েও এক রাত কাটিয়ে ছিলাম, সেই শহরটির নাম হল (**Kaprija**) কাপুর্যে। যদিও অনেকে বলবেন "কাপ্রিজা" কথাটার উচ্চারণ হওয়া উচিত ছিল কিন্তু স্থানীয় লোক শহরটিকে কাপুর্যে থেকেই বলে।

আলেক্সজিনিক থেকে বিদায় নিয়ে আমরা পথে এলাম। পথে দেখা হল একটি জিপসীর সঙ্গে। জিপসীর হাতে সারেংগী। আমাদের দেশের লোক যেমন করে হরিনাম কীর্তন

করে পথে চলে, এই লোকটিও তেমনি আকাশের দিকে তাকিয়ে কি একটা গান গাইতে গাইতে চলছিল। আমি জন্‌কে বললাম, "একটু দাঁড়ান এবং আমাকে বলুন এই লোকটি কি গান গাইছে।" জন্ জিপসীদের ভাষা বুঝত। জিপসী গাইছিল—"হে জনক জননী তোমাদের মিলনেই এই সংসারের উৎপত্তি, তোমাদের আমি প্রণাম করছি। তোমাদের সকলে বোঝেনা, তোমরা অসীম ক্ষমতাশালী। তোমরা যখন মিল তখন খৃষ্টান, ইহুদী এবং মুসলমানরা যে এক ঈশ্বরকে উপাসনা করে, তার মত অসংখ্য ঈশ্বরের জন্ম দেও, তোমাদের আমি প্রণাম করছি।"

মিঃ জন্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম "এদের ধর্মের নাম কি?" জন্ একথার জবাব দিতে পারল না। কারণ জিপসীরা যে ধর্ম মেনে চলে তার কোন নাম নাই। হীদেন্ হাবভাবই নাকি এদের আসল ধর্ম।

অনেকক্ষণ জিপসীর গান শুনছিলাম। জিপসী তন্ময় হয়ে আপন মনে গান গেয়ে পথ চলছিল আর আমরা অতি সন্তর্পণে ধীরে সাইকেল চালিয়ে জিপসীর পেছনে চলছিলাম। এদেশে জিপসী ভাবাপন্ন চেক্, ক্রট এবং শ্লাভকেও দেখা যায়। তুরুকদের মধ্যে দরবেশ বলে একশ্রেণীর লোক ছিল তারাও আল্লা আল্লা বলে গান গেয়ে পথ চলত। তুর্কীতে এখন আর দরবেশ নাই। তাদের এখন রীতিমত কাজ করতে হয় এবং সংসার ধর্মও করতে হয়। মুস্তাফা-কামাল-পাশা দরবেশদের উচ্ছেদ করছেন। যুগশ্লাভিয়ায় কিন্তু তা হতে পারেনা। যুগশ্লাভিয়ায় কারো ধর্মের উপর হাত নেই, আমাদের দেশেও ঠিক তেমনি একই নিয়ম।

জিপসীকে পরিত্যাগ করে আমরা পুরাদমে সাইকেল চালিয়ে শহরে এলাম এবং ছোট একখানা হোটেলে স্থান নিলাম। এখান থেকে আরম্ভ হয়েছে পাহাড়। সেজন্য পরের দিন আমরা মাত্র নয় কিলমিটার চলেই বিশ্রাম করতে বাধ্য হয়েছিলাম। ছোট হোটেলে থাকার জন্য আমাদের বেশি খরচ করতে হয়নি কিন্তু খাবারের জন্য বেশ খরচ করতে হয়েছিল। এই শহরটিতে খাদ্যের দাম অন্যান্য শহর থেকে বেশি বলেই মনে হ'ল।

বিকাল বেলা যখন শহরে বেড়াতে বের হয়েছিলাম তখন দুজন জার্মান পর্যটকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তাদের পায়ে ভারতীয় সেণ্ডেল ধরণেরই একরকমের জুতা ছিল, তবে তা বেশ টেঁকসই। পরণে হাফ্‌প্যাণ্ট এবং গায়ে পাতলা কাপড়ের একটি করে সার্ট। আমাকে দেখামাত্র, আমি যে একজন পর্যটক তা বুঝতে পেরে বেশ সমাদর করে একটি বেঞ্চে নিয়ে বসাল।

তারা বেশ ভাল করে ইংরিজী এবং ফ্রেঞ্চ বলতে পারত। আমি যখন বললাম, ফ্রেঞ্চ বলতে পারিনা, ইংলিশই শুধু জানি, তখন জার্মান যুবকেরা বল্‌ল ইংলিশ ভাষা থেকে ফ্রেঞ্চ ভাষার ব্যাকরণ বেশ সহজ এবং ইউরোপের সর্বত্র ফ্রেঞ্চ ভাষাই চলে। জার্মান যুবকদের বললাম, "আমাদের পক্ষে ইউরোপের নানা ভাষা শিক্ষা করা সম্ভবপর নয়, একটি ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করলেই যথেষ্ট। আমার জবাব শুনে

জার্মান যুবকেরা যে সকল প্রশ্ন করেছিল এবং আমি তার যে উত্তর দিয়েছিলাম তার অবিকল অনুবাদ করে দিলাম।

ভারতের লোকসংখ্যা কত?

আনুমানিক আটত্রিশ কোটী।

শতকরা কত পারসেণ্ট শিক্ষিত?

আট হতে নয়।

এরা কি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক?

প্রায়ই।

ভারতে ধনীর সংখ্যা কত হবে?

অনেক।

তবুও একটা সংখ্যা জানতে পারি কি?

আপনারা ধনী কাকে বলেন?

এই ধরুন এক মিলিয়ন মার্কের মালিক যারা তাদেরই আমরা ধনী বলি। এবং সেরূপ লোকের সংখ্যা কত হবে?

পাঁচ সাত হাজার লোক নিশ্চয়ই হবে। এদের সঠিক সংখ্যা আমি জানিনা, এদের মধ্যে রাজা মহারাজাও আছেন।

আপনি কি কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে সাহায্য পান?

না।

কেন?

আমাদের দেশে এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই, যা বিদেশে পর্যটক পাঠিয়ে বিদেশের সংবাদ সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক।

তবে আপনি আমাদেরই মত দেখছি, চলুন গিয়ে কিছু খাওয়া যাক। আজ আপনি কত ঘণ্টা কাজ করেছেন?

কাজ মানে?

এই ভিক্ষা করা।

আজ আমি ভিক্ষা করিনি। সন্ধ্যার পর আমাব সঙ্গীকে নিয়ে ভিক্ষায় বের হব এখন খেতে যাই চলুন।

যুবকদ্বয়ের সঙ্গে একটি গ্রীক রেঁস্তোরায় খেতে গেলাম। গ্রীক রেঁস্তোরায় মুরগীর মাংসের তরকারী ভারতীয় ধরনে তৈরী হয়েছিল। রুটির সাহায্যে প্রায় আধসের মাংস খেয়ে তৃপ্ত হলাম। জার্মান যুবকদ্বয়ও পেট ভরে মুরগীর মাংসই খেল এবং আমাকে বলল, পূর্বদেশীয় লোক মসল্লার বেশ সদ্ব্যবহার জানে। ইংলিশ, জার্মান এবং অন্যান্য কয়টি জাত এখনও গ্রীক, বুলগার ইত্যাদি লোককে ইউরোপীয় বলে স্বীকার করে না। খাওয়া হয়ে গেলে আমরা হোটেলে এলাম। হোটেল কাছেই ছিল। হোটেলে এসে দেখি, আমার সাথী, হোটেলের মালিকের সঙ্গে বেশ ঝগড়া বাধিয়েছে।

ঝগড়ার কারণ ছিলাম আমি। হোটেলের মালিক বলছিল আমিও একজন জিপসী। এতে জন্ ভীষণ প্রতিবাদ করে এবং আমি এলেই আমার পাসপোর্ট দেখিয়ে প্রমাণ করে আমি একজন হিন্দু। আমি হোটেলে পৌঁছা মাত্র, জন্ আমার পাসপোর্ট খানা বের করে নিয়ে বল্‌ল "এই নাও, একবার চোখ মেলে দেখ। হোটেলের মালিক পাসপোর্টখানা বেশ ভাল করে পরীক্ষা করে বল্‌ল—"জন্ তোমার কথাই ঠিক, তবে লোকটি এত কালো কেন! এর শরীরের রং দেখতে হবে।"

জন্ আমাদের সকল কথা খুলে বলল এবং জানাল, হোটেলওয়ালার মতে ভারতের লোক সবই আর্য। আর্যরা কালো রংএর হতে পারেনা। মনুষ্যতত্ত্ববিজ্ঞান আমি পাঠ করিনি সত্যকথা, কিন্তু আমার ভ্রমণের সময় অনেক পণ্ডিতের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল এবং জেনেছিলাম আমার শরীরে তিনটি রক্তের সমাবেশ হয়েছে। হোটেলওয়ালাকে তাই বললাম, সেই সঙ্গে জানালাম, রক্তের যতই মিশ্রণ হবে, মানুষেরও ততই উন্নতি হবে। বল্‌কান দেশ তার চাক্ষুষ প্রমাণ। নিগ্রো, সিমেটিক, মোঙ্গল, আর্য, দ্রাবিড় এই সকল জাতের সংমিশ্রণে আজ বলকানের গঠন হয়েছে বলেই বল্‌কানের লোক যত বিদ্রোহ করছে তেমনটি আর কেউ করেনি। আপনাদের দেশে এসেই শুনলাম, ১৯৩২ সালে ম্যাসিডোনিয়ান্‌রা বিদ্রোহ করে সোফিয়া শহর দখল করেছিল। বুলগাররা তুর্কী আক্রমণ করেছিল। হংগেরীতে চাষাদের বিদ্রোহ হয়েছিল। যুগস্লাভিয়ার ম্যাসিডোনিয়ান্ এবং বুলগাররা এখনও যুগস্লাভ-সরকারের ধার ধারেনা। এসব সংবাদ বিদেশে যায় না। যদি বলকানের সকল সংবাদ বিদেশে যেত তবে লোকে বলত, বলকান হ'ল পৃথিবীর ভল্‌কেনো। লোকটির মনে বর্ণাভিমান বেশ ছিল, কিন্তু সে যখন শুনল বলকানে পৃথিবীর সকল রকমের রক্তই বিরাজ করছে তখন সে বাধ্য হয়ে মাথা নত করল।

জার্মান যুবকদের সঙ্গে জনের পরিচয় হ'ল এবং তারা ফ্রেঞ্চ ভাষায় কথা বলতে লাগল। জার্মান যুবকদ্বয় নাৎসী মতাবলম্বী আর জন্ কমিউনিস্ট। ওদের মাঝে বেশ কথা কাটাকাটি হতে লাগল। অবশেষে জন্ বল্‌ল নাৎসীমতবাদ আর ভারতের ব্রাহ্মণ মতবাদ একই ধরনের। জনের কথা শুনেই আমার চমক লাগল। সকলের কথা থামিয়ে দিয়ে জন্‌কে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ভারতের ব্রাহ্মণ মতবাদ মানে কি এবং তিনি কোথা হতে সেকথা অবগত হলেন। জন্ কোন কথা না বলেই আমাদের নিয়ে কাছেই একটি লাইব্রেরীতে গেলেন এবং লাইব্রেরী রুম থেকে একখানা বই বের করে তাই পড়তে লাগলেন। বইখানা স্লাভ ভাষায় লেখা। তাও লিখেছেন এক জন পরিব্রাজক। পরিব্রাজকের নাম "হারমুলার"। চেকোস্লোভাকিয়ার সুডেটেন এলাকায় তার জন্ম। জাতে তিনি জার্মান। বইখানা জার্মান ভাষায় ছাপান হয়েছিল, হিটলার যখন ক্ষমতা পান তখন এই বই-এর প্রচার বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু চেক, স্লাভ এবং গ্রীক ভাষায় বইখানা অনুবাদ হয়ে বলকানের ঘরে ঘরে বিরাজ করছে। পরিব্রাজক মুলার দম্পতির সঙ্গে আমার হংকং, সাংহাই এবং হারবিনে দেখা হয়। পূর্বদেশ ভ্রমণ করে আসার পর দ্বিতীয়বার তিনি ভারতে এসেছিলেন এবং বেহার প্রদেশের কোনও স্থান হতে তিনি

বিতাড়িত হয়েছিলেন। বলকানে পর্যটকের লেখার বেশ প্রভাব আছে দেখে, আমার ভ্রমণ পিপাসা আরও বেড়ে যায় এবং ইউরোপের যাতে নানা বিষয় অবগত হতে পারি সেজন্য আরও মন সন্নিবেশ করি।

জার্মান যুবকরা আর কথা বাড়ালেন না, আমিও তাঁদের সঙ্গে কোনও অপ্রীতিকর কথা বলে বন্ধুত্ব হারাতে চাইলাম না, শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, জার্মানীতে গেলে, লোকে আমাকে ভিক্ষা দেবে ত? জার্মান যুবকদ্বয় বলেছিল, জার্মানীতে গেলে আমার খাবার এবং থাকবার অভাব হবেনা। জার্মানীতে যাবার পর আমার খাবার এবং থাকার মোটেই অভাব হয়নি। জার্মান যুবকদ্বয়ের কথা সত্যই হয়েছিল।

এই ছোট শহরটিতে আমার ভিক্ষা করা হয় নি। পরের দিন সকালে রওনা হয়ে বেলা নটার সময় আমরা কাপুর্যে পৌছি। মাত্র নটি মাইল পথ। কিন্তু পথ ভয়ানক চড়াই। চড়াই উঠতে গিয়ে আমাদের দুঘণ্টা সময় লেগেছিল। যদিও মুখ দিয়েই শ্বাস বের হচ্ছিল, তবুও চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার মনকে বেশ আনন্দ দিয়েছিল। এরূপ সৌন্দর্য কি আমাদের দেশে নেই, নিশ্চয়ই আছে, তবে সেই সৌন্দর্যকে যদি মানুষ নিজের হাতে ফুটিয়ে না তোলে তবে তা দেখবার অযোগ্য। কাশ্মীর বেশ সুন্দর স্থান, কিন্তু কাশ্মীর সরকার ডাল্ লেক্‌টিকে যে অবস্থায় রেখেছেন তা দেখতে মোটেই ভাল লাগেনা। আমেরিকায় ডাল লেকের মত একটি হ্রদ আমি দেখেছি, যা দেখে চোখ সার্থক হয়েছে বলেই মনে করি। মানুষের হাতের স্পর্শ যদি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে না লাগে তবে সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ্য নয়।

কাপুর্যে পৌছার পর আমরা যে হোটেলে উঠেছিলাম, সেই হোটেলে দুজন আলবেনিয়ান যুবকও এসে আস্তানা গেড়েছিল। তারা ব্যবসায়ী নয়, পর্যটক। আলবেনিয়া থেকে এদের পূর্বে কোনও পর্যটক বের হয়নি এজন্য এদের সমাদর সর্বত্র। আমরা হোটেলে পৌছবার পরই, হোটেল মালিক আলবেনিয়ান্ যুবকদ্বয়কে ডেকে এনে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। আলবেনিয়ান্‌রা ইটালীয়ানো-ই জানত, ফ্রেঞ্চ অথবা ইংলিশ মোটেই জানত না। হোটেল মালিকের কৃপায় এদের সঙ্গে কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলাম।

রাজা জগো আলবেনিয়াতে অনেক পরিবর্তন এনেছিলেন এবং আরও পরিবর্তন করবেন বলে এদের কাছ থেকে শুন্‌তাম। এরা কিন্তু পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়। তারা বলে, পরিবর্তন এনে কি হবে? আল্লার ইচ্ছা পূর্ণ হবেই। আল্লার ইচ্ছাতেই যা পরিবর্তন হবে, এর বেশি নয়। তাদের ইচ্ছা যুগোস্লাভিয়া থেকে সোফিয়া যাবে এবং সেখান থেকে তুর্কী হয়ে মক্কায় হাজির হয়ে দেশে ফিরে যাবে। বেলগ্রেদে তারা তুর্কীর ভিসার জন্য চেষ্টা করেছিল, সেখানে ভিসা পায়নি, তাদের আশা আছে সোফিয়াতে গিয়ে হয়ত ভিসা পেতে পারে।

হোটেলওয়ালার মারফতে, পর্যটকদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাজা জগো তাদের দেশে কি কি পরিবর্তন এনেছেন? তারা বল্‌ল, আরবীক অক্ষরের পরিবর্তে তিনি লাটিন

অক্ষর প্রচলিত করেছেন। কোট প্যাণ্ট ত হয়েছেই, উপরন্তু তিনি আল্লার পিয়ারা দরবেশদেরও কাজে নিযুক্ত করেছেন। যারা আল্লার গুণ গায় তাদের কাজে লাগানো মহা অন্যায় কাজ, আল্লা একদিন রাজা জগোকে শাস্তি দেবেনই। আমি তাদের আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "তাদের খরচ কে বহন করছে?" "কেন ইন্‌টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, পর্যটকের খরচের টাকা তারাই যুগিয়ে থাকে।" ওদের আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে সময় নষ্ট করা উচিত মনে করলাম না। আমাকেও একদিন কোনও ইন্‌টার-ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ইচ্ছা করেই বোধহয় বেশি টাকা দিয়েছিল। পরে যখন দেখল' আমি আল্লার কথা বলিনা, রাজার কথা বলিনা, তখন তারা আমাকে আর আমল দিতনা।

লোকে বলে ফ্যাসিজম্ আর ইম্পিরিয়েলিজমে রাত দিন প্রভেদ। এতে প্রভেদ মোটেই নেই। দুইই মানুষকে অন্ধ বানিয়ে রাখতে চায়। তবে সাম্রাজ্যবাদটা হ'ল চতুরতায় পূর্ণ আর ফ্যাসিবাদটা হল রুক্ষ। প্রভেদ অতি সামান্য। এই পর্যটকদের কাজকর্ম কিছুই বুঝতে পারলাম না। তাঁরা বাইরে গিয়ে লোকের সঙ্গে কথাবলা মোটেই পছন্দ করেন না। আল্লার গুণগান করেই সময় ক্ষেপন করেন, এ কথাটা হোটেলওয়ালাই আমাকে বলেছিল।

বিকাল বেলা যখন আমরা ভিক্ষায় বের হলাম তখন প্রায় দোকানীই আমাদের ভিক্ষা দিল এবং আমার সঙ্গীর মারফতে আমাকে আমাদের দেশ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগল। একজন লোক জিজ্ঞাসা করেছিল "মহাত্মা গান্ধী যে সকল লোককে সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েণ্ট করতে পাঠান তাদের নাকি মন্ত্র দিয়ে শুদ্ধি করেন! শুদ্ধি করা লোককে পুলিশ আঘাত করলে, হাতেও রক্ত বের হয়না, আহত হলে কোন কষ্টও হয় না। এটা কথার কথা নয়, একজন আরব নাকি তা স্বচক্ষে দেখে এসেছে এবং সেই কথা কাপুর্যে পর্যন্ত এসে পৌছেছে।" এ কথার জবাবে হাঁ কি না বলব তা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে বল্‌লাম, "এসব হ'ল গল্প। গল্প হয় মন গড়া, সত্য তাতে থাকেনা।"

কাপুর্যের আবহাওয়া কিন্তু আমার কাছে মোটেই ভাল লাগছিল না। অনেকগুলি দোকানীকে আমাদের দেশের মুদীদের মত বসে জিনিস বিক্রী করতে দেখতে পেয়ে জন্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম, "এরা আরব না অন্য কিছু?" জন বলল, "এরা ধর্মে মুসলমান জাতে স্লাভ্‌, কারণ এরা স্লাভন ভাষায় কথা বলে।"

বিকাল বেলা একটি বড় রেঁস্তোরায় গিয়ে কফি খেতে বসলাম। বিয়ার খাওয়াতে আমার শরীর বেশ দুর্বল হয়েছিল। কফি খেয়ে ভিক্ষাপত্রগুলি-ও কিছু কিছু বিলি করলাম। ভিক্ষাপত্র যাকেই দিয়েছি সেই আমাকে আর্থিক সাহায্য করেছিল। রেঁস্তোরার এক পাশে একজন স্ত্রীলোক তাস নিয়ে একাকীই খেলছিল। তার কাছে যাওয়া মাত্র আমাদের বসতে বলল এবং আমাদের প্রত্যেকের জন্য এক কাপ করে ভাল কফি আনতে আদেশ দিল। স্ত্রীলোকটি বোধহয় অনেক ভাষাই জানত। আমাদের সঙ্গে ইংলিশেই কথা বলতে লাগল। কিন্তু স্ত্রীলোকটির কথাবার্তা যেন

একটু বেয়াড়া বলেই মনে হল। জন্ কিন্তু আর একটি বেয়াড়া লোক। সে ইংলিশেই বল্ল, তার শরীরে যত রক্ত আছে সবই খরচ হবে দেশ-সেবায়। এ জীবনে সে বিয়ে করবে না। তারপর আমার পালা। আমি বললাম, শক্তি আমি চাই শুধু সাইকেল চালাতে। আমি এত শক্তি চাই আমার শরীরে, যাতে করে মোটরকারকে পাল্লা দিয়ে আমি আগে যেতে পারি। স্ত্রীলোকটির সঙ্গে আর কোনও কথা হল না, তার পরিচয় চাওয়াও আমরা দরকারী মনে করলাম না।

কবির কবিতা আমরা পড়ি, কিন্তু সকল সময় কবিতা আমাদের মনের মত হয় না, তবুও ভাল লাগে, কারণ তাতে রয়েছে স্বর, তান এবং লয়, ঠিক তেমনি সকল সময় মানুষ ভাল উপদেশেরও সৎ ব্যবহার করতে পারেনা। জগোদীনা তার প্রমাণ। কাপুর্যে হতে আমরা জগোদীনা পরের দিন গিয়েছিলাম। জগোদীনা দেখবার মত স্থান বলেই মনে হল। গ্রামের চারিদিকে যতটুকু চোখের দৃষ্টি যায় ততটুকু মাঠ। এই মাঠগুলিতে হয়েছিল ধর্মে ধর্মে লড়াই। লোক মরেছিল তাতে অসংখ্য। এক দল এসেছিল ক্রশ হাতে করে, আর অপর দল এসেছিল চাঁদ আর তারকাযুক্ত পতাকা বহন করে। লোক মরল, যুদ্ধ শেষ হল, চারিদিকের গ্রাম উজাড় হ'ল, কিন্তু ধর্মের বৈষম্য মিটলনা। মানুষের তৈরী ধর্ম নিয়ে মানুষ বেশ লড়াই করল, তারপর উভয় পক্ষ যখন আর কেউ কারোকে কাবু করতে পারল না তখন হাঁপাতে লাগল। আমরা ঐ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পাশে বসে কথা বলছিলাম। জন আমাকে বুঝিয়ে বলছিল, এটাই হল মানুষের তৈরী ধর্মের পরিণতি, তারপরই আমরা গেলাম জগোদীনা গ্রামে।

গ্রামের লোক পুরান ইতিহাস এখন ভুলে গেছে। তারা এখন সেই পুরান ইতিহাসের কথা শুনলে হাসে। তারা বলে এটা হ'ল পশুতে পশুতে লড়াই। সেই পুরান কথা ভেবে কি লাভ হবে। আমরা এখন সে স্টেজ পেরিয়ে এসেছি। আমরা এখন আরও বেশি সভ্য হয়েছি। এখন আমরা অন্য ধরনের চিন্তা করি। এখন আমরা দেখব আমরা এই পৃথিবীতেই কি করে সুখে থাকতে পারি। কিন্তু গ্রামের লোকের কথা কে শোনে? গ্রামের লোক এক কথায় বিদ্রোহী। কেউ এদের রাজদ্রোহী আখ্যা দেয়, কেউ বলে এরা অমানুষ হয়েছে, কেউ বলে এই গ্রামের লোক বলসেভিক্। কিন্তু ঐ ছোট গ্রামটির উপর দিয়ে গত মহাযুদ্ধের সময় যে ঝঞ্ঝা বয়ে গিয়েছিল সেকথা সকলে ভুলে যায়নি। স্বামীর কাছ থেকে স্ত্রী বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। মার কাছ ছেড়ে পুত্র কন্যা কোথায় চলে গিয়েছিল তার মা যেমন ভুলতে পারেনি, সমাজও ভুলতে পারেনি। সমাজের শাসনকর্তারা পাঁদরীদের মুখ দিয়ে বলায়, এটা হ'ল পৃথিবীর লোকের পাপের ফল, কিন্তু সকলে সে কথা বিশ্বাস করেনা। অনেকে বলে, ঐ যে দেখছ রক্তখেকো ধনীগুলো, এরাই হল এই বজ্জাতির মূল, এদের উচ্ছেদ হলেই আমরা বাঁচি।

গ্রামের লোক যত, তার চাইতে পুলিসের এবং সেনানীর সংখ্যা বেশি। গাল পেট্টি বেধে সেপাইর দল ঘুরছে। মোটা মোটা রুল আর হুইসেল নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

পাদরীর দল মালা টপকিয়ে পথ চলছে। তারা এত পাহারা দিচ্ছে কেন? এই গ্রামেরই একটি যুবক যুগস্লাভিয়ার রাজাকে হত্যা করতে নাকি সাহায্য করেছিল। রাজ হত্যা মহাপাপ, সেই পাপেরই ফল এখন গ্রামবাসী ভোগ করছে। সেই গ্রামে গিয়ে আমার আনন্দ হল, আমি গ্রামের লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের জেলে পুরে রাখা হয়নি কেন? তোমাদের স্ত্রীলোককে কেড়ে নেওয়া হয়নি কেন? তোমাদের প্রতি পাইকারী জরিমানা করা হয়নি কেন? তোমাদের ঘর দরজা ভেঙ্গে দেওয়া হয়নি কেন? আমার কথা শুনে জন্‌ হাসল, গ্রামের লোক হাসল, এমন কি পুলিস পর্যন্ত হাসল। অনেকে জিজ্ঞাসা করল পূর্বদেশে কি এরূপ হয়? আমি সে কথার জবাব দিইনি। আমার কথা শুনে গ্রামের একজন গণ্যমান্য লোক বেশ বড় একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে থাকবার ব্যবস্থা করলেন। লোকটি ভেবেছিল, আমি হয়ত রাজহত্যার কথা শুনে দুঃখিত হয়েছি এবং শোক প্রকাশ করছি। জন্‌ তো তাই ভেবে আমাকে বলছিল, "পূর্বদেশের লোক রাজাকে দেবতার মতই মনে করে, সেজন্য আপনি দায়ী নন্, দায়ী আপনার সমাজ, আপনাকে আমি মোটেই দোষ দেবনা অথবা আপনার সঙ্গও পরিত্যাগ করব না। গণসভ্যতা যে-সকল দেশে এখনও পৌছয়নি, সেই দেশগুলিতেই লোক রাজভক্ত এবং তারা রাজভক্ত না হয়ে পারে না।

সেদিন পথে পথে দাঁড়িয়ে শুধু পুলিসের টহল আর সেপাইদের আনাগোনাই দেখলাম। পরের দিনটাও সেই ছোট শহরটিতে থাকব ভাবলাম। হোটেল মালিক তার নিজের লোককে ডেকে আমাদের জন্য বিশেষ খাদ্যের ব্যবস্থা করলেন এবং আমাকে জানালেন, আমি যতদিন ইচ্ছা তাঁর হোটেলে থাকতে পারব সেজন্য আমাকে একটি পয়সাও দিতে হবে না। সংবাদটি শুনে আমি সুখী হলাম বটে, কিন্তু জন্‌ মোটেই সুখী হল না, যে যেন এই শহর পরিত্যাগ করতে পারলেই বাঁচে। জনের আধমরা মুখ দেখে দুঃখিত হয়েছিলাম। জনকে জিজ্ঞাসা করলাম—

জন্, এখানে কি থাকতে ভাল লাগছেনা?

না বন্ধু, আজই এখান থেকে চ'লে যেতে ইচ্ছা করছে।

কেন?

এরা আমাকে মোটেই পছন্দ করে না।

এর কারণ কি?

আমাদের লোকও নাকি রাজহত্যায় লিপ্ত ছিল।

তাব'লে অসময়ে এখান থেকে কোন মতেই রওনা হতে পারিনা। আসছে কাল সকাল বেলা এখান থেকে রওনা হব। আজ রাতটা কম্বল মুড়ি দিয়েই শুয়ে থাকা যাক।

তাই হবে, এখন আপনি বাইরে যান।

আমি আর কথা বাড়ালাম না। বাইরে গিয়েও বসে থাকা চলেনা। এ দিকের লোক অন্ধধরনের। বিদেশী দেখলেই পেছনে ছোটে, সেজন্য ঘরেই একখানা চেয়ারে

বসে একখানা মানচিত্র দেখতে লাগলাম। পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেল করে পৃথিবী দেখতে বের হলে পৃথিবীটাকে বেশ বড় লাগে। বসে বসে ভাবতে লাগলাম কতদিনে পৃথিবী ভ্রমণ সমাপ্ত হবে। নানা ভাবনার ভেতর দিয়ে রাত কাটল।

পরের দিন সকাল বেলা উঠেই আমরা পথ ধরলাম। শহর থেকে বের হয়েই যে পথটি বেলগ্রেদের দিকে গিয়েছে, সেপথ পরিত্যাগ করে নয়া পথ ধরবার জন্য জন্ আমাকে অনুরোধ করল। প্রশ্ন করে জানলাম ক্রাগুজিভা বলে আমাদের ডান দিকে আর একটি শহর আছে, সেই শহরটি দেখে যাওয়া আমার কর্তব্য। পুরান প্রাসাদ অথবা ঐতিহাসিক স্থান দেখতে আমি মোটেই পছন্দ করিনা, জন্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম্ শহরে গিয়ে দেখব কি? নতুন, পুরান কিছুই নয়, বলেই জন্ চুপ করল। আমিও বিনা বাক্যব্যয়ে তার পেছন নিলাম।

এদিকের পথের পাশে শুধু আঙুর বাগান দেখতে পেলাম না, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যেসকল ফল দেখতে পাওয়া যায় তাও প্রচুর পরিমাণে দেখতে পেয়েছিলাম। নানারূপ তরুলতাদ্বারা পরিশোভিত পথপ্রান্ত দেখে আমরা চলছিলাম। কতক্ষণ যাবার পরই পথের পাশে একটি রেঁস্তোরা দেখতে পেলাম। রেঁস্তোরা স্ত্রীলোকদ্বারা পরিচালিত। এরূপ রেঁস্তোরা আর কোথাও দেখিনি। স্ত্রীলোক যুবতী এবং একাকী। আমরা তার ঘরে প্রবেশ করা মাত্র যুবতী কাকে চাও ইত্যাদি কথা বলতে লাগল। আমি শুধু কফি এবং রুটিই চাইলাম। আমার সাথী জন্ চাইল ঘন দুধ। ঘন দুধ খেলে পেট খারাপ হবে এই ভয়ে আমি ঘন দুধ খেতাম না। আমাদের খাবার খাওয়া হয়ে গেলে যুবতী আমার পরিচয় চাইল। আমি তাকে একখানা ভিক্ষাপত্র দিলাম। ভিক্ষাপত্র খানা পড়ে যুবতী একটু হাসল এবং জন্‌কে বলল, সে ভেবেছিল আমি একজন আরব। আরবদের এদেশের স্ত্রীলোকেরা ভয়ানক ভয় করে।

একটি রেঁস্তোরা পেরিয়ে কয়েক মাইল যাবার পর আর একটি রেঁস্তোরা পেলাম, সেখানেও একটি যুবতী মাত্র রেঁস্তোরার তত্ত্বাবধান করছে। আমি জন্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম "শুধু স্ত্রীলোক দ্বারাই বুঝি এদিকের রেঁস্তোরা পরিচালিত হয়?"

"না। এখন চুপ করে চলুন। আপনার সাইকেল বেশ চলে, আমার সাইকেল হ'ল অন্য ধরনের। আমার পথ চলতে বেশ কষ্ট হচ্ছে।"

আর কথা না বাড়িয়ে ক্রমাগত তিন ঘণ্টা পথ চ'লে আমরা একটি রেঁস্তোরায় বিশ্রামের জন্য বসলাম। এই রেঁস্তোরাও একটি মাত্র যুবতী দ্বারা পরিচালিত। যুবতী জনের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তারপর কি চাই জিজ্ঞাসা করল। জন্ বোধহয় জলই চেয়েছিল।

যুবতী ঘরের পেছনে গিয়ে মাটি খুঁড়ে একটা নারিকেলের মত কি বের করে নিয়ে এল। জন্ তা থেকে জল বের করে এক গ্লাস আমাকে দিয়ে অন্য আর এক গ্লাস নিজে খেতে লাগল। আসলে তা জল ছিলনা। জলের সঙ্গে সামান্য আঙুরের জল মেশানো ছিল। এতে নেশা হয়না, শরীরে শক্তি হয় এবং পিপাসা কমে। জল খেয়ে তৃপ্ত হয়েছিলাম। অবশ্য সেজন্য আমরা দাম দিয়েছিলাম।

এবার জন্ মুখ খুলল। বলল,—পথে অনেক যুবতী দেখেছেন। তারা সকলেই বিবাহের উপযুক্ত। এরা ধর্মে সবাই মুসলমান। এরাও এক দিন পর্দার আড়ালে থাকত। কিন্তু হঠাৎ কি করে এদের মনের ভাব বদলে গেছে। এদের আত্মীয় স্বজন আর এদের পর্দার আড়ালে রাখতে পারছেনা। রাজশক্তিও এদের সহায় বলে মনে হয় না, তবুও এরা স্বাধীন ভাবেই আছে।

বেলা দেড়টার সময় আমরা শহরে পৌছি। পথের দুপাশে কয়েকটি মসজিদ দেখতে পেয়ে জন্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম, এদিকে মুসলমানদের সংখ্যা কত?

মন্দ নয়, বলেই জন্ আবার চুপ করল। আমরা আরও এগিয়ে গিয়ে একটি হোটেলে উঠলাম। সেদিন বেশ গরম পড়েছিল। স্নান করে ফেললাম তাড়াতাড়ি। তারপর গেলাম খেতে। রেঁস্তোরার মালিক হলেন একজন মুসলমান। এদিকে মুসলমানের দোকানে কেবল ভেড়ার মাংস বিক্রী হয়। পোলাও খেলাম। পোলাও আর ভেড়ার মাংস ভাজা দিয়ে যখন পেট ভরছিলাম তখন অনেক গুলি যুবতী আমার দিকে কটাক্ষপাত করছিল। তাদের রক্ত চক্ষু আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। আমি জন্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম "এরা কি চায়?" জন্ তাদের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল "তোমাদের কি চাই?" একটি যুবতী বল্‌ল "এই লোকটা কি আরব নয়?" জন্ জবাব দিল "না ইনি এক জন হিন্দু, এঁর ধর্ম ইসলাম নয়।" স্ত্রীলোকেরা যখন শুনল আমি আরব নই, তখন তাদের চোখের রক্তাভ-ভাব অনেকটা কমে গেল। একজন যুবতী কাছে এসে বসল এবং জন্‌কে জিজ্ঞাসা করল—

হিন্দু কোন দেশের লোক হয়?

কেন, সেকথা কি জাননা? হিন্দুস্থানের লোককে হিন্দু বলে, যাকে বৃটিশ বলে ইণ্ডিয়া। ইণ্ডিয়া হ'ল বৃটিশের কলোনী।

হাঁ, এখন বুঝতে পেরেছি। এ লোকটা এদেশে কেন এসেছে?

দেখবার জন্য।

দরবেশ নাকি?

দরবেশ নয়, পাদরীও নয়, পর্যটক।

মার্কোপলোর যুগ যে চলে গেছে, সেকথা লোকটা জানে কি?

নিশ্চয়ই জানে।

জন্ আরও অনেক কথা এদের সঙ্গে বলেছিল। রেঁস্তোরা থেকে বের হয়ে আসার সময় শুনলাম আমাকে বিকালের দিকে সেখানকার যুবক যুবতীরা নিতে আসবে। আমরা পথে বেশিক্ষণ অপেক্ষা না করে, হোটেলে গেলাম এবং বিশ্রাম করতে লাগলাম।

প্রগতি

প্রগতি কথাটি শুনলেই আমাদের বুক কেঁপে উঠে। কিন্তু ইউরোপের সর্বত্রই যেন প্রগতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সবাই চল্‌ছে। কি করে সেখানকার যুবক যুবতীরা এতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছে তাই ছিল ভাববার বিষয়। সেটা তুর্কীও নয় আর সোভিয়েট রুশও নয়। সেটা হল যুগস্লাভিয়া। যুগস্লাভিয়ার মুসলমান হ'ল মাইনরিটি। অথচ মাইনরিটিরাই বেশি কর্ম তৎপর। বাস্তবিকই এটা একটা আশ্চর্যের বিষয়। যুগস্লাভিয়ার রিজেণ্ট ঢোল পিটে লোক সমাজে প্রচার করেছিলেন, মাইনরিটিকে সকল রকমের সাহায্য করবেন, কিন্তু এই শহরের প্রাচীন লোকগুলিই সেকথা কান পেতে শুনত। নবযুবক আর নবযুবতীরা বলত মাইনরিটি আর মেজরিটি হল পুরাতন রাজতন্ত্রী কথা। এসব প্রচার যারাই শোনে তারাই মনে করত এই প্রচারের বেশ কিছু মানে রয়েছে। যারা এই প্রচারের কথাকে প্রশ্রয় দেয় তারা করে মারাত্মক ভুল। এরূপ মারাত্মক ভুলের পেছনে এ শহরের যুবক যুবতী ছুটতে রাজি ছিলনা।

"রাজা আমাদের সবই দেবেন"—যারা বলে তারা মূর্খ। আবার যারা রাজশক্তির উপর সকল দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজে কিছুই করেনা তারা হ'ল দেশদ্রোহী অথবা পরগাছা। ঐস্‌লামিক আইন মতে স্ত্রীলোকরা পর্দার আড়ালে থাকে, কিন্তু যদি কেউ ইচ্ছা করে সেই পর্দা পরিত্যাগ করে তবে মুস্লিম অধ্যুষিত দেশগুলিতে মারাত্মক ব্যাপার হতে পারে কিন্তু যুগস্লাভিয়ায় সে ভয় নেই। সেজন্যই সেখানকার স্ত্রীলোকরা সুযোগ এবং সুবিধার সদ্ব্যবহার করতে ছাড়েনি। আমরাও সেরূপ অনেক সুযোগ এবং সুবিধা পাই কিন্তু তার সদ্ব্যবহার করিনা। এমন কি প্রগতির নাম শুনলেই ঘাবড়ে যাই।

কে বলে রমণী অবলা? রমণী হ'ল শক্তির আধার। পুরুষের তৈরী আইন নারী সল্লায়াসে পরিত্যাগ করতে পারে। স্থানীয় পুরুষরা নারীদের পর্দার আড়ালে রাখতে বেশ চেষ্টা করেছে, এমন কি আইনেরও সাহায্য নিয়েছে, কিন্তু আইন কুপ্রথাকে প্রশ্রয় দেয়নি। নারী নরের দাসী হয়ে থাকে, যেখানে নারী নরের উপার্জনের উপর নির্ভর করে। যেখানে নারী নরের উপার্জনের উপর নির্ভর করেনা সেখানে নারী নরকে ভয়ও করেনা, তার প্রমাণ আমাদের ঘরের কাছে শিলং পাহাড়েই দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক তেমনি যুগস্লাভিয়ার রমণীরা পুরুষদের বোঁচ্‌কা না হয়ে স্বাধীন ভাবে উপার্জন করছে। পুরুষের সমান হয়েছে। জলে নামলে জল একটু ঘোলা হয়ই, যুগস্লাভিয়ার পর্দার আড়ালের নারীদের মধ্যেও সেরূপ একটু আধটু উচ্ছৃঙ্খল ভাব মাঝে মাঝে আসে বটে কিন্তু সেই মামুলী উচ্ছৃঙ্খলতা সকল সমাজেই ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তা নিয়ে গবেষণা করে লাভ নেই।

বিকাল বেলা তিনটি যুবতী এসে আমাদের তাদের বাড়িতে নিয়ে গেল। তাদের ঘরে ঢুকেই যা দেখলাম তাতে মনে হল যেন আমাদের দেশের কোনও ঘরেই প্রবেশ করেছি। তিনটা চৌকীকে একত্রে রেখে, তারই উপর কার্পেট বিছানো।

কার্পেট বেশ মোটা। দশ সের খানেক তুলা লুকিয়ে থাকতে পারে। কার্পেটের উপর আমাকে বসতে বলা হল, আমি তাতে রাজি হলাম না, কারণ কার্পেটের উপর অনেকেই দরকার বোধে জুতা নিয়েও হাটে, সে কথাটা আমি জানতাম সেজন্য একখানা চেয়ার এনে দিতে বল্‌লাম। মেয়েদের বাবা কার্পেটের উপর বসেছিলেন। তিনি প্রাপ্ত বয়স্ক লোক। হয়ত তিনি ভেবেছিলেন আমিও তারই মত কার্পেটের উপর বসব, কিন্তু যখন দেখলেন আমি কার্পেটের উপর বসছিনা তখন তিনি বললেন "কাফের"। আমি কথাটা শুনেই একটু হেসে জন্‌কে বল্‌লাম "বৃদ্ধকে জানিয়ে দিন, তার কথা একেবারে খাঁটি, এজীবনে হয়ত তিনি খাঁটি কাফের দেখেননি, এবার এক জন খাঁটি কাফের দেখে তাঁর জীবন ধন্য হোক। বাস্তবিকই কিছুরই আমি উপাসনা করিনা, আমার উপাস্য কিছুই নেই।" জন্ কি বলেছিল জানিনা, মেয়েরা এসে আমাকে অন্য একটা রুমে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল। আমিও নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম।

অন্য ঘরে গিয়ে জন্ বল্‌ল "এই শহরটিতে এসে আপনি নিশ্চয়ই সুখী হয়েছেন? জনের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম "এখানে কোন্ কোন্ জাতের লোক বাস করে?" জন্ বলল "প্রায় সকল জাতের লোকই এখানে বাস করে, তবে অন্যান্যদের মধ্যে প্রগতি এসে দেখা দেয় নি। এখানকার খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা এদের উন্নতি দেখে কেঁপে উঠেছে এবং এদের যাতে অনিষ্ট হয় তারই চেষ্টা করছে, কিন্তু এরা জলের স্রোতে গা ছেড়ে দেয়নি। বিদ্যা বুদ্ধির সঙ্গে কাজের সংযোগ থাকায়, ক্ষতির চেয়ে লাভবানই হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক প্রথায় বিদ্যাবুদ্ধি অর্জন করলে ধ্বংস হবার পথ থাকেনা। মেয়েদের সঙ্গে আমার বেশি কথা হ'ল না, কারণ জন্ দোভাষীর কাজ ঠিক মত করতে পারছিল না।

ঠিক সন্ধ্যার পর আমরা একটি রেঁস্তোরায় যাই। রেঁস্তোরাটি এক জন ফ্রেঞ্চ ভদ্রলোক হালে খুলেছেন। তাতে একটি স্টেজও ছিল। স্টেজে নাচ গান চলত, তবে হল্লা হ'ত না। হল্লা করে অসভ্য এবং বর্বর। ইউরোপেও বর্বরতা আছে তবে এরূপ ক্ষেত্রে তা হয় না। প্রায় দুইশ' ভদ্রলোক এবং ভদ্রমহিলা নীরবে খাচ্ছিলেন। কতক্ষণ পরেই একজন লোক বক্তৃতা করতে লাগলেন। তিনি বল্‌ছিলেন "বন্ধুগণ আজ যারা এখানে আরাম করে খাচ্ছেন, কাল হয়ত খেতে পাবেন না, আজ যারা ধনী বলে শান্তিতে আছেন, তাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা হয়ত এক টুকরা রুটির জন্য পথে পথে ঘুরবে তার জন্য কি ব্যবস্থা করছেন?" ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়া মাত্র রেঁস্তোরার মালিক এসে তাঁকে স্টেজ থেকে নামিয়ে ঘরের বের করে দিলেন। তৎক্ষণাৎ দুজন পুলিশ এসে তাঁকে ধরে নিয়ে গেল। আমিও জনের হাত ধরে বের হতে চলেছি, এমন সময় রেঁস্তোরার মালিক সকলকে উদ্দেশ্য করে কি বললেন। সকলেই তার কথায় আশ্বস্ত হয়ে স্ব স্ব স্থানে গিয়ে বসল। তারপরই আরম্ভ হ'ল নাচ আর গান, বেশ শৃঙ্খলতা বজায় রেখে।

জন্‌কে জিজ্ঞাসা করলাম, "এই মামুলী কথা বলার জন্য লোকটাকে ধরে নিয়ে গেল কেন?"

জন্ বলল—"এটা মামুলী কথা নয়, ইঙ্গিতে লোকটি কমিউনিজমই প্রচার করেছে। এদেশে যারাই কমিউনিজম্ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ভাবে বলবে সেই জেলে যাবে।"

এটাই হ'ল ইউরোপের বাহাদুরী, কথা বলেছ কি মরেছ, কারণ সেদেশে কথার মূল্য আছে। আমাদের দেশে আমরা সরকারদ্রোহী চীৎকার করলেও সরকারের যেমন ক্ষতি হয়না, তেমনি সর্বসাধারণের কানে কথা যায় বটে, তবে অন্য কান দিয়ে সেকথা বেরিয়ে যায়। যে দেশের লোক ঈশ্বর-প্রেমে বিভোর হয়ে পথে-ঘাটে কুকুর বিড়ালের মত মরতে পারে সে দেশে রাষ্ট্রনৈতিক কথা কানে না প্রবেশ করার সম্ভাবনাই বেশী।

এদিকে নর্তকী যখন নৃত্য করছিল তখন অন্য একটি লোক নর্তকীর হয়ে একখানা থালা হাতে করে প্রত্যেকের সামনে উপস্থিত হয়ে কিছু চাইছিল। আমরাও নর্তকীর ভিক্ষার থালায় কিছু কিছু দিয়েছিলাম। নর্তকীর নৃত্য, সামনে মদের পেয়ালা, এসব কিছুতেই রেঁস্তোরার লোকের মন পরিবর্তন করতে পারছিল না, অথচ সকলেই ধীর চিত্তে বিনাবাক্যে একটার পর একটা দৃশ্য দেখে যাচ্ছিল। গভীর রাত্রে সকলেই যখন বিদায় নিল তখন কেউ কিছু বল্‌ল না, সকলের মনেই যেন সেই লোকটির ছবি অঙ্কিত ছিল। সকলেই যেন অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য উন্মুখ হয়ে রয়েছিল।

গভীর রাতে হোটেলে ফিরে এসে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম। চিন্তাগুলি একটার পর একটা এল, তারপর আপনা হতেই যেন লোপ পেয়ে গেল। মাথাটা যেন খালি হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল। ইউরোপই বল আর এশিয়াই বল, যেখানেই লোক একটু বিদ্রোহ করে সেখানেই লোক বাধা পায়। যারা বাধা পেয়ে দমে যায় তাদেরই বলা হয় মৃত, আর যারা দমে না আরও তেজের সঙ্গে কাজে অগ্রসর হয় তারাই জীবিত। যুগস্লাভিয়ার লোক ছিল এই শেষের দলে। প্রথম মহাযুদ্ধের ঠেলা তারা সামলে নিয়ে, রাজতন্ত্রের যাতে অবসান হয় তারই দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। ইউরোপের অনেক লেখক যুগস্লাভিয়ার সে অবস্থা জেনে শুনেও কোনও কথা লিপিবদ্ধ করেন নি, ভবিষ্যতে পুরাতন কথা নতুন করে বলতে বাধ্য হবেন বলেই মনে হয়। অমিও আজ যা বলছি তা অনেক পুরাতন কথা, কিন্তু তা বলে কি হবে, নতুনকে জানতে হলে পুরাতনের সঙ্গে একটু সম্বন্ধ রাখতে হয়। আজ আমরা মার্শাল টিটো, মার্শাল চু-তে এদের নাম শুনছি, কিন্তু এদের কার্যকলাপ কি করে বিস্তার লাভ করল তার কথা কম লোকই জানে। আমি যে সময়ের কথা বলছি, তখন ক্রোটিয়ান্ মার্শাল টিটো কোন জেলে আবদ্ধ ছিলেন তা আমিও জানতে আগ্রহ প্রকাশ করিনি। এরূপ আগ্রহ না প্রকাশ করারই কথা, কারণ তখন কেউ ভাবেনি যুগস্লাভিয়া জার্মান কর্তৃক আক্রান্ত হবে এবং উত্তর যুগস্লাভিয়ায় গরিলাদল জার্মানদের হটিয়ে দিয়ে স্বাধীন ভাবে আত্মরক্ষা করতে পারবে।

তারপর বলকানের সর্বত্র ত্রস্‌কাইত এবং সাদা রুশিয়ানে ছেয়ে গিয়েছিল। কথা বলেছ কি মরেছ। পুলিশ এসে দরজায় হানা দিয়ে কোথায় নিয়ে যেত তার সন্ধানও

কেউ জানত না। ত্রস্‌কাইতদের যুগস্লাভ সরকার নাকি সাহায্য করতেন একথাটাও অনেকেই আমাকে বলেছে। অনেকে আবার লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে কমিউনিস্ট পার্টি সেজে রুশ কন্‌সালের আপিসও খুলে বসত। প্রপাগণ্ডার প্রতি প্রপাগণ্ডা চলত। অনেকে এই প্রতারকদের বিশ্বাস করে মনের কথা বলত, আর তার কয়েক দিন পরই দেখতে পেত সে জেলে এসেছে। কিন্তু ইউরোপের লোক মনের ভাব যেমন করে লুকিয়ে রাখতে পারে আমরা তেমনটি পারিনা। আমরা যখন হা করি তখনই আমাদের পেট পিঠ সবই দেখা যায়, তার একমাত্র কারণ হ'ল আমরা বাস্তবের ধার ধারি না। বাস্তবতা যখন আমরা অনুভব করব তখন আমাদেরও পেট পিঠ কেউ বুঝতে পারবে না!

পরদিন ক্রাগুজিভা (Kragujevac) শহরেই রয়ে গেলাম। গভীর রাত্রে শোবার জন্য সকালে তো ঘুম ভাঙ্গলই না, ঘুম ভাঙ্গল দুপুর-বেলা। আমরা ঠিক করেছিলাম পথে একদিন বিশ্রাম করে পরদিন বেলগ্রেদ যাব, কিন্তু এখান থেকে বেলগ্রেদ একশ' মাইলেরও বেশি। একশ' মাইল এক দিনে আমি একাই যেতে পারতাম কিন্তু আমার সাথীটি সাইকেল ধীরে চালানই পছন্দ করত। তার যেতে হবে নাই-সেড্‌। পথ তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে বলেই সে ধীরে চল্‌ত।

দুপুর বেলা ঘরেই বসে আছি, সেই সময় অন্য একজন ভূপর্যটক এসে হাজির। তার বাড়ি ছিল জেডার (Zadar)। জেডার হল যুগস্লাভিয়ার একটি বন্দর। বন্দরটি কি কারণে ইটালীর ভাগে পড়েছিল। ভার্সাই সন্ধি এমনই এক সন্ধি হয়েছিল, যাতে করে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে এসে পড়েছিল। বরদলী সত্যাগ্রহের আগে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যারা সত্যাগ্রহ ভালবাসবে না, তারা তীর্থ করতে চলে যাও। জেডারের বাসিন্দারাও সেই অবস্থা হয়েছে। জাত হল স্লাভ, ক্রট, ম্যাসিডোনিয়ান, আর শাসনকর্তা হ'ল ইতালীয়ানো। এটা কারো সহ্য হচ্ছিল না। মুক্তি পাবারও ভরসা ছিলনা, সেজন্যই জেডারের লোক পর্যটনে বেরিয়ে পড়ত। এ লোকটিও সাইকেলে করেই পথে বেরিয়েছিল। ভারতীয় পর্যটককে দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে সে এখানে এসেছিল।

বাইরে আমি একাই বসেছিলাম। আমার শরীরে এমন কোন মার্ক ছিলনা যাতে করে কেউ বুঝতে পারে আমি একজন পর্যটক, তবে শরীরের রং এবং চেহারাটা দেখেই পর্যটক মহাশয় আমাকেও বিদেশী পর্যটক ভেবে, ভাঙা ফ্রেঞ্চ ভাষায় জিজ্ঞাসা করলেন—

"আপনিই কি পর্যটক?"

"ঐ মঁশিয়ে" অর্থাৎ হাঁ মশায়।"

তখন লোকটি অসঙ্কোচে অনবরত কথা বলে যেতে লাগল। স্লাভ না ফ্রেঞ্চ কি বলছিল তার কিছুই বুঝতে পারছিলাম না, শুধু হাঁ, হুঁ করে সময় কাটাচ্ছিলাম। এদিকে জন্ বাইরে গিয়েছিল। হোটেল-মালিকও আমার কথা বুঝত না, মহা ফ্যাসাদে পড়েছিলাম। এদিকে আরও দুটি লোক এসে গম্ভীরভাবে দুখানা চেয়ার জুড়ে বসেল। উঠে গিয়ে ইংলিশ এবং এস্‌পেরেন্ত অভিধান এনে

বললাম, "আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছিনা, দয়া করে মিঃ জনের অপেক্ষা করুন।" লোকটি বসে রইল। বিকাল বেলা এল জন্। জন্ আসামাত্র লোকটি যেন অনবরত বকতে লাগল। জন্ তার কথা শুনে বলল "হাঁ পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি, তবে বেশি কথা হবে না।" বাইরে অনেকক্ষণ বসেছিলাম সেজন্য আমারও বসে থাকতে ভাল লাগল না। রুমে গিয়ে শুয়ে রইলাম। পরে শুনেছিলাম পর্যটকটি আমাদের অনুপস্থিতিতে হোটেল থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

সন্ধ্যার পর পর্যটক মশাই আবার উপস্থিত হলেন এবং সর্বপ্রথমই বললেন "দেখুন ত, এ কেমন কথা, আমাদের শহরটি ইতালীয়ানেরা দখল করে আছে।" জন্ লোকটির কথায় কি জবাব দিয়েছিল জানিনা, কিন্তু এই করেই ইউরোপে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। তুর্কীর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য দলে দলে লোক পশ্চিম ইউরোপে যেত এবং নিজেদের দুঃখ প্রকাশ করত। এর ফলও ভালই হয়েছিল। বাঘের পেছন পেছন যেমন করে এক প্রকারের দুর্গন্ধযুক্ত জানোয়ার চলে এই রকমের পর্যটকের পেছনেও নানারকমের লোক চলে। তারা কান পেতে শোনে কে কি কথা বলল। জন্ আমাকে পূর্বেই ইঙ্গিত করেছিল, আমি যেন কোন কথাই না বলি। বললে হয়ত নিজের দেশের কথা বলতে হবে, অন্যদেশের লোকের কথা শুধু শুনে যেতে হবে। এটা ছিল উপদেশ। ভবিষ্যতে দেখেছিলাম, এরূপ উপদেশের বেশ মূল্য আছে। তোমার দুঃখের কথা তুমি বল, অপরের কথা বলে কোন লাভ হবে না। ইউরোপের লোক এই নিয়মটিই সর্বত্র পালন করে। নিজের দেশের দুঃখের কথাই সর্বত্র বলে থাকে। আমাদের দেশে কিন্তু সেরূপ কিছুই নেই, এমন কি আমরা যে পরাধীন সে কথাও আমরা বলিনা। আমরা শুধু ঈশ্বরের গুণগান করেই সময় কাটাই। ঈশ্বর সর্বগুণাতীত সে কথাও বলি, অথচ সেই অজানিতের কথায় পঞ্চ মুখ হই।

পরদিন সকাল বেলা আমরা পথে এলাম। বড়ই সুন্দর পথ। পথের দুদিকে ফলভারে অবনত নানারূপ ফলবৃক্ষ। ঘণ্টা দুই চলার পর পথে একটি মাত্র যুবতী পরিচালিত কয়েকটি রেস্তোরাঁ দূরে দূরে পেতে লাগলাম। তারপর আর রেস্তোরাঁ পেলাম না। পথের দুদিকে শুধু মাঠ। মাঠে নানারূপ শস্য। তারপর আবার ফলের বাগান। ফলের বাগানের পরই এল একটি গ্রাম। গ্রামটি দেখতে বড়ই সুন্দর। গ্রামে প্রবেশ করার সময় দেখা হল কতকগুলি কৃষকের সঙ্গে। তারা সবে মাত্র ঘোড়ার গাড়ি থেকে নেমেছে। আর একটু দূরেই একটা বিয়ারের দোকান। তারা তাড়াহুড়ো করে সেদিকে ছুটল। বিয়ারের নেশায় তাদের পেয়ে বসেছিল। বিয়ার না খেয়ে তারা ঘরে যাবেনা। আমরা কৃষকদের পথে রেখেই গ্রামে পৌঁছলাম। গ্রামের বড় পথটার ওপর লম্বা লম্বা শিস্ গাছ! গাছগুলি দেখতে বড়ই সুন্দর। গ্রামের শেষ সীমায় পৌঁছে আমরা দুটি হোটেল দেখতে পেলাম। তারই একটিতে আমরা থাকবার বন্দোবস্ত করলাম।

এই গ্রামে নাকি জনের এক আত্মীয় থাকেন। হোটেলে পৌঁছেই জন্‌ বলল সে তাঁর আত্মীয়-বাড়ি যাবে এবং পরশু আমার কাছ থেকে বিদায় নেবে। এর মানেই হল, মামুলী একটা গ্রামে অনর্থক একটি দিন চুপ করে কাটাতে হবে! এতে আমার ভয়ানক রাগ হল, কিন্তু কিছুই বলিনি।

ইহুদীরা হাত পা নেড়ে কথা বলে, কারণ তাদের মনে দুর্বলতা আছে। তারা ব্যবসায়ের কথা বলে, কারণ তাদের বিদ্রোহ করার ক্ষমতা নেই। কিন্তু আজ যে ইহুদীর সঙ্গে দেখা হ'ল সে কথা বলেনা। সে চুপ করে বসে আছে, প্যালেস্টাইন যাবার জন্য নয়, বলকানে বাস করবার জন্য। এই ইহুদীর মন বড়ই শক্ত। ইউরোপে একটি ইহুদী যদি কোন অন্যায় কাজ করে তবে সর্বসাধারণ ইউরোপের সর্বত্র ইহুদী দমনে লেগে যায়। ইহুদী ভাল হ'ক আর মন্দই হ'ক সেকথা নিয়ে কেউ চিন্তা করেনা। ইহুদী হত্যা যেন একটা আমোদের বিষয়। যখন কোন ইহুদীকে হত্যা করা হয় তখন নরহত্যার জন্য দায়ী হতে হয়না, রাজদ্বারে দায়ী হতে হয় না ইহুদী হত্যার জন্য। ইহুদী মানুষের মধ্যে সর্বত্র গণ্য হয় না। যদি বলা হয় সেক্সপিয়র তার জন্য কতকটা দায়ী তবে দোষের হবেনা। দোষ যেই করুক ইহুদী হত্যা পুণ্যকাজ, এটাই ইউরোপের অজ্ঞ লোকও মনে করে!

ইহুদীদের হেটেলে স্থান দেওয়া হয়, তাদের কাছ থেকে অর্থ পাওয়া যাবে বলে। তাদের সঙ্গে ভদ্রভাবে কথা বলা হয়, সমাজ নষ্ট হবার ভয়ে। তাদের জমি দেওয়া হয়, ব্যবসা করতে দেওয়া হয় একদিন তার সোনার সংসারে আগুন দিয়ে, যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে পথে বসাতে পারা যাবে বলে। নতুবা ইহুদীর স্থান ইউরোপে কোথাও নেই।

ইহুদীরা জীবনের প্রথম থেকেই সঞ্চয়ী। যতক্ষণ পারে তারাও ঠকিয়ে যায়, ব্যাঙ্কে টাকা জমা করে। যথা সম্ভব আমোদ আহ্লাদ করে। সমাজে মিশবার চেষ্টা করে। কিন্তু সমাজ তাকে গ্রহণ করে না। দূরে রেখে তার প্রতি আড়চোখে চায় আর তাকে হত্যা করার চেষ্টা করে।

ইহুদীরা বহু ভাষাভাষী। ইউরোপের প্রায় ভাষা তারা অনর্গল বলতে পারে এবং লিখতেও পারে, কারণ তাদের ব্যবসা করতে হয়। নানা দেশের ইহুদীর সঙ্গে পত্রালাপ করতে হয়। তাদের মগজ পরিষ্কার। তাদের বুদ্ধি প্রখর, কিন্তু তাদের রাষ্ট্রনৈতিক বুদ্ধির অভাব। কেন এমন হয়? এতগুলি কথা ডেভিড (David) বিশুদ্ধ ইংলিশে বলে গেল। তারপর সে আবার চুপ করল। আমার কাছে এতগুলি কথা বলার এক মাত্র কারণ হ'ল, আমি বিদেশী, এবং ইউরোপে আমার অথবা আমার জাতের কোন স্বার্থ নাই বলেই, নতুবা ডেভ়িড কিছুই বলত না।

চেয়ারটা আরও একটু এগিয়ে নিয়ে তাকে একটা সিগারেট দিয়ে বল্‌লাম, "এখন কোন দিকে যাবেন মঁশিয়ে ডেভিড?"

"আর কোন দিকে, এই দেখুন আমার পাসপোর্ট। কোথাও যাবার স্থান নেই, এবার বলকানেই থাকতে হবে। আমেরিকাতে অনেক ইহুদী আছে, তারা ভাবে

প্যালেস্টাইনে সকল ইহুদীকে একত্র করে, সেখানে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলবে। এসব বাজে কথায় আমি নেই। কেন আমি আরব দেশে যাব। দেশটা বালু আর গরমে খাঁ খাঁ করে, সেখানে পাইন গাছ লাগিয়ে ড্রেস্‌ডেন্‌ তৈরি করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আরবী অথবা ইহুদী ভাষা জানিনা। গরম আমার সহ্য হয় না। জার্মানীতে আমার জন্ম, আমি মরতে চাই জার্মানীতে। আমার মুখের গড়ন দেখুন, কোন অংশে আমার নাক কোন জার্মান থেকে বড় নয়। আমার খাদ্য খাঁটি নরডিক খাদ্য। পূর্বদেশের খাদ্য আমি পছন্দ করি না। আমার "ছুন্নত" হয়নি, তবুও আমি ইহুদী। হিটলারকে আমি কোন দোষ দিইনা। সে কি করবে? ছোট বেলা থেকে যা শিখেছে তার প্রতিধ্বনি করছে মাত্র। আমি চাকা উল্টো দিকে চালাব। আমি বল্‌কান ছাড়বনা। প্যালেস্টাইনে যাওয়ার চেয়ে মরা এক লক্ষগুণে ভাল।"

বিদেশে পরমুখাপেক্ষী হয়ে ভ্রমণ করতে হলে উপযাচক হয়ে কথা বলতে হয়। আমার সে অভ্যাস ছিল। কিন্তু ডেভিডের সঙ্গে আমি কথা বলিনি। সে আমারই কাছে একখানা "কম্‌ফোর্ট" চেয়ারে বসে আমাকে লক্ষ্য করছিল, তারপর কি ভেবে সে নিজেই আমার সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

সোভিয়েট রুশে সকলকে থাকতে দেওয়া হয় না। ডেভিডকেও থাকতে দেওয়া হয়নি। এটা ডেভিডেরই দোষ। ডেভিড বলেছিল সে সোভিয়েটের বাইরে কাজ করবে। সেজন্যই তাকে সোভিয়েট পরিত্যাগ করতে বলা হয়েছিল। এতে ভালই হয়েছে। ডেভিডের মন আংরার মত কালো হয়ে গেছে। তার মন হতে প্রেম, ভালবাসা, দয়া সবই লোপ পেয়েছে সে যে একজন ইহুদী তা লোকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে বটে কিন্তু সে আর ইহুদী বলে পরিচয় দেয় না। জার্মান বলে পরিচয় দেয়।

এখানে এসে যখন সে জার্মান বলে পরিচয় দিয়েছিল তখন হোটেলের মালিক তার পাসপোর্ট দেখতে চান। সে নির্বিকার চিত্তে পাসপোর্ট দেখিয়েছিল। ডেভিডের পাসপোর্ট দেখে হোটেলের মালিক অট্টহাস্য করে বলেছিলেন, "এই বুঝি জার্মান? ইহুদী বলে যে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তবে তুমি গৃহহীন ইহুদী, থাকবার খাবার মত টাকাপয়সা ট্যাঁকে আছে তো?" ডেভিড অনেকগুলি যুগস্লাভ মুদ্রা হোটেলওয়ালার হাতে দিয়ে যখন জিজ্ঞাসা করছিল "এতে হবে ত?" তখন হোটেলওয়ালা মুদ্রাগুলি মনিব্যাগে সযত্নে রেখে বলেছিল "এমন ইহুদী কমই দেখা যায়"। এরূপ কথা শুনলে কার মনে আঘাত না লাগে? গৃহহারা লোকটি সকল অত্যাচারই নীরবে সহ্য করছিল আর বল্‌কানের সর্বত্র কমিউনিজম প্রচার করছিল। বলকানের লোক তা চাইত বলেই, কমিউনিজম প্রচার করাটাও তার পক্ষে সুবিধাজনক হচ্ছিল।

মানুষের মনেই আগুন প্রজ্বলিত হয়। অমানুষের তা হয় না। "ভিক্ষা দাও গো" বলতে সকলে পছন্দ করেনা। ইউরোপের লোক ভিক্ষাকে আমাদের চেয়েও ঘৃণা করে। কিন্তু ঐ যে পথের পাশে আজ দাঁড়িয়ে ভিক্ষা করছে, সে কি জন্মান্ধ? না সে জন্মান্ধ ছিলনা। প্রথম জার্মান যুদ্ধে সেপাই হয়ে সে নিজের রাজার জন্য লড়েছিল। তার

থাকা খাবার জন্য যুগস্লাভ সরকার কোন বন্দোবস্ত করেন নি। পাদ্রী এসে তাকে বলেছিল "অনেকেই ত যুদ্ধে গিয়েছিল, চোখ কম লোকেরই গেছে, তোমরা পাপী বলেই ভগবান তোমাদের চক্ষু কেড়ে নিয়েছেন। এই অন্ধ পাদ্রীর কথায় বিশ্বাস করে ধীর পদ বিক্ষেপে একটা লাঠি দিয়ে পথ অনুমান করে চলছে আর ধীরে বলছে "অন্ধকে কিছু দান কর, ভগবান তোমাদের মঙ্গল করবেন।" যারা অন্ধের মতই চক্ষু থাকতেও অন্ধ তারাই অন্ধকে দান করেছিল। আর অন্ধ এগিয়ে চলছিল নির্বিকার চিত্তে। এরূপ অন্ধ শুধু যুগস্লাভিয়ায় দেখা যায় না, ইংলেণ্ড এবং ফ্রান্সেও অনেক দেখেছি। ইংলেণ্ডের অন্ধগুলি একটি দেশলাই হাতে করে গভীর রাতেও শীতের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে। আমি এরূপ অন্ধকে দান করেছি পুণ্য অর্জন করার জন্য নয়। তাদের সহিষ্ণুতাকে বাহাদুরী দেবার জন্য এক পয়সার জন্য গভীর রাত্রে শীতের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকা কম কথা নয়। ভারতে যারা নাক ও কান ছেঁদা করে বহুরূপীর পোশাক পরে অথবা ন্যাংটা হয়ে পথে ঘাটে ভ্রমণ করে তারাও এমন কষ্ট সহ্য করতে রাজি হবে না। ভগবানের মহিমা ইউরোপের লোক যে ভাবে গ্রহণ করে প্রাচ্যের লোক সে ভাবে গ্রহণ করতে পারে না। ঐ যে অন্ধ খঞ্জ, অর্ধমৃতপ্রায় লোকগুলি ঈশ্বরের কনট্রাকটারের কথায় সন্তুষ্ট হয়ে এত কষ্ট সহ্য করে, তাদের বিদ্যা এবং বুদ্ধি সাধরণত আমাদের দেশের মধ্যবিত্তদের মধ্যে দেখা যায়। আমাদের দেশের মধ্যবিত্তেরা কিন্তু ঈশ্বরের কনট্রাকটারদের ওপর এত নির্ভরশীল নয়, মাঝে মাঝে গা মোড়া-ও দেয়! ইউরোপের লোক অনেক সময় অনেক অন্ধ বিশ্বাস সহজে পরিত্যাগ করতে পারেনা।

গ্রামে লোক ভর্তি। বিকালবেলা সকলেই সাজগোজ করে পথে বেরিয়েছে। পুরুষগুলির মুখ প্রায়ই গাম্ভীর্যে পূর্ণ। অনেকগুলি স্ত্রীলোকও যেন অশান্তির আগুন থেকে রেহাই পাবার জন্য পদচারী হয়েছে। শুধু শিশু এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের মুখেই সরলতার ছাপ। পদচারীরা সন্ধ্যা হবার পরই আপন আপন ঘরে চলে গেল। যারা সন্ধ্যার পরও বায়ু সেবন করছিল তাদের চোখে মুখে দাম্ভিকতা ফুটে উঠছিল। একজন বৃদ্ধ কি ভেবে একটা খাবারের দোকানের কাঁচের দেওয়ালে হঠাৎ তার হাতের লাঠি দিয়ে কাঁচ ভেঙ্গে দিলে। দোকানী ঘর থেকে বেরিরে এসে বৃদ্ধকে দেখা মাত্র কেঁচোর মত হয়ে গেল এবং মরা মানুষের মত দাঁত বের করে হাসতে লাগল। ইহুদী যুবক আমাকে বল্‌ল এই লোকটাই হ'ল অনেকগুলি ফার্মের মালিক। সন্ধ্যার পূর্বে যে সকল লোক পথে বেড়াতে বেরিয়েছিল অনেকেই এই লোকটার আঙ্গুর বাগানে কাজ করে। বৃদ্ধ সেলাম নেওয়া পছন্দ করে না বলেই সন্ধ্যার পর পথে বের হয়। এবার, বৃদ্ধের কাছ থেকে কিছু ভিক্ষা করে আসুন। একটুও দেরি না করেই বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বিনয় প্রকাশ করে একখানা ভিক্ষাপত্র দিলাম। বৃদ্ধ কার্ডখানা না পড়েই এক দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না, বৃদ্ধের সামনে গিয়ে বললাম "যদি তুমি বৃদ্ধ না হতে, তবে এর জন্য তোমার মুখ থেকে নিশ্চয়ই রক্ত বের হ'ত।" কথাটা বলেছিলাম আমার নিজের ভাষা বাংলায়। ইহুদী বেচারী দৌড়ে এসে আমার কাছে দাঁড়াল এবং বল্‌ল "যা বলেছেন আমাকে ইংলিশে বলুন, আমি

বুড়াটাকে স্লাভ ভাষায় বলে আসি। আমি যা বলেছিলাম তাই ইংলিশে বললাম এবং ইহুদী তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধকে তাই স্লাভ ভাষায় বলল। এবার বৃদ্ধের হুস্ হ'ল। বৃদ্ধ আমার দিকে চেয়েই হাত বাড়িয়ে দিল এবং বিড়্ বিড়্ করে কি বলল। ইহুদী যুবকের ইঙ্গিত মত আমি আবার সেই পরিত্যক্ত কার্ডখানাই বৃদ্ধের হাতে দিলাম। বৃদ্ধ একখানা সুন্দর চশমা পকেট থেকে বের করে কাগজখানা পাঠ করে আমাকে জিজ্ঞাসা করল—

তুমি, তোমার দেশে কি কাজ কর?

কিছুই নয়। (বাস্তবিক পক্ষে দেশে আমাদের কোন কাজই করতে হয় না। জমির উপসত্ব থেকেই সংসারের খরচ চল্‌ত, বর্তমানে আমাদের কি অবস্থা তা আমি জানি না)।

কিছুই নয় মানে?

এই জমি, বাড়ি আছে তার উপসত্ব থেকেই চলে।

তবে তুমি ভূম্যধিকারী?

অনেকটা তাই।

কার্ডখানার জন্য কত দিতে হবে?

যা ইচ্ছা।

তুমিও জমিদার, আমিও জমিদার, সমানে সমানে দান, এই নাও পাঁচ পাউণ্ড, তোমরা বৃটিশের প্রজা নও?

পাঁচটি পাউণ্ডের যুগস্লাভ মুদ্রার নোট পকেটে রেখে বৃদ্ধকে বললাম, বৃটিশকে আমরা আমাদের জমিদারীর পাহারায় নিযুক্ত করেছি।

বৃদ্ধ আমার সঙ্গে করমর্দন করে অন্য পথে বেরিয়ে গেল, আর আমি চাবুক মারা কুকুরের মত ইহুদী যুবকের হাত ধরে হোটেলে এসে মাথা নত করে রইলাম। কতক্ষণ পর যখন অন্তরের ব্যথা কিছুটা কমল তখন ইহুদী যুবককে জিজ্ঞাসা করলাম এদেশে কি ধনীদের কেউ সম্মান দেয় না। ইহুদী যুবক বলল "সম্মান পারত-পক্ষে ধনী অথবা রাজপরিবারকে শুধু স্লাভাই দেয়, অন্যান্য জাতের লোক ধনীদের অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করে এবং সাপের মত ভয় করে কি জানি ধনীরা কোনও কারণে চাকুরী থেকে বিদায় করে দেয়।"

বিদেশে যাবার পর অনেকগুলি ভারত সন্তানের সঙ্গে দেখা হয়েছে। তাদের আমি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করব। এক শ্রেণীর লোক হ'ল যারা মনে প্রাণেই বলে "আমরা বৃটিশ প্রজা"। অন্য শ্রেণীর লোক হ'ল আমারই মত, তারা বৃটিশ বলে নিজেকে পরিচয় দেয় না, আমি যে ভাবে বৃদ্ধকে জবাব দিয়েছিলাম সেভাবেই জবাব দেয়। আর একটি বিশেষ শ্রেণীর লোক আছে তারা কিছু মুখে না বলে প্রশ্নকারীর হাতে মদের পেয়ালা তুলে দিয়ে বলে "গুড্ লাক"।

বৃদ্ধও যে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদীদের প্রজা সে কথাটা জানতে চাইত না, কিন্তু যারা তার মাঠে কাজ করে মাথা রাখবার স্থান এবং দুবেলা অন্নের সংস্থান করত তারা তা জানত, সেজন্য বলকানের লোক পরিবর্তনের দিকে চেয়ে রয়েছিল। পরিবর্তন

আসে যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। বলকানের লোক যুদ্ধও চাইত। তখন আবিসিনিয়ার যুদ্ধ চলছিল। অনেকে ভাবছিল এ যুদ্ধ থেকেই বলকানেও যুদ্ধ আরম্ভ হবে। আমি অনেককে বলতাম গত যুদ্ধে তোমাদের অনেকেরই সর্বনাশ হয়েছে তারপরও যুদ্ধ চাও? 'নিশ্চয়ই যুদ্ধ চাই' বলে অনেকে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করত। একটি লোক আমাকে একটি ঘটনার কথা বলেছিল।

যুগস্লাভিয়ার বস্‌নিয়া প্রদেশে তার বাড়ি। শীতের সময় সেখানে এত বরফ পাত হয় যে অনেকেই দিনের পর দিন ঘরে বসে থাকতে বাধ্য হয়। আলীনফ্‌ও ঘরে বসে থাকত এবং আল্লার নামকরে সময় কাটাত। একদিন আলীনফের স্ত্রী ভয়ানক লাকড়ির অভাব অনুভব করে এবং কাছের পাইন জঙ্গল থেকে কতকগুলি লাকড়ি নিয়ে আসে। জ্বালানী কাঠের পরিমাণ দেখে আলীনফ্ সুখী হয়েছিল এবং তার স্ত্রীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছিল। সেদিন আলীনফ্ ছিল একটু অসুস্থ সেজন্য আগুনের কাছে বসে থাকা আলীনফের বেশ ভাল লাগছিল। আলীনফের একটি ছোট্ট ছেলে ছিল। সেই ছেলেটি জ্বালানী কাঠ নিয়ে খেলা করছিল। ছেলেটি জ্বালানী কাঠ কখনো বা "হার্থ"-এর কাছে ছুঁড়ে ফেলছিল আর কখনো বা দরজার কাছে আঘাত করছিল।

যে সব গাছের ডাল ছোট্ট ছেলেটি আগুনের কাছে ফেলে দিচ্ছিল তারই মধ্য থেকে লাঠির মত একটি ডাল নিয়ে যখন ছোট্ট ছেলেটি আগুনের কাছে বসে খেলছিল তখন সেই শাখাটি হঠাৎ নড়ে উঠল এবং আরও দেখা গেল মোটা দিকটা ক্রমেই সাপের মুখে পরিণত হচ্ছে। দৃশ্যটি দেখেই আলীনফ্ বুঝল ব্যাপারখানা কি? সে ছেলের হাত থেকে সেই তথাকথিত বৃক্ষশাখা কেড়ে নিয়ে ছেলেটিকে একটু দূরে সরিয়ে রাখল এবং অর্ধ সাপ অর্ধ বৃক্ষশাখাটাকে আগুনের কাছে রেখে দিল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সাপটার সম্পূর্ণ চেতনা হল এবং আলীনফের দিকে তেড়ে আসতে লাগল। আলীনফ্ অন্য একটা বৃক্ষশাখা দিয়ে সাপটাকে হত্যা করে তৎক্ষণাৎ "হার্থের" আগুনে নিক্ষেপ করল। সাপটাকে হত্যা করেই আলীনফ্ তার ছেলেকে আঁকড়ে ধরে বার বার চুম্বন করে আল্লাকে প্রশংসা করতে লাগল। এদিকে আলীনফের স্ত্রী আবার যখন কাঠ নিয়ে ঘরে এল তখন আলীনফ সকল কথা তাকেও জানাল। আলীনফের স্ত্রী সকল কথা শুনে তার স্বামীকে বলল, "দেখ এতে আর সাপ আছে কিনা, যদি থাকে তবে সাপকে আর মের না, সর্প দংশনেই আমাদের মৃত্যু ভাল। ঘরের ভাড়া, মুদির দোকানের দেনা স্তূপাকার হয়েছে। এদিকে তোমার শরীরও অসুস্থ। ফ্যাক্টরী ত স্ত্রীলোক মজুর নেয় না, এই যা হয়েছে বিপদ। মুদি এবং ঘরের মালিক যেভাবে কটূক্তি করেছে তাতে আমাদের সর্পদংশন সহস্রগুণে ভাল।" এইরূপ মানসিক কষ্ট শুধু আলীনফের স্ত্রী পাচ্ছিল না, সমুদয় বল্কানে শতকরা আটানব্বই জন সেরূপভাবেই থাকতে বাধ্য হয়েছিল। সেজন্যই তারা চাইছিল যুদ্ধ এবং যুদ্ধের ভেতর দিয়ে বিদ্রোহ,—যেমন বিদ্রোহ হয়েছিল ১৯১৭ সালে সোভিয়েট রুশিয়ায়।

বেলগ্রেদ

চলেছি রাষ্ট্র-কেন্দ্র বেলগ্রেদের দিকে। বেলগ্রেদ দেখব বলে মনে বড়ই আনন্দ হয়েছিল। সাইকেলখানা যেন আপনি চলছিল। পথের দুপাশে নানা রকম দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলাম। ঘণ্টাদুই চলার পর সামনেই প্রকাণ্ড একটি বাড়ি দেখতে পেলাম। মনে হল বাড়িটা দেখে যাই। পথের পাশে সাইকেল দাঁড় করিয়ে একটু দাঁড়ালাম। এরই মধ্যে একজন লোক এল। লোকটাকে দেখামাত্র অজানা ভয়ে ভীত হয়ে পড়লাম। লোকটা আমার কাছে এসেই কি বলতে লাগল। তাকে আমার একখানা পরিচয়পত্র দিয়েই লোকটার মুখের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। পরিচয়পত্র-খানা লোকটা পাঠ করেছিল। পাঠ সমাপ্ত করে যখন আমার দিকে তাকাল তখন আমি তার বুকের কাছে। বাংলাতেই বললাম-"কিছু দাও"। তারপর হাত দিয়ে বুঝিয়ে দিলাম ভিক্ষা চাই। লোকটা প্রথমে ভাবছিল আমাকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হবে, কিন্তু কি ভেবে পকেটে হাত দিয়ে একটা পয়সা অর্থাৎ দিশানের এক চতুর্থাংশ বের করে আমার হাতে দিল। আমি তাই ভাল করে পরীক্ষা করলাম এবং বৃচেশ-এর পকেটে রেখে, অঙ্গুলি সঙ্কেতে লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ওটা কি?" লোকটা হাত নেড়ে বলল, "ওদিকে যেয়োনা।" আমি আর অপেক্ষা না করে লোকটার হাত ধরে বললাম, "চল দু'জনে গিয়ে দেখে আসি।" লোকটা একটা ঝাঁকুনি দিয়ে আমার হাত সরিয়ে নিয়ে বল্ল, "এখানে গেলে গলায় ছুরি দেবে।" নিজের গলায় হাত দিয়ে বেশ একটু ঘসে বুঝিয়ে দিল কেমন করে কাটবে। তারপর লোকটা আর দাঁড়াল না, সে আপন পথ ধরল। লোকটা চলে গেছে দেখে মনটা বেশ হালকা হ'ল। মনের ভয় ত গেলই উপরন্তু সাহসও বেড়ে গেল। একটু দাঁড়িয়ে চিন্তা করলাম এরূপ ভয়ের কারণ কি? তৎক্ষণাৎ মনে হ'ল, সঙ্গে অনেক টাকা আছে।

কার টাকা? চোরের টাকা বাটপাড়ের হাতে পড়েছে। গেল ত বয়ে গেল! যাই দেখে আসি ওখানে কি আছে। সাইকেলটাতে তালা লাগিয়ে দিলাম, তারপর আর কোন চিন্তা না করে পরিত্যক্ত বাড়িটার দিকে অগ্রসর হলাম। এটা একটা খালি বাড়ি। অনেক দিনের পরিত্যক্ত। দেওয়ালগুলি ভেঙ্গে গেছে। তবে কয়েকটা রুম যেন এখনও ব্যবহার করা হয় বলেই মনে হল। বাড়িটার এক দিকে একটা ঝরণা। ঝরণা থেকে পেট ভরে জল খেয়ে মুখ ঘোরাতেই দেখি একটি লোক আমার পাশে দাঁড়িয়ে হাসছে। আমি তাকে কিছু না বলে তাকেও একখানা ভিক্ষাপত্র দিলাম। সে তা না দেখেই কাগজখানা পকেটস্থ করে ইঙ্গিতে বেরিয়ে যেতে বলল। বাড়ির আঙ্গিনা থেকে বের হবার সময় কতকগুলি ফুল দেখতে পেয়ে তার একটি ছিড়ে টুপিতে এঁটে নিলাম। যুবক আমার এই কাণ্ড দেখে আরও হাসল। ফুলটার আকৃতি এবং রং আমাদের কাছে সুপরিচিত। প্রত্যেক বৎসর এগারই নভেম্বর এই ধরনের কাগজের ফুল বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিক্রী হয়ে সেন্ট জন্‌স্ এম্বুলেন্সের তহবিলে যায়।

পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে যুবকের করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে করমর্দন করে সোভিয়েট কায়দায় হাত উঠাল আর আমি ত্বহাত একত্র করে ব্রাহ্ম ধরনে একটি ছোট্ট নমস্কার করলাম। আমার নমস্কার দেখে যুবক আরও হাসল তারপর জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এখান থেকে বেলগ্রেদ মাত্র পনের মাইল। পনের মাইলের মধ্যে বিদ্রোহী লুকিয়ে থাকা শাসক সমাজের পক্ষে বিপজ্জনক। বেলগ্রেদ শহরটিকে হংগেরিয়ান্‌ এবং অষ্ট্রিয়ান্‌রা প্রথম জার্মান যুদ্ধের সময় অনেকটা ধ্বংস করেছিল। শহরবাসীও পালিয়ে গিয়েছিল। যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা ফিরে আসেনি। ক্ষুধায় এবং রোগে মরেছিল। মরা মানুষ ফিরে আসেনা। ইউরোপের লোক পুরাতন সম্পত্তি নিয়েও বিবাদ করেনা, সেজন্যই বেলগ্রেদের আশে পাশে অনেকগুলি পুরাতন ইমারত অব্যবহৃত হয়েই পড়েছিল।

শহর তখনও পাঁচ মাইল দূরে। ক্রমেই ট্রাফিক বেড়ে চলছিল। নানা রকমের গাড়ি শহরের দিকে, একের সঙ্গে অন্যে প্রতিযোগিতা করে চলছিল। রকম রকমের মোটর গাড়ি পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়, কিন্তু ছোট ছোট ঘোড়ার গাড়ি দেখে তৎক্ষণাৎ কলকাতার ঘোড়ার গাড়ির কথা মনে হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ঘোড়াও আমি দেখেছি, কিন্তু বেলগ্রেদের আশ পাশের ঘোড়ার মত কোন ঘোড়া ভারতে দেখা যায় না। ভারতের ঘোড়ার মধ্যে পরিষ্কার ভাবে ত্বটি শ্রেণী দেখতে পাওয়া যায়। একটি শ্রেণী হ'ল অভুক্ত এবং পরিশ্রমে কাতর, অন্যটি হ'ল অতিযত্নে রক্ষিত। অতিযত্নে রক্ষিত ঘোড়াগুলি দেখতে যেমন স্থন্দর, তেমনি অভুক্ত অযত্নে রক্ষিত ঘোড়াগুলি দেখতে মোটেই ভাল লাগেনা। এখানকার ঘোড়া সেরূপ নয়। ঘোড়াগুলি দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছা হয়। চার চাকার গাড়ি ত্বটো শক্তিশালী ঘোড়া টানছে বটে কিন্তু ঘোড়াগুলি গরুর মতই ধীরে ধীরে চলছে। অশ্বচালকগণ ইচ্ছা করলেই ঘোড়াগুলিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে পারত, কিন্তু তা তারা করেনি। আমাদের দেশে কিন্তু বিপরীত দৃশ্য দেখা যায়। জীবজন্তুর প্রতি জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে অত্যাচার করাই হল আমাদের অভ্যাস।

অনেকগুলি ঘোড়ার গাড়ি একটার পর একটা চলছিল। প্রত্যেক গাড়িতেই নানারূপ দ্রব্য বোঝাই ছিল। ডায়রী-ফার্ম শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত থাকে। শহরের লোকের ব্যবহারের জন্য গাড়ি বোঝাই করে ত্বধ নিয়ে যাচ্ছিল। বেলগ্রেদে পৌঁছবার কয়েক দিন পর ইচ্ছা হল, ডায়রীফার্ম থেকে ত্বধ আসার পর ত্বধের ফ্যাক্টরী কিরূপে গ্রহণ করে তা দেখব। ত্বধ আসামাত্র ত্বধের বড় বড় টিনগুলি ঘরের ভেতর গেল, তৎক্ষণাৎ ত্বধের টিনটাই একটা ছোট যন্ত্রের মুখ দিয়ে ঢেলে দেওয়া হয়। ঐ যন্ত্রটির সাহায্যে ত্বধ পরিষ্কার করে তা থেকে ক্রীম বের করা হয়। আরও অনেক কিছু করা হয়। সংবাদ নিয়ে জানলাম,যুগস্লাভিয়ার কোথাও ত্বধে জল মেশানো হয় না কোন অবস্থাতেও নয়। বাস্তবিকই অনেকক্ষণ বসে ভাবছিলাম, তবে আমাদের দেশে এসব হয় কেন ?

ইহুদী বন্ধুর অনুগ্রহে অনেক কথাই শোনা হয়েছিল। ভাবছিলাম আরও শুনব কিন্তু ইহুদী বন্ধু সকালবেলা উঠেই আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। জন্ আসবে কি আসবে না তা নিয়েও বেশ চিন্তা হল। হোটেলওয়ালা আমার চাল চলন দেখে ক্ষেপে গিয়েছিল। বৃদ্ধ ছিল হোটেলের মালিক। রাত্রের মধ্যেই সকলে জেনে গিয়েছিল, শহরের সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী আমার দ্বারা অপমানিত হয়েও আমাকে সাহায্য করেছে। সকলেই যেন লাল চক্ষু করে আমাকেও ধনীদের শ্রেণীতে ফেলতে চাইছিল। আমি বিষয়টা বুঝেও চুপ করে রইলাম। চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। দুঃখের বিষয় পড়বার মত একখানাও বই ছিল না। যদি থাকত তবে সেদিনটা ঘর থেকে বেরই হতাম না। এদিকে ইংলিশ বই অথবা সংবাদপত্র কিনতে পাওয়া যায় না। কি আর করা যায়, আমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধে একটি প্রেস কাটিং থাকত, তাই দেখতে লাগলাম। তবুও যেন মনে হচ্ছিল এ গ্রামে আর থাকা উচিত হবে না।

দুপুরবেলা খেয়ে শুয়েছিলাম। ঘুম এসেছিল, এমন সময় কে দরজায় মৃদু করাঘাত করল। দরজা খুলে দেখি জন্ এসেছে। এসেই বললে, "চলবেন চলুন, আমি আর আপনার সঙ্গে চলতে পারব না, এরই মাঝে আমাকে পালাতে হবে, পুলিশ এই এল বলে।" আমি বিছানায় বসেই বললাম "আমি কেন পালাব, আমি দেশ ভ্রমণে এসেছি। তোমাদের মত পলাতকের সঙ্গে চলাও আমার অন্যায় হবে। তোমার সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ। আমি এখান থেকে (Sylajnac) স্‌ভিলাজ্‌নক হয়ে বড় পথ ধরব এবং সেপথেই বেলগ্রেদ যাব, যদি পার ত পথে দেখা করবে। জন্ আর কোন কথাই বললেন না শুধু সাইকেলটা ঘরের পিছন দিকে বের করে আমায় করমর্দন করেই বিদায় নিল।

রুমে এসে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। ভাবছিলাম একেই বলে স্বাধীনতা আর এরই নাম ডেমক্রেটিক সরকার। আমরা না হয় পরাধীন, আমাদের প্রতি বিদেশী শাসক মর্জিমত লাঠি চালাতে পারে, কিন্তু এটা ত স্বাধীন দেশ, এখানে এমন হয় কেন? য়াক্‌গে সেসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই, আজ রাতটা এখানে থেকে কালই বিদায় নিতে হবে। ঘুম আর হল না। বাইরে গিয়ে একটা রাস্তায় বসে ঘন দুধের অর্ডার দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আকাশ মেঘশূন্য ছিল। ভাবপ্রবণতার মোহে মনে মনে বলতে লাগলাম, আকাশেই বোধ হয় শান্তি বিরাজ করে। মাটিতে শান্তি নেই, আকাশে পাখী হয়ে বাস করাই ভাল। ভাবপ্রবণতার শেষ হয়ে গেল। মনে হল বাজপাখী আর পায়রার কথা। অমনি মুখ ফিরিয়ে পাশে যারা বসে ছিল তাদের দিকে তাকাতে লাগলাম। যারা বসে ছিল তাদের কারও মুখে হাসি নেই। সকলেই হাসতে যাচ্ছে কিন্তু পেরে উঠছে না। রেঁস্তোরায় বসতে হলে টাকাপয়সার দরকার, সকলের পকেটে কি তা আছে? নিশ্চয়ই নাই। অনেকক্ষণ তাই ভেবে যখন হাঁপিয়ে উঠলাম তখন ধীরে ধীরে আবার রুমে এসে শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন সকাল বেলাই পথে বেরিয়ে পড়লাম। পথ ছিল মসৃণ। পথের ওপর সবেমাত্র য়্যাস্‌ফাল্ট দেওয়া হয়েছে। পথের দুপাশে সুন্দর ফলের বাগান। ফল অপক্ক।

ফলগুলি দেখে পথ চলতে লাগলাম। পথে অনেকেই আমার দিকে চাইছিল, আমিও তাদের দিকে চাইছিলাম।

বেলা দশটার সময় একখানা গ্রাম এল। গ্রামে বড় বড় রেঁস্তোরা এবং পান্থশালা। গ্রাম দেখেই মনে হল এখানে আরব এবং মোগলদের সভ্যতার ছাপ রয়েছে। তবে এরই মাঝে ছোট ছোট ঘর এবং তাতে ছোট ছোট দইএর দোকান দেখে একটু সুখী হলাম। চার্চ একটিও ছিল না। মসজিদও দেখতে পেলাম না। একটি দোকানে বসে সামান্য জলযোগ করে আবার রওনা হলাম।

বেলা দেড়টার সময় হঠাৎ রেল লাইন দেখতে পেলাম। রেল লাইন দেখতে পেয়েই মনে বেশ আনন্দ হল। তারপরই মনে হ'ল যাদের টাকা পয়সা আছে তারাই রেলগাড়িতে বসে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যায়। গরীবের জন্য রেলপথ নয়। রেল লাইনটা ডিঙ্গিয়ে গিয়ে একখানা খাবারের দোকান পেলাম এবং তাতে বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। খাবারের দোকানে—অনেকগুলি লোক বসেছিল। ইত্যবসরে একজন সাইকেল টুরিস্ট এসে ঘরে প্রবেশ করল। কেউ তার দিকে চাইলনা। লোকটির শরীরে কিছুই ছিলনা। পরণে ছোট্ট একটা হাপ প্যাণ্ট আর পায়ে স্যাণ্ডেল। সাইকেলের পেছনে একটা কড়াই বাঁধা ছিল। আমি টুরিস্টকে ডেকে কাছে বসালাম এবং জানালাম, আমিও একজন পর্যটক। ভারতবর্ষ থেকে সাইকেলে করে এসেছি। সে তার পরিচয় দিল এবং জানাল, সে একজন জার্মান্। শীত আসবার পূর্বেই সে সমস্ত বল্‌কান বেড়াতে চায়। তার শরীরে কিছুই না থাকবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় জানিয়েছিল, সূর্য কিরণে অবগাহন করতে সে পূর্বদেশে এসেছে। সঙ্গের কড়াইএ পাক করে এবং পুটুলিতে শোবার জন্য উত্তম বিছানা বাঁধা আছে।

বলকান্ জার্মানদের কাছে পূর্বদেশ। পূর্বদেশের সূর্য-কিরণ তাদের পক্ষে আরামদায়ক এবং স্বাস্থ্যবর্ধক। দ্বিতীয় কথা হল এরূপ খালি হাতে জার্মান্, বৃটিশ অথবা খাস ইউরোপের লোকই চলতে পারে! বল্‌কানের লোক সেরূপ পারেনা, কারণ এটা হল মিশ্র সভ্যতা! জার্মানদের হল খাঁটি নরভিক সভ্যতা। জার্মান যুবক দক্ষিণ দিকে রওনা হল আর আমি তার বিপরীত দিকে রওনা হলাম।

বিকালের দিকে স্‌ভিলাঙ্গ্‌নক পৌছে একটি হোটেলে গিয়ে উঠলাম। হোটেলটি বড়ই সুন্দর। নাম তার টলস্টয় হোটেল। স্থানীয় কতকগুলি যুবক এই হোটেল পরিচালনা করে। এখানে সিগারেট খাওয়ার নিয়ম নাই, তবে রুমে বসে সিগারেট খাওয়া চলে। টলস্টয় হোটেলগুলিতে দু'রকমের লোক দেখতে পেলাম। একদল হল নীরব আর অন্যদল হল গোপনীয় পুলিশ। এখানে যারা আসে যায় গোপনীয় পুলিশ তাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখে। যারা নীরব তারা কিরূপ লোক তা নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা, কারণ আমায় সঙ্গে কেউ কথা বলত না। বিকাল বেলা শহর দেখতে বের হয়েছিলাম এবং ভিক্ষাও করেছিলাম। শহরে বের হয়ে মনে হ'ল এখানে যেন বল্‌কানের ছাপ নাই। অধিবাসী প্রায়ই ক্রট এবং ক্রটদের দেখতে

স্কচম্যানদের মতই দেখায়। লোকগুলি বড়ই সরল প্রকৃতির। ইংলিশ এবং ফ্রেঞ্চ প্রায় লোকই বলতে পারে। আমার সঙ্গে কয়েক জন ক্রটের কথা হয়েছিল। তারা যুগস্লাভিয়া থেকে পৃথক হয়ে স্বাধীন রাজ্য গঠন করতে চায়। ক্রটদের মাঝে বিদ্রোহ হয়েছিল এবং বিদ্রোহে ক্রটরা কৃতকার্যও হয়েছিল। কিন্তু বিদেশাগত সেপাইদের সঙ্গে তাদের লড়াই করার ক্ষমতা ছিলনা বলেই তারা পরাধীনতা স্বীকার করে। একজন ক্রট বলে "মহাশয়, আপনারা এ সম্বন্ধে কি করছেন?" আমি কথা না বাড়িয়ে বললাম, "এসব বলাকওয়ার বিষয় নয়।" লোকটি এসম্বন্ধে আর কিছুই বলেনি।

টলস্টয় হোটেল আমার পক্ষে সুবিধাজনক হয়ে উঠলনা, সেজন্য অনেকগুলি ইংরিজী জানা লোক পেয়েও স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হলাম।

সন্ধ্যার পূর্বে বেলগ্রেদে পৌঁছেই একটি পুলিশ স্টেশনে যাই এবং পুলিশের সাহায্যে হোটেল ঠিক করি। এটা হল রাষ্ট্রকেন্দ্র, এখানে নানা রকমের লোক থাকে। এখানে বিপদে পড়বারও বেশ সম্ভাবনা আছে, সেজন্যই পুলিশের সাহায্যে হোটেল ঠিক করেছিলাম। পুলিশের পাহারা সকল হোটেলেই থাকে। কলনিয়েল দেশ, সাম্রাজ্যবাদী অধ্যুষিত দেশ এমন কি সোভিয়েটে ও বিদেশাগত লোকের প্রতি বেশ দৃষ্টি রাখা হয়। যারা মনে করে হোটেলওয়ালা তাদের বন্ধু, তাদের মত গণ্ডমূর্খ পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি নেই। এই নিয়মটি শুধু ইউরোপে প্রযোজ্য নয়, এই নিয়ম পৃথিবীর সর্বত্রই চলে।

আমাকে একখানা সুন্দর হোটেলে নিয়ে যাওয়া হ'ল। হোটেল মালিক গম্ভীর প্রকৃতির। পুলিশ বিদায় হবার পরই হোটেল মালিক আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করল "বৃটিশ ইন্‌টেলিজেন্‌সিয়া?" অর্থাৎ আমি বৃটিশের গোপনীয় পুলিশ কিনা? আমি হোটেলওয়ালাকে আমার পরিচয়পত্র দেখালাম এবং অটোগ্রাফ বইটা দেখবার জন্যে বের করে দিলাম। লোকটি আমার অটোগ্রাফ বইটা দেখেই বল্‌ল 'তোর-দু-মন্দে' অর্থাৎ পর্যটক? আমি মাথা নাড়লাম। লোকটি অনেক আফশোষ করে বিদায় নিল। তার আফশোষের মর্মার্থ হল, মামুলী পর্যটকের পেছনেও পুলিশ লেগেছে। হোটেলের মালিক পুলিশের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না অথচ সে ছিল পুলিশের একজন "একান্ত বাধ্য চাকর!" ইউরোপের বিশেষত্ব হ'ল এইখানে। পুলিশের সাহায্যে বড় হয়েও নিজের মনের পরিবর্তন হয় না, অনেক পুলিশও ঠিক সে রূপই। তারাও 'একান্ত বাধ্য চাকর' হয়েও ভেতরে ভেতরে বিদ্রোহী। কখনও নিমক হালাল করার কথা ভাবেও না। তারা ভাবে কাজ করছি, কাজের পরিবর্তে মাইনে পাচ্ছি' এতে আর নিমক হালালের কথা কি?

সেদিন ছিলাম পরিশ্রান্ত। হোটেলের বয়কে ডেকে রেস্তোঁরা থেকে কিছু খাবার কিনে এনে দিতে বলায় সে তৎক্ষণাৎ খাবার কিনে এনে দিয়ে কাছে বসে রইল। আমি হাতমুখ ধুয়ে খেতে বসবার সময় তাকেও কিছু খেতে বল্‌লাম। কি ভেবে সেও আর এক জোড়া কাঁটা চামচে এনে আমার সঙ্গে খেতে বসল এবং খেলও বেশ।

খাওয়া শেষ করে সে বাইরে গেল এবং আধ ঘণ্টার মধ্যে একটা সাদা জিনিস এনে আমার হাতে পায়ে মালিশ করে দেওয়ায় আমার হাত-পা-ব্যথা একদম চলে গেল। সেদিন রাতে ঘুম হয়েছিল বেশ ভালই।

ঘুম থেকে উঠেই দেখি বয় গরম জলের ব্যবস্থা করে রেখেছে। অনেকদিন স্নান করিনি, সেজন্য স্নান করে নিলাম। স্নান করা মাত্র বেশ ক্ষুধা হল এবং বয়কে সঙ্গে করে একটি রেঁস্তোরাতে গিয়ে কিছু খেয়েই যে দিকে ব্যবসা বাণিজ্য হয় সেদিকে বয়কে নিয়েই রওনা হলাম। বয় আমাকে সর্বত্র গাইড করে নিয়ে যেতে লাগল। কয়েকটি সংবাদপত্র অপিসেও গেলাম, কিন্তু আমাকে কেউ জিজ্ঞাসাও করল না আমি কে? কেন জিজ্ঞাসা করল না তা আমি বুঝলাম, কিন্তু বয় বুঝল না। সে এ ঘর সেঘর করে বেড়াতে লাগল, অনেককে আমার গুণগরিমা বলতে লাগল কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি সকলের মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল।

স্বাধীন এবং পরাধীন এই দুই শব্দের অর্থ বোঝা বড়ই কষ্টকর। আমরা মনে করি ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশই স্বাধীন এবং হালে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ হয়ে গেল, তাতে অনেক দেশকেই শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু সুভাষ বসু স্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্য যখন ইউরোপ গিয়েছিলেন তখন চেকোস্লভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, হংগেরী ইত্যাদি দেশের সংবাদ-পত্রে তার নাম বের হয়নি। অনেক সম্পাদক আক্ষেপ করে আমাকে সে কথা বলেছিলেন। তারা ত স্বাধীন দেশের স্বাধীন সংবাদপত্রের স্বাধীন সম্পাদক ছিলেন। তাদের এই দুর্দশা কেন? এক কথায় তার উত্তর হল "প্রাধান্যের প্রভাব", যাকে অন্য ভাষায় বলা হয় "হেজিমণী"। যে সকল দেশে তখনকার দিনের সুভাষ চন্দ্রের নাম পর্যন্ত ওঠেনি, সেই দেশগুলিতে আমার মত চুনোপুটির নাম ছাপিয়ে সংবাদপত্র বিপদ টেনে আনতে রাজি ছিল না। সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণ জানত কার নাম ছাপতে হবে এবং কাকে এড়িয়ে যেতে হবে।

আমি যদি বিডন পাওলের বয়েজ স্কাউট সেজে বিদেশ ভ্রমণ করতাম তবেই বেশ ভাল হ'ত। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলছি, এসব পল্টনী পোশাকে সজ্জিত লোকের সঙ্গে জনসাধারণ মোটেই মিশতে চায় না। আমি একদিকে যেমন করে কিছুটা ক্ষতি স্বীকার করছিলাম অন্যদিকে তেমনি লাভবানও হচ্ছিলাম। সর্বসাধারণ আমার সঙ্গে মিশছিল, তাদের মন খুলে ধরছিল আন্তরিক সাহায্যও দিচ্ছিল। কাবুল শহরে পৌঁছবার পূর্বে তিনজন পারসী পর্যটক সেখানে গিয়েছিলেন। তাঁরা তাঁদেরই জাতভাই একজন লোকের সঙ্গে থাকতেন এবং বড় বড় অফিসারদের বাড়িতে গিয়ে ভিক্ষা করতেন। তাদের ছিল পল্টনী পোশাক। তাদের দিকে সাধারণ লোক চেয়ে থাকত। কথা মোটেই বলত না। পর্যটক মশাইরা সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশতে চাইতেন না। তাঁরা যখন ক'লকাতা এসেছিলেন তখন তাঁরা আমাকে তাদের অভিজ্ঞতা পূর্ণ একখানা বই দেন। তাতে দেখতে পেয়েছিলাম, আফগানিস্থান সম্বন্ধে তাঁরা মাত্র দুই পাতা লিখেছেন। লেখবার মত তাঁদের কিছুই ছিল না, কারণ তাঁরা সর্বসাধারণের সঙ্গে মিশতে সক্ষম হননি। বেখাপ্পা পোশাক সাধারণ লোক

মোটেই পছন্দ করে না। সেজন্য আমি মামুলী পোশাকে আবৃত হয়ে মামুলী লোকের সঙ্গে মিশতে সক্ষম হতাম।

হোটেলে ফিরে আসার পর বয়টি দৌড়ে গিয়ে ম্যানেজারের কাছে সকল কথা বলল, তারপর ম্যানেজারও চটপট করে রুমে এসে আমাকে বললেন "এই ইংলেসী" অর্থাৎ ইংলিশ বোঝেন? 'হাঁ,' বলে মুখ ফিরিয়ে বসলাম। তারপরই ম্যানেজার তার নিজের রুম থেকে একটা ইংলিশ দৈনিক এনে দিয়ে ইঙ্গিতে বললেন "পরুন্থু"। লক্ষ্য করে দেখলাম, বয় এবং ম্যানেজার আমার জন্য কি করবে তা ঠিক করে উঠতে পারছে না। ম্যানেজার আমার রুমে কতক্ষণ বসে থাকার পর একখানা কাগজ লিখে বয়ের হাতে দিল এবং বুঝিয়ে দিল এই কাগজের টুকরা যেন কারো হাতে পথে খোয়া না যায়, অথবা অন্য লোকের হাতে গিয়ে না পড়ে। বয়টি এবার অন্য মূর্তি ধারণ করল। তার মনের সকল উদ্বিগ্নতা যেন নিমেষে চলে গেল। সে শান্তভাবে রুম হতে বের হয়ে পথে নেমে গেল। আমি ভগ্নমনে লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকায় মনোনিবেশ করলাম।

সে দিন দুপুরে বাহিরে যাইনি। হোটেলের ম্যানেজার তাঁর নিজের বাড়ি থেকে খাদ্য পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। খাবার খেয়ে যখন লণ্ডন টাইমস্এর বিজ্ঞাপন দেখছিলাম তখন হঠাৎ কে এসে দরজায় টোকা দিল। দরজা খুলে দিয়ে দেখি বয় এবং অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। বয় ঘরে প্রবেশ করেই একখানা কাগজে একটা ছবি এঁকে আমাকে বুঝিয়ে দিল নবাগত লোকটির সঙ্গে আমি প্রাণ খুলে কথা বলতে পারি। তিনি পুলিশের লোক নন্।

বয়ের কাজে বৃদ্ধও নিযুক্ত হয়, ছেলেও নিযুক্ত হয়। লক্ষ্য করে দেখছি যখনই কোন আনাড়ী লেখক বিদেশী ভাষা অনুবাদ করেন, তখন বয়ের বাংলা ছোকরা লেখেন। বিষয় বস্তুতে অপরিচয় থাকলেই এরূপ ভাবে লেখা যায়, কিন্তু আমি যে বয়ের কথা বলছি সে বয়সেও ছেলে ছিল। ছেলেটী ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সময় মুখে হাত দিয়ে কী একটা শব্দ করে বেশ আনন্দ প্রকাশ করল এবং তারপরই জানাল ঘরের ভেতর থেকে যেন তালা বন্ধ করে দেই, যদি কেউ আসে তবে সেই বাইরে দাঁড়িয়ে বলবে আমি রুমে নেই। সে দরজার কাছেই কোথাও থাকবে এবং লক্ষ্য রাখবে পুলিশের যাতে আমাদের কথায় বিঘ্ন জন্মাতে না পারে।

নবাগত ভদ্রলোক একজন ইংলিশ জানা স্লাভ। তিনি হলেন রাজার জাত। রাজার জাতের লোক হয়েও তিনি রাজদ্রোহী। ভ্রমণ করবার সময় আমাকে সকলের সঙ্গেই কথা বলতে হয়েছে, এবং পৃথিবীর সকল পর্যটকই তাই করে। আমিও কেন তা থেকে বাদ যাব? নবাগত ভদ্রলোক বললেন—

আপনি কি সংবাদ-পত্র আপিসে গিয়েছিলেন?

হাঁ।

সংবাদ-পত্র আপিসের কেউ আপনার সঙ্গে কথা বলেনি?

না।

কাল আবার চেষ্টা করবেন। এই ছেলেটিই আপনাকে আমার পরিচিত একজন ইংলিশ জানা ভদ্রলোকের কাছে নিয়ে যাবে। তিনি কি বলেন তা আমাকে বলবেন। আজ বিকালে কি ভিক্ষায় বেরুবেন?

হাঁ।

ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন, সে যে যে রেঁস্তোরায় নিয়ে যায় সেখানেই যাবেন অন্যত্র যাবেন না। হয়ত আপনার পরিচিত কোন লোকের সঙ্গে দেখাও হতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। তারা এখানেই আসবে। এই ছেলেটি হ'ল আপনার বন্ধু, সে আপনাকে বেশ ভালবাসে। যতদিন বেলগ্রেদে থাকবেন ততদিন এই ছেলেটিই আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে। এখন আসি তবে?

আসুন, বিকালে কি আপনার সঙ্গে দেখা হবে?

হাঁ, হবে। রাতে এসে আপনাকে নিয়ে যাব।

এই বলেই ভদ্রলোক বিদায় নিলেন। আমি মনে মনে হেসে ডায়েরিতে লিখলাম, একেই বলে চোরের উপর বাটপাড়ি। তবে এরা সাহসী বটে। সাহসী বলেই তারা স্বাধীনও হবে।

বেলা বোধ হয় পাঁচটা হবে। দলে দলে লোক পথে হাওয়া খেতে বের হয়েছে। কেউ ট্রামে, কেউ বাসে করে শহরের বাইরে চলে যাচ্ছে। আবার বাইরের লোকও শহরে আনন্দ করার জন্য এসেছে। আমার মত নবাগতকে দেখে অনেকেই কথা বলতে চেয়েছিল। আমি কে জানবার জন্য কৌতূহল প্রকাশ করছিল কিন্তু বয়ের সাহায্যে আমি সকলকে এড়িয়ে চলেছিলাম। আমরা যাব বড় একটি রেস্তোঁরায়। পথে যত পুরুষ দেখলাম তাদের কোটের "কাট্" ইংলিশ নয়। ইংলিশ কাটে "সোল্ডার"-গুলি তেমন "সার্প" হয় না। কিন্তু বল্‌কানের লোকের কোটের কাট্ দেখে মনে হয় এদের প্রত্যেকেরই বুক চওড়া এবং সেজন্যই ঘাড়ের দুদিকটা-ও বেশ প্রশস্ত। আসলে তা নয়, কোট কাটবারই বাহাদুরী বলতে হবে। বল্‌কানে পোশাকের ভিতর দিয়েও যেন আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পেয়েছে। জার্মানী, ফ্রান্স ইংলণ্ডে সেরূপ কিছুই নেই, সকলেই যেন নিরীহ গোবেচারী!

তাড়াতাড়ি করে রেস্তোঁরায় বসেই দুজনে বেশ করে খেয়ে নিয়ে প্রায় দু'শ ভিক্ষাপত্র বিতরণ করলাম। একটি-ও চেনা মুখ চোখে পড়ল না। রেস্তোঁরা থেকে আমাদের দেশের ছাব্বিশ টাকার মত চাঁদা উঠিয়ে বের হয়ে যাব এমন সময় বয় বলল 'একটা লোক কথা বলতে চাইছে, এদিকে আসুন।' তার সঙ্গে এগিয়ে গেলাম। ঘরের ঠিক মাঝখানে একজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনিই আমাকে ডেকেছিলেন। তাঁর কাছে যাওয়া মাত্রই আমাকে বসতে দিয়ে বললেন—

এখানে কবে এসেছেন?

গত পরশু।

সংবাদ-পত্র অপিসে গিয়েছিলেন?

হাঁ।

কেউ কথা বলেনি ?

না।

আপনি আর সেদিকে যাবেন না, আপনার নাম সংবাদ-পত্রে উঠবেনা। এতে আপনার ক্ষতি হবেনা, ক্ষতি হবে এদেশেরই। এখানে কতদিন থাকবেন ?

দু সপ্তাহ।

এত দেরি করে কি লাভ হবে ?

অনেক কিছু দেখব ভেবেছি।

কি কি দেখবেন ?

রাজবাড়ি, পার্লামেণ্ট, আশেপাশের বাগিচা, থিয়েটার, সিনেমা, মজুর ঘর ইত্যাদি।

হাঁ তাই করবেন, তবে প্রত্যেক দিনই চার পাঁচটা করে রেস্তোঁরায় যাবেন, এতে অনেক লোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে।

ভদ্রলোকের কথায় মনে বেশ আনন্দ হয়েছিল, কারণ আমার উপকারের জন্য এই পৃথিবীতে এমনও লোক আছে যারা অযাচিত ভাবেই অগ্রসর হয়ে আসে! সেদিন রাতে আরও তিনটি রেস্তোঁরা বেড়িয়ে এসে বইয়ের দোকানে গিয়েছিলাম। অনেকগুলি দোকানে হানা দেবার পর একটি দোকানে কয়েক কপি পুরোনো মডার্ণ রিভিউ দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ দু'কপি কিনে ফেললাম। সেই দোকানেই লণ্ডনের ডেলি হেরাল্ডও দেখতে পেয়ে একখানা কিনে দোকানীকে জিজ্ঞাসা করলাম—'এখানে আর কোনও প্রগ্রেসিভ সাহিত্য কিনতে পাব কি ?' দোকানী পরিষ্কার ইংলিশে বলল "এদেশে কোনরূপ প্রগেসিভ সাহিত্য বেচা কেনা আইন বিরুদ্ধ। আপনি এখানে এই যা করেছেন তাই যথেষ্ট।"

যুগস্লাভিয়ায় তখন একটি মুভমেণ্ট চলছিল, সেই মুভমেণ্টটির নাম হল এন্‌টি এস্‌পেরেন্ত। প্রকৃত পক্ষে আমিও এস্‌পেরেন্ত ভালবাসতাম না, সেজন্য এন্‌টি এস্‌পেরেন্ত মুভমেণ্ট আমার কাছে বেশ ভাল লেগেছিল। ভাবছিলাম একদিন এই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে এসম্বন্ধেই একটা লেকচারের বন্দোবস্ত করব। কিন্তু যখন আমার বন্ধুরা বললেন এতে আমার দেশের বদনাম হবে তখন বিষয়টি একেবারে পরিত্যাগ করলাম। দেশের মঙ্গলার্থে অনেক সময় প্রিয়বস্তুকেও পরিত্যাগ করতে হয়। সেদিন রাত্রে আমাকে নেবার জন্য কেউ আসেনি। দুপুরে যে ভদ্রলোক এসেছিলেন তাঁর সঙ্গে পরে দেখা হয়েছিল, তিনি আমাকে দুঃখ করে বলেছিলেন, তাঁকে কাজ করতে হয়। গত কয়দিন যাবৎ তিনি এতই কাজে ব্যস্ত ছিলেন যে এদিকে আসবার ফুরসুৎ তাঁর মোটেই হয়নি। এই ভদ্রলোক আমাকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি ছোট্ট সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের অপিসে গিয়েছিলেন। সেই সংবাদপত্রগুলি আমার সংবাদ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখেছিল। যদিও সাপ্তাহিক গুলির প্রচার অতি কমই ছিল কিন্তু তাতে ফল হয়েছিল খুব বেশি। হংগেরীতে যাবার পর এক সব্জী বিক্রেতা আমাকে দেখেই চিনতে পারে এবং তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে যুগস্লাভিয়ার সাপ্তাহিকের উদ্ধৃত বিষয় আমাকে দেখায়। শুধু তাই নয়, হংগেরীতে ভ্রমণ করবার সময় যাতে

আমার কোন কষ্ট না হয় তারও ব্যবস্থা করে। চেকোশ্লোভাকিয়াতেও সেরূপ সম্বর্ধনা পেয়েছিলাম। এই ছোট খাটো সাপ্তাহিকগুলি দরিদ্র, দরিদ্রের জন্যই তা প্রকাশ হ'ত। গরীব লোকও তা আগ্রহ সহকারে পড়ত।

রাজবাড়ি

চলেছি রাজবাড়ি দেখতে। যেই জিজ্ঞাসা করছে কোথায় যাচ্ছি, তাকেই বলছি রাজবাড়ি দেখতে চলেছি। আমার কথা শুনে কেউ হাসছিল আর কেউ দাঁত কড়্মড়্ করছিল। আমাদের ধাতই হল রাজদর্শন এবং রাজপূজা। রাজা আমাদের কাছে দেবতা। কিন্তু যখন লোকের মনোভাব কিছুটা বুঝলাম তখন মনে হ'ল চাণক্যের শ্লোক। কুকুর রাজা হলেও জুতা চাটে। আমার মনে যতই কমিউনিজমের প্রভাব বিস্তৃত হোক না কেন রাজা এবং রাজবাড়ির কথা শুনলেই ভয় এবং ভক্তি আপনি এসে দেখা দেয়। এটা আমার দোষ নয়, এটা হল আমার সমাজের দোষ। যাকৃগে লোকের কথা। পথে যখন বের হয়েছি তখন রাজবাড়ি দেখে আসা চাই-ই। সঙ্গের ছেলেটিও কিন্তু আমাকে উপহাস করতে ছাড়ছিল না। তার পরিচিত লোক পেলেই সে বলছিল "ভারতীয় ভূপর্যটক রাজবাড়ি দেখতে চলেছেন!"

পথ থেকে অপমানের মস্তবড় একটা বোঝা মাথায় বহন করে যখন রাজবাড়ির কাছে এলাম তখন আর অপমানের বোঝা বইতে পারলাম না, বসে পড়লাম। রাজবাড়ির চারিদিকে মানুষ চলেনা। কেউ অপমান বোধ করে কেউ বা ঘৃণা করে সেদিকে যায় না। যারা চলেছে তারা হ'ল রাজার চাকর-বাকর। তারাও হাসেনা। তারাও যেন অতি কষ্টে চলেছে। আমিও আর বেশিদূর অগ্রসর হলাম না, দূর থেকেই ছোট্ট রাজা পিটারের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে অন্যপথ ধরলাম। অন্যপথে যখন চলছিলাম তখন একটা ঘটনার কথা মনে হয়েছিল এবং আমাদের সমাজ রাজভক্তির জন্য কতটুকু দায়ী সেকথা বেশ ভাল করে বুঝতে পেরেছিলাম।

মালয় দেশের পিনাং শহরে শ্যাম দেশের রাজা আসবেন শুনে এক বৃদ্ধ আমাকে ডেকে বলেছিলেন "কাল শ্যামের রাজা আসবেন, রাজদর্শন করবেন, রাজদর্শনে মহাপাপ নাশ হয়।" ঠিক হয়েছিল আমরা পিনাং রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকব। পিনাং রোডের মোড়ে ঠাকুর বাড়ি অবস্থিত ছিল, এতে রাজদর্শন এবং দেবদর্শন একই সঙ্গে হবে। ফল হবে চূড়ামণিযোগের গঙ্গাস্নানের মত! অনন্ত স্বর্গবাস! আমি অসময়ে রাজদর্শনে গিয়েছিলাম বলে রাজদর্শন হয়নি। আজ বেলগ্রেদের বুকের ওপর দাঁড়িয়ে সেই কথাই মনে হয়েছিল।

আমরা যখন অন্যপথে চলছিলাম তখন একজন জেনারেল আমাদের দিকে আসছিলেন। সঙ্গের ছেলেটি তাকে জানাল "ভারতের ভূপর্যটক রাজবাড়ি দেখতে গিয়েছিলেন।" ছেলেটির কথা শুনে জেনারেল মহাশয়ের বত্রিশটি দাঁত আনন্দে বেরিয়ে এসেছিল! জেনারেলের মুখের অবস্থা দেখে আর পথ চলতে ইচ্ছা হ'ল না। হোটেলে ফিরে আসাই ভাল হবে ভেবে ছেলেটিকে নিয়ে হোটেলে চলে গেলাম।

তখন বেলা বারটা। ছেলেটিকে বল্লাম "আজ কোথায় গিয়ে খেলে ভাল খাওয়া পাওয়া যাবে বলতে পার?" ছেলেটি বল্ল "রাজবাড়ি"। "চল রাজবাড়িই খেতে যাই!" এই বলে যখন বেরুতে যাচ্ছি তখন হোটেল-ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করলেন "কোথায় যাচ্ছেন?" আমি বললাম, "খেতে যাচ্ছি।" তিনি বল্লেন, "এবেলা বাইরে খেতে যেতে হবে না, ঘরেই খাবার খাবেন।" আমি বিনা আপত্তিতে ঘরে গিয়ে খিল দিলাম। মিনিট পাঁচেক পরেই কে যেন অতি সন্তর্পণে দরজায় করাঘাত করল। দরজা খুলে দিতেই জন্ এসে ঘরে প্রবেশ করল এবং ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিল। জন্ একখানা চেয়ারে বসে হাঁপাতে লাগল। একটু সুস্থ হয়ে বলল "আপনি নাই-সেড যাবেন। সেখানে গেলে অনেক লোকের সঙ্গে দেখা হবে, অনেক কথা হবে, আনন্দে থাকতে পারবেন। পথে কোথাও অরণ্যবাস করবেন না। এদিকের বনে জঙ্গলে চোর ডাকাতই বেশির ভাগ বাস করে। এদিকের বনে ভদ্রলোকের দেখা পাবেন না। আপনি সেদিন যে পরিত্যক্ত বাড়িতে গিয়েছিলেন, সেটাই হল আসল রাজবাড়ি। সেখানে আমি পরের দিন গিয়েছিলাম। আচ্ছা এখন যাই, এদিকে পুলিশের বড়ই উৎপাত।" এই কয়টি কথা বলেই জন্ চলে গেল। আমিও চিন্তিত মনে ভাবতে লাগলাম, এতদিন পরে যা হোক পুরাতন একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল।

জন্ চলে গেলে বয় খাবার নিয়ে এল। আধসের ওজনের এক টুক্রো সিদ্ধ ভেড়ার মাংস, কয়েক টুক্রো রুটি, কাঁচা পেঁয়াজ আর চীজ্। পরে এক পেয়ালা কফিও এনে দিয়েছিল। অনেকে বলে সিদ্ধ মাংস খাওয়া যায় না। আমার কাছে এই কথাটি মোটেই সত্য বলে মনে হয় না। কারণ মাংস যদি বাষ্প দিয়ে সিদ্ধ করা হয়, তবে তার মত সুস্বাদু মাংস আর কোন মতে হতে পারে না। পেট ভরে খেয়ে অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে বিকালে ছেলেটির সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বেড়ানো মানেই হল ভিক্ষা করা!

পথের পাশেই একটা ছোট্ট মিউজিয়ম দেখতে পেলাম। ছেলেটি আমাকে সেদিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু মিউজিয়মের রকম দেখেই ফিরে এলাম। প্রথম জার্মান যুদ্ধের সময় মাইনে খাওয়া অস্ট্রীয়ান সেপাইরা মিউজিয়মটী ধ্বংস করেছিল। বর্তমানে যা গড়ে উঠেছে তা অতি মামুলী ধরনের। তাও আবার এমনি ধরনে সজ্জিত করা হয়েছে যা দেখলেই অস্ট্রীয়ান সেপাইদের প্রতি রাগ হয়। সাম্রাজ্যবাদীরা নকল দিয়ে সমাজকে সন্তুষ্ট রাখতে চায়। যুগস্লাভিয়ার সরকার যদি বলতে পারত, অশিক্ষিত, বেতন ভোগী, বর্বরদের দ্বারা এ কাজটি হয়েছে তবেই মানুষ চেষ্টা করত, পৃথিবী হতে অশিক্ষাকে লোপ করতে এবং বেতন ভোগী সেপাইএর কাজে না যেতে। তা না করে অস্ট্রীয়ার সেপাইদের প্রতি কটাক্ষ করে নানারূপ ছবি এবং প্রস্তর মূর্তি একত্র করা হয়েছে। এই মিউজিয়ম দেখার পর যে কোন লোকের অস্ট্রীয়ানদের প্রতি আপনি ঘৃণার ভাব জেগে উঠবে।

কুষ্টি

শহর হিসেবে বেলগ্রেদ বেশি বড় নয়। তবে শহরটি নানা দিক দিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। ঐতিহাসিক তথ্যের দিক দিয়ে আমি একটি কথাও বলব না, কারণ তাতে হবে চর্বিত চর্বণ। এই শহরে নানা জাতের লোকেরা বাস করে। প্রত্যেকটি জাত নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার জন্য যেন আপ্রাণ চেষ্টা করছে। এটা একটা দেখবার এবং ভাববার বিষয়। দুঃখের বিষয় বেলগ্রেদে আমি থাকতাম ভদ্রলোকের পাড়ায়। ভদ্রলোক মানেই হ'ল ধনী সম্প্রদায়। ধনীদের সকলের পোশাক একই রকমের। ইউরোপে আমাদের মত বড় ছোট বলে কোন জাতও নেই এবং হরিজন বলে কোন শ্রেণীও নেই। আজ যে দরিদ্র কাল যদি সে অর্থের সংস্থান করতে পারে তবেই সে ভদ্রলোক হতে পারে। আমাদের দেশে যেমন ছুত এবং অছুতরা পৃথক বাস করে, ইউরোপেও তেমনি ধনী আর দরিদ্র পৃথক বাস করে। দরিদ্রের অবস্থা দেখার জন্য আমাকে অনেক দূরে যেতে হ'ত। দরিদ্র পাড়ায় গিয়েও আমি ভিক্ষা করতাম। দরিদ্ররা আমাকে আদর আপ্যায়ন করে অর্থদান করত আর ধনীরা আমাকে চক্ষুলজ্জায় সামান্য কিছু দান করত।

হোটেলের বয়টিকে নিয়ে গরীব পাড়ার দিকে চলছিলাম। পথে দেখা হ'ল একটা শাদা ছেলের সঙ্গে। ছেলেটার শরীরে রক্ত খুব কম ছিল বলেই তার শরীর দুধের মত শাদা হয়ে গিয়েছিল। সে বোধ হয় হেটেলের বয়ের নিকট-আত্মীয় ছিল সেজন্য সেই ছেলেটিও আমার সঙ্গ নিল এবং বেশ বড় একটা কাফেতে নিয়ে গিয়ে আমাকে বসাল। রোগা ছেলেটির আদর আপ্যায়নের কারণ বুঝতে পেরে রেস্তোরাঁয় পৌছেই দুটো ছেলেকে দুটো করে "পাই" (ময়দা, চিনি এবং আপেল সিদ্ধ করে এক রকমের পিঠা করা হয়) খেতে দিলাম। তারা পাই পেয়ে কত যে আনন্দিত হ'ল তার আর অবধি ছিল না। তাদের সঙ্গে বসে আমিও কিছু খেলাম।

পাশে বসে কতকগুলি লোক বেশ সুর করেই কোনও বিষয়ে তর্ক করছিল। এদের তর্কের তোয়াক্কা না রেখে তাদেরও ভিক্ষাপত্র দিলাম। ভিক্ষাপত্র হল আমার পরিচয় পত্র এবং লোকের সঙ্গে মিশবার একটি ভাল উপায়। আমার পরিচয়-পত্র পাঠ করে অনেকেই আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইল। কিন্তু যখন দেখল আমি তাদের ভাষা বুঝিনা তখন দু'এক জন ইংলিশ জানা লোক আমার দিকে এগিয়ে এল। আমি তাদের সাহচর্য পেয়ে তৃপ্তি অনুভব করলাম। তাদের আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি নিয়ে তর্ক হচ্ছিল? তখন একজন লোক সকলকে কি বলল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌ল "এই লোকটি বলছে সে "ভিনিক্" জার্মান নয়। জার্মান ভাষার সঙ্গে তার ভাষার কোন প্রভেদ নেই, জার্মান আচার ব্যবহারের সঙ্গে এমন কোন প্রভেদ সে দেখাতে পারে যাতে করে সে প্রমাণ করতে পারে তার সঙ্গে জার্মানীর কোন সম্বন্ধই নেই। আপনি এই লোকটিকে কি বলবেন?" যিনি আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন তাঁরই সাহায্যে ভিনিক লোকটিকে কয়েকটি প্রশ্ন করলাম।

আপনি কি জার্মান ভাষা বোঝেন না?

নিশ্চয়ই বুঝি, আমি যদি একখানা পত্র আমার বাড়িতে পাঠাই তবে যে কোন জার্মান পড়তে পারে। ভিনিক অর্থাৎ ভিয়েনার অধিবাসীকে আর কোন প্রশ্ন করার দরকার মনে করলাম না। মনে হল আসাম এবং উড়িষ্যার কথা। সবই তারা বোঝে তবুও তারা পৃথক জাত। বুলগেরিয়া এবং যুগোস্লাভিয়াতে ভাষার দিক দিয়ে আরও নিকট সম্বন্ধ। তবে এই পার্থক্য আসে কোথা হতে এবং কেনই বা লোক ভূয়া পার্থক্য ভুলে যায়?

যারা ধনী তারা পৃথক থাকতে ভালবাসে। এতে তার ধন বৃদ্ধি হয় এবং মান বাড়ে। যাতে ধনী তার ধনের বৃদ্ধি করতে পারে সেজন্য সদাসর্বদা নানারূপ প্রপাগণ্ডার সাহায্য নেয়। অষ্ট্রিয়া এবং জার্মানদের বিভিন্নতার পেছনেও ছিল ধনীদের চালাকি তারই ফলে এ'দুটি তথাকথিত বিভিন্ন জাত একত্রে বাস করত পারছিল না। বুলগেরিয়া এবং যুগস্লাভিয়ার কথা স্বতন্ত্র। রাজায় রাজায় পার্থক্য চিরদিন ছিল এবং থাকবেও। রাজার উচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে বুলগেরিয়া এবং সার্ভিয়া একত্র হতে পারবে একথা সকলেই বলত।

একজন লোক চীৎকার করে বলছিল "আমরা হচ্ছি ভিখিরীর দল, আমাদের সামনে যে এক টুকরা রুটি ফেলে দেয়, আমরা তারই কথা বলি, আমাদের দারিদ্র্যই হ'ল আমাদের শত্রু। এর বেশি লোকটি কিছুই বলল না, কারণ এটা বিয়ার সেল নয়, এটা হ'ল খাবারের দোকান। এখানে লোকের মাথা গরম হবার হেতু নেই, অতএব এখানে যদি এর বেশি কিছু লোকটা বলত তবে তার শাস্তি হ'ত, এটা নিশ্চয় কথা। যদিও দরিদ্র লোকই এখানে বসেছিল তবুও এ যা বলছিল তাতে পলিটিক্স এসে পড়ছিল। এরূপ স্থানে বেশিক্ষণ বসে থাকা ভাল হবেনা ভেবে ছেলে দুটির হাত ধরে পথে বেরিয়ে পড়লাম।

মানুষের ভাষা এবং আচার ব্যবহার বদলায় তা কে জানে? লোক একদিন কাপড়ের বদলে পশুচর্ম ব্যবহার করত। আফ্রিকাতে এখনও অনেক অসভ্য নিগ্রো পশুচর্ম ব্যবহার করে। এক গ্রামের কথ্য ভাষার সঙ্গে অন্য গ্রামের কথ্য ভাষার পার্থক্য থাকে। খাবারের দিক দিয়েও তেমনি একই পরিবারে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। এতগুলি জানা বিষয়কে দাবিয়ে দেওয়া কঠিন কাজ। কিন্তু যখন এতগুলি জানা বিষয় লোকের মন হতে সরিয়ে দিয়ে ভেদাভেদের সৃষ্টি করা হয় তখন দেখা যায় এই কাজটি করতে অতি অল্প খরচই হয়েছে। একজন বুদ্ধিজীবীকে ডেকে তাকে সন্তুষ্ট করে তারই কথা প্রেসের সাহায্যে যখন জনসমাজে প্রচার করা হয় তখন সাধারণ লোক অনেক মামুলী সত্যও ভুলে যায়। মানুষের মন বুদ্ধিজীবীর সাহায্যে সল্লায়াসে জয় করা যায়।

পরের দিন কাফেতে না গিয়ে একটি বেকার মজুর-ঘরে গেলাম। সেখানেও রাষ্ট্র নীতিই আলোচনা হচ্ছিল। তবে এদের কথাগুলি ছিল একটু উঁচু স্তরের। এখানে নানা দেশের কথা হচ্ছিল। এশিয়ার কৃষ্টি সম্বন্ধে তারা নাকি তর্কযুদ্ধ চালাচ্ছিলেন। সুখের বিষয় এঁরা এশিয়াবাসীকে অমানুষ বলে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিলেন না। এশিয়া সম্বন্ধে তর্কযুদ্ধ যখন হচ্ছিল তখন একজন তার্কিক প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তর্কযুদ্ধে জয়ী হয়ে যায়। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তটি আমাকে দেখান হয়েছিল। দু'জন হাঙ্গেরিয়ান একদিকে চুপ

করে বসেছিল। তাদের পরনে ছিল হাঙ্গেরিয়ানদের পুরাতন পোশাক। তারা নাকি ঐ পোশাক সেকেণ্ড হ্যাণ্ড মার্কেটে একরূপ বিনামূল্যেই পেয়েছিল। পুরাতন পোশাককে "কাস্টিউম" বলা হয়। কাষ্টিউম্ পরে কেউ ঘরের বের হয় না। কাষ্টিউম্ পরে সকলেই রঙ্গমঞ্চে যায়। এরা দরিদ্র বলেই মজুর গৃহে কাষ্টিউম পরে আসতে বাধ্য হয়েছে। এদের প্রত্যেকের শরীরে শক্তি আছে। এরা যে কোন পরিশ্রমের কাজ করতে পারে। এরা অলস নয় এবং কাষ্টিউম পরেও ঘর হতে বের হওয়া মোটেই পছন্দ করেনা। তাদের কে এমন অবস্থায় এনেছে? যারা এদের এই অবস্থায় এনেছে, এশিয়াবাসীর অবনতির মূলেও সেই জাতীয় এক রকম লোক আছে, যারা এশিয়াবাসীর দুঃখ এবং দুর্দশার মূল কারণ। হাঙ্গেরিয়ানরা তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে বহুরূপীর বেশ পরেনি। এশিয়াবাসীকে যাঁরা বহুরূপী বলে তারাও যদি ভাল করে তলিয়ে দেখেন তবে দেখবেন দারিদ্র্যই এশিয়াবাসীকে অমানুস করে রেখেছে। বেলগ্রেদে যারা জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে চেষ্টা করছে, তাদের প্রায় সকলেই দরিদ্র হ'ল আর কয়েক জন হ'ল ভাড়াটে। ভাড়াটেরাই দরিদ্রদের উগ্রজাতীয়তাবাদী করে তুলেছে। কিন্তু ভাড়াটেদের দুরভিসন্ধি বেশি দিন চলবেনা। এদেরও একদিন লেজ গোটাতে হবে! প্রকৃত পক্ষে এটা হ'ল একটা চালবাজী।

এই প্রকারের চালবাজী বেশিদিন থাকবে না, থাকতে পারেনা। কারণ, মানুষ ক্রমেই উন্নতির দিকে চলেছে। এই রকমের বিষয় নিয়েই সেদিন অনেক আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনার বিষয় বস্তু যখন বুঝতে পারতাম না তখন যারা ইংলিস জানত তারা অতি সল্প কথায় সকল কথা বুঝিয়ে দিত। আমাকে এসব কথা বুঝিয়ে দেওটা ওরা কর্তব্যের মধ্যেই ধরে নিয়েছিল। তারা আমাকে অবহেলা মোটেই করছিল না। আমি ভাবছিলাম তারা হয়ত আমাকে অবহেলা করে কিছুই বুঝিয়ে দেবেনা। এটা যে একটি সর্ব্বজনীন বোঝবার বিষয়, কাফে হতে বিদায় নেবার পূর্বে আমাকে একজন বয়স্ক লোক তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বয়স্ক লোকটি আমাকে সকল কথা বুঝিয়ে দিয়ে সন্তুষ্ট হননি। আমি যেখানে থাকতাম সেখান পর্যন্ত এসেছিলেন এবং বিদায়ের সময় বলে গিয়েছিলেন পরের দিনও তিনি আসবেন।

পরের দিন সকালবেলা এসে আমাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে তিনি বলছিলেন "বড়ই দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, গত রাত্রে আপনি আমাদের কথা ভাল রকম করে উপভোগ করতে পারেননি। ইংলিশ জানা লোক এদেশে অতি অল্প। ইংলিশ ভাষার সাহায্য নিয়ে আমরা কোন কথা বলিনা। প্রায়ই আমরা ফ্রেঞ্চ ভাষার সাহায্য নিয়েছি, লক্ষ্য করে দেখেছি আপনি ফ্রেঞ্চ মোটেই বোঝেন না। এখন আমার সঙ্গে চলুন, আমি আপনাকে চাক্ষুষ কতগুলি আচার ব্যবহার দেখিয়ে দিই।"

কিছু খাবার খেয়ে বৃদ্ধের সঙ্গে একটি দরিদ্র পল্লীর দিকে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম। বয়স্ক লোকটি বড়ই ধীর হাঁটতেন, সেজন্য আমাদের পথ চলতে বেশ

সময় লাগছিল। আমার কিন্তু এতে মোটেই ক্ষতি হচ্ছিল না। মাঝে মাঝে বৃদ্ধকে থামিয়ে আমি "উন্‌ডোসে"-ও দেখে নিতাম এবং জিনিসে কত দাম লেখা আছে তা জিজ্ঞাসা করতাম। বৃদ্ধ বলতেন, "এসব জিনিসের দিকে তাকাবেন না এসব জিনিস হল ধনী লোকের জন্য। বিকাল বেলা দেখবেন বড় বড় ধনীরা মোটর হতে নেমে কেমন চট্ পট্ করে দোকানকে দোকানই যেন কিনে ফেলতে চায়। ধনীলোক সখ করে যে সব জিনিস কিনে নিয়ে গিয়ে ঘর বোঝাই করে তাই এক বৎসর পরে সেকেণ্ড হ্যাণ্ড বলে বাজারে বিক্রী হয়। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন কোনও দরিদ্র লোক নতুন পোশাক কেনেনা, তারা পুরাতন পোশাকই ক্রয় করে। বৃদ্ধ নিজের কোট প্যাণ্ট দেখিয়ে বললেন সবই পুরাতন বস্ত্র-ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিনেছি। আপনি যদি বলেন, একটি দোকান আছে সেখানে নিয়ে যেতে পারি।" আমি পুরাতন বস্ত্রের দোকান দেখার জন্য ইচ্ছুক ছিলাম। বৃদ্ধকে বল্‌লাম সে দিকেই চলুন। বৃদ্ধ আমাকে একটি পুরাতন কাপড়ের দোকানে নিয়ে গেলেন।

দোকানটি দ্বিতল। নিচে খুচরা দরে পোশাক বিক্রী হয় আর উপরে পাইকারী দরে বিক্রি হয়। নীচে নানা রকমের স্যুট্ সজ্জিত ছিল। হিসাব করে দেখলাম রাইট অনারেবল্ চেম্বার লেনের ডিনারের পোশাক আমাদের দেশের সাত আট টাকাতে এই দোকানে পাওয়া যায়। আমি কোট কিনিনি। আমার কোটের দরকার ছিলনা। দোকানটা ছেড়ে আমরা চল্‌লাম দরিদ্র-পল্লীতে। তখনও দরিদ্র-পল্লীতে আসিনি। পথে দেখা হ'ল কতকগুলি ছেলেমেয়ের সঙ্গে। তারা পথের আবর্জনা নিয়ে খেলা করছিল। এদের শরীর অপুষ্ট, পরনের বসন কদর্য, শুধু শিশু বলেই তারা হাসতে পারছিল। নতুন লোক দেখে আনন্দ অনুভব করছিল, কিন্তু বিকাল বেলা যখন তাদের মা বাবা কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে আসবে তখন তাদের পেটে কিছু পড়বে কি না তা কে জানে।

এটা হল গরীব পাড়া। এখানকার লোক নানা রকমের কাপড় পরে। কারো গায়ে স্ত্রীলোকদের কোট, পরনে সাদা প্যাণ্ট। মাথায় টুপি নেই। কেউবা শুধু কোট গায়ে দিয়েই বের হয়েছে, সার্ট গায়ে ছিল না। এদের প্রতি আমার চাইতেও ইচ্ছা হচ্ছিলনা। বার বার স্বগ্রামের কথা মনে হচ্ছিল, আর মনে হচ্ছিল আমাদের প্রতি প্রকৃতির দান। আমাদের দেশের সূর্য-কিরণ আর গরম জল যদি না পাওয়া যেত তবে আমরা কবে নির্বংশ হতাম তার কথা কেউ বলতে পারতনা। ইউরোপে পূর্বে অকাল-মরণের সংখ্যা হ'ত অনেক গুণ। বর্তমানে তার ঢের উন্নতি হয়েছে। ইউরোপের কুসংস্কার অনেক লোপ পেয়েছে, কিন্তু এরই জায়গায় এসে জুড়ে বসেছে ধনী এবং দরিদ্র বলে দুটি শ্রেণী।

বৃদ্ধ আমাকে পল্লীটি দেখিয়ে বললেন, "এদের কোনটা হ'ল কৃষ্টি। আপনাদের দেশের সঙ্গে এদের মিল আছে কি?" কিছুই বললাম না, শুধু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম "যারা কৃষ্টির পন্থ লেখে তারা জাহান্নামে যাক।"

সেখানে দাঁড়াতে আর ইচ্ছা হ'ল না। আমরা এবার বাসে করে হোটেলে ফিরে এসে বিশ্রাম করতে লাগলাম এবং নানা রকমের কথায় অনেক সময় কাটিয়ে বৃদ্ধকে বিদায় দিলাম। কৃষ্টি কি চীজ তা বুঝতে আর বাকি রইল না!

একটি বৃদ্ধ হোটেলের ধারে দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছিল। তাকে কেউ ভিক্ষা দেয়নি অথবা চলে যাবার কথাও কেউ বলল না। হোটেল ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করলাম "আপনাদের দেশে বৃদ্ধাবস্থার জন্য পেন্‌সনের ব্যবস্থা নাই?" হোটেল ম্যানেজার বললেন, "এখনও হয়নি। কখন হবে তারও স্থিরতা নাই। নানা জাতের লোক এদেশে বাস করে সেজন্য কেউ কারো কথা ভাবেনা।" বলবার মত কিছুই ছিল না, শুধু চেয়ে দেখলাম এর পর বৃদ্ধ কি করে। বৃদ্ধ যখন বিদায় নিয়ে চলছিল তখন সে তার নাকে এবং বুকে ক্রস চিহ্ন আঙুল দিয়ে এঁকে চলে গিয়েছিল। দুর্বল মানুষ ধর্মেরই দোহাই দিতে পারে, কোন প্রতিকার করতে পারেনা। এটাও হ'ল একটা কৃষ্টি!

একটি হোটেলে বেশি দিন কোনও বিদেশী থাকলেই লোকের সন্দেহ হয়। কেউ ভাবে লোকটা চোর আর কেউ ভাবে বিদ্রোহী অথবা বিপ্লবী। আমাকে এরা কি ভেবেছিল বলতে পারিনা, তবে হোটেল ম্যানেজার প্রত্যেক দিন সকাল বেলাই জিজ্ঞাসা করতেন "আপনি কবে যাবেন?" এক দিন সকাল বেলা তাঁকে বললাম, "আপনার রুম ভাড়া ঠিকই পেয়ে যাচ্ছেন তবে কেন প্রত্যেক দিনই জিজ্ঞাসা করেন কবে যাব?" হোটেল ম্যানেজার বললেন "পুলিশ আপনাকে নানামতে সন্দেহ করছে। কেউ বলছে আপনি বৃটিশ স্পাই আর কেউ বলছে আপনি এখানে কমিউনিজম প্রচার করতে এসেছেন। এক্ষেত্রে আপনার স্থানত্যাগ করাই উচিত।" হোটেল ম্যানেজারকে বললাম, "আপনি আমার বেশ উপকার করেছেন। আমি এখানে আর দশ দিন থাকব। যার যা ইচ্ছা তাই ভাবুক। আমার শরীর দুর্বল। শরীটাকে একটু সবল করেই পথে বের হব। আর একটি কথা জেনে রাখুন, যুগস্লাভিয়ায় কোনও ভারতবাসী বাস করে না। যদি কোন ভারতবাসী এদেশে বাস করত তবে হয়ত বৃটিশ এখানে ভারতীয় স্পাই পাঠাত। শ্বেতকায়দের দেখাশোনা করার জন্যই ইউরোপীয় স্পাইই নিযুক্ত হবার সম্ভাবনা। এ কথাটা যদি আপনারা না বোঝেন তবে আমি মোটেই দুঃখিত হবনা।"

প্রকৃত পক্ষে তখন যুগস্লাভিয়ায় রাজদ্রোহ বেশ ভাল করেই প্রচার হচ্ছিল। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। যে সকল লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত তারা যেদিন শুনল আমি বৃটিশ কন্‌সালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম সেদিনই তারা আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। আমি তখনও বুঝতে পারিনি বৃটিশ এবং ফ্রেঞ্চরাই প্রকৃত পক্ষে যুগস্লাভিয়াতে প্রাধান্য গেড়ে বসেছিল। যুগস্লাভিয়ার রাজশক্তি কপার, জিঙ্ক কয়লার খনিগুলি এই দুটি রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিয়েছিল অথচ সর্বসাধারণ তা পছন্দ করেনি। বৃটিশ কন্‌সালের সঙ্গে দেখা করা আমার পক্ষে মোটেই ভাল হয়নি। বৃটিশ কন্‌সালও আমার প্রতি কোনরূপ করুণা প্রদর্শন করে প্রজাবাৎসল্য দেখাতে পারেন নি। অনর্থক আমি কয়জন বন্ধু হারিয়ে কয়েকটি দিন কষ্টে কাটাতে বাধ্য হয়েছিলাম।

আমি এখন একা। হোটেলের ছেলেটি আমার সঙ্গে আর যায়না। পথের লোকও যেন আমার দিকে চায়না। এদিকে গরমের সময়ও আমাদের দেশের পৌষ মাসের মতই শীত অনুভূত হয় সেজন্য নদী দেখবার জন্য কখনও ইচ্ছা হত না। সাইকেল নিয়ে বের হয়েছিলাম। অজানা পথে চলে হঠাৎ যখন নদীতীরে এলাম তখন মনের অবস্থা একদম বদলে গেল। ছোট একটা নদী দানিয়ুবের সঙ্গে মিশেছে। দানিয়ুবের জল আর ছোট নদীর জল মিশে বেশ ঢেউ খেলছিল। কতকগুলি দুষ্টু ছেলে সেই জলে সাঁতার কাটছিল। ছেলেগুলি উলঙ্গ। আমাদের দেখা মাত্র তারা জল হতে উঠে এল। দেখলাম তারা কত যত্ন করে পোশাক পরছে। তাদের পোশাক পরা হয়ে গেলে তারা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল এবং আমাকে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। তাদের কাছে আমার পরিচয় পত্র দিলাম। তারা মন দিয়ে পড়ল এবং ইঙ্গিতে জানালো তাদের কিছুই নেই। আমিও ইঙ্গিতে জানালাম তাদের কাছে থেকে কিছুই চাই না।

ছেলেরা আমাকে ছাড়ল না। তারা আমাকে স্নানের জায়গায় নিয়ে গেল। সেখানে অনেকগুলি বয়স্ক যুবক যুবতী ভিজে স্নানের পোশাকেই আমাকে সমাদর করে বসালেন। অনেকে আমাকে স্নান করতে বল্লেন কিন্তু আমার স্নানের প্রয়োজন না থাকায় আমি স্নান করলাম না। আমি স্নান করব না শুনে দুজন যুবতী আমার গা ঘেঁসে বসে জিজ্ঞাসা করল, "পথিক তুমি কি তুরুক?" আমি বললাম, "আমি তুরুক নই হিন্দু।" "তবে এত সঙ্কোচ করছ কেন?" আমার বলার মত কিছুই ছিলনা। আমাদের সঙ্কোচের পেছনে রয়েছে বাসনার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা। যখনই আমরা সুযোগ পাই তখনই আমরা বাসনা পূরণ করি। আমাদের বাসনার পূরণ হয় পশুত্বের ভেতর দিয়ে। আর ওদের বাসনার পূরণ হয় প্রকৃতির আদেশ মানার পরিমাণ নিয়ে। এক দিন একটা লোক বলেছিল, শরীর ধ্বংস হয় হোক, অপরের সংসার ছারখার হয় হোক কিন্তু বাসনার পূরণ হওয়া চাই। লোকটার বাড়ি ছিল সাইপ্রাসে, জাতে ছিল পরাধীন তুরুক। তার মুখ দিয়ে একথা বের হওয়া শোভা পায়। বৃটিশের তাঁবেদারী করে যারা ধর্ম করে, স্বর্গে যায় তাদের এর বেশি কিছু বলার থাকতে পারে না।

এখানে উল্টা। সতীত্ব গাছের গোটা নয়। স্ত্রীলোকদের রক্ষা করা এবং স্বাধীনতা স্বাধীন ভাবে অর্পণ করাই স্বাধীন পুরুষের কাজ। যখন তাই হয় তখন দেখা যায় স্ত্রীলোক মা বোন অথবা ঠিক ঠিক ভাবে নার্সের কাজ করতে সক্ষম হয়। যেখানে স্ত্রীলোক পরাধীন সেখানেই স্ত্রীলোক ব্যভিচারী। এ'দুটি যুবতী ব্যভিচারী নয়, বিদেশীকে পরীক্ষা করতে চাইছে বিদেশী মানুষ না পশু! আমি স্নান করিনি বলে তারা বিয়ার এমনি এনে দিল। প্রত্যেকেই এক গ্লাস করে বিয়ার খেল, আমিও খেলাম। তারপর যখন কথা বলতে আরম্ভ করলাম তখন দেখতে পেলাম ভাষার বড়ই অভাব। সাঁতারের ক্লাবের লোক আমাকে নিয়ে বেশ একটু বিব্রত হল, তারপর একখানা কাগজে লিখল অমুক কাফেতে যেন সন্ধ্যার সময় যাই। আমি সেই কাগজখানা পকেটে রেখে শহরে এসে

একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলাম তাতে কি লেখা হয়েছে। যা লেখা হয়েছিল সে তাই বিশুদ্ধ ইংরাজী করে দিল।

সন্ধ্যার পর যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে সন্তরণকারীদের দেখা পেলাম। এরা সকলেই হাঙ্গেরিয়ান। ফ্রেঞ্চ এবং শ্লাভ ভাষা হ'ল এদের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় ব্যবহার্য ভাষা। অনেকে জার্মান ভাষাও বেশ জানে। জার্মানীতে এরা ফল চালান দেয়। সন্তরণকারীরা ইংলিশ জানা একজন লোক সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। কথা বলতে কোনরূপ অসুবিধা হয়নি। ইংলিশ জানা লোকটি মামুলী কথা বলতেই পছন্দ করছিল। ভৌগোলিক তথ্য পর্যন্ত তার কাছে রাষ্ট্রনীতির অংশ বলেই গ্রাহ্য হচ্ছিল। ধর্ম, সেক্স এসব নিয়েই লোকটি কথা বলছিল।

ইউরোপে ধর্মভাব ক্রমেই কমে যাচ্ছে, ভবিষ্যতে হয়ত আধ্যাত্মিক ভাব একেবারেই লোপ পাবে বলে তার ধারণা হচ্ছিল। তারপর হ'ল সেক্সের কথা। একথাটি দোভাষী নানা ভাবে ব্যক্ত করছিল। এসব কথা আমার মোটেই পছন্দ হচ্ছিল না, তবুও প্রত্যেক কথার সায় দিতে হচ্ছিল। লক্ষ্য করে দেখলাম এদিকের হাঙ্গেরিয়ান্‌রা যুগশ্লাভ সরকারের প্রতি মোটেই আস্থাবান নয়। অন্যান্য মাইনরিটি যেমন করে কমিউনিজম কায়েম করতে উৎসাহী তারা সেরূপ ভাবাপন্ন নয় তারা চায় নাই সেদ্ থেকে বেলগ্রেদের উত্তর অঞ্চলটা হংগেরীর ভেতরে চলে যাক। যে লোকটি আমার সঙ্গে কথা বলছিল সেও ছিল হাঙ্গেরীয়ান্। এতেই বুঝতে পেরেছিলাম বাতাস কোন দিকে বইছে। হংগেরীর সাধারণ লোক কট্টর খৃষ্টান। ইহুদীরা তাদের কাছে অমানুষ আর মুসলমানরা তাদের কাছে নরপশুরূপে গণ্য হয়। নাইসেডে তার বহু প্রমাণ পেয়েছিলাম। এখানেও অনেকটা অনুভব করলাম। ধর্ম মানুষের মধ্যে অমানুষত্ব আনতে পারে, ইউরোপের এই এলাকা ভ্রমণ করে তা বেশ অনুভব করতে পেরেছিলাম।

বিদায়ের নির্ধারিত দিন এসে পড়ল। আমার বিদায় নেবার পালা। হোটেল ম্যানেজারকে আগের দিন রাতে জানালাম আমি পরদিন সকাল বেলা বেলগ্রেদ ছেড়ে নাইসেডের দিকে রওনা হব। দেনা পাওনা সকলই মিটিয়ে দিলাম। পরের দিন সকালবেলা ইচ্ছা করেই বোধহয় হোটেল ম্যানেজার এবং আমার প্রিয় সহচর হোটেল বয় কোথায় চলে গিয়েছিল। আমি কাউকে "গুড্ বাই" না বলেই পথে বের হয়ে পড়লাম। কতক্ষণ অবশ্য সেজন্য মনে একটু দুঃখ হয়েছিল, তার পরই যখন নদী এল তখন নদীর জল যেমন করে সকল আবর্জনা ভাসিয়ে নিয়ে যায় তেমনি আমার মনেরও সকল আবর্জনা ভাসিয়ে নিয়ে গেল। আমি মুক্ত আকাশের নীচে, মুক্ত বাতাসে প্রাণ খুলে নদীর স্রোত দেখে নদী পার হলাম। নদীর পোলটি বড়ই সুন্দর। পুলের উপর দিয়ে চলতে বেশ আরাম লাগছিল। উত্তরের বহু দূরের পাহাড়গুলি বেশ সুন্দর দেখাচ্ছিল। আকাশ পরিষ্কার ছিল। নদী পার হয়ে একটি খাবারের দোকান পেলাম। খাবারের দোকানে নানারকম উত্তম খাদ্য ছিল তাই পেট ভরে খেয়ে পথ ধরলাম।

আমি বার বারই খাবারের কথা বলছি, এতে হয়ত অনেকে ভাববেন লোকটা নিশ্চয়ই পেটুক! আসলে তা নয়। জাতে আমি বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর খাদ্যের সঙ্গে চীনে এবং দ্রাবিড়

খাদ্যের সংস্পর্শ আছে, সেজন্য বাঙ্গালী খাদ্য সকলের কাছে আদরণীয় হয় না। আমেরিকা থাকার সময় দেখতাম ভারতীয় খাবারের দোকানে আমেরিকানরা আসত বটে কিন্তু যে একবার আসত পরে কখনও সে আর আসত না। কারণ, ভারতীয় খাদ্য তাদের রোজ রোজ ভাল লাগত না। কিন্তু আমি যে খাদ্যের কথা বলছি তা সকলের কাছে সকল সময়েই গ্রহণযোগ্য। দই, দুধ, ঘনদুধ, রুটি চিনি, মাখন, মালপোয়া, আলুভাজা, আলুসিদ্ধ, এবং সিদ্ধ ডিম,—ইউরোপের সর্বত্র এরূপ খাদ্য সব সময় পাওয়া যায়। শুধু তাই নয়, মাঝে মাঝে কেরট সিদ্ধ, কপি সিদ্ধ-ও খাবারের দোকানে পাওয়া যায় সে জন্যই ইউরোপের খাবারের দোকানগুলির কথা বার বার বলেছি।

রেঁস্তোরার কথাও বার বার বলতে হচ্ছে। ইউরোপে কেউই আমাদের মত বাড়ি-ঘর করে বাস করেনা। গোলাবাড়িগুলিই আমাদের বাস্তুভিটার মত দেখায় শহরে এবং গ্রামে কোথাও গৃহপালিত জীব দেখা যায় না। শহরে এবং গ্রামে লোক কাছাকাছি বাস করে, আমরা যেমন ক'রে কলকাতায় বাস করি। শহরে এবং গ্রামে সর্বদাই স্থানাভাব। যেখানে স্থানাভাব সেখানে লোক সাধারণতই কাফে, রেঁস্তোরা এবং ক্লাবে দেখা সাক্ষাৎ করে। সেজন্য বার বার আমাকে, রেঁস্তোরাগুলির কথা বলতে হয়েছে।

বিকাল বেলা একটি গ্রামে পৌছি। গ্রামটির নাম ডায়রীতে উল্লেখ করতে একেবারে ভুলে গিয়েছি অথচ গ্রামটিতে এসে অনেক কথা অবগত হতে সক্ষম হই। এখানে এক জন ইংলিশ পর্যটকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি মোটর বাইকে ইউরোপ ভ্রমণ করছিলেন। সেদিন আমার পরিশ্রম হয়েছিল অত্যধিক, সেজন্য গ্রামে এসেই একটি হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়ি। বিকালের দিকে ইংলিশ পর্যটকের সঙ্গে দেখা হয়। তিনি বললেন এখানে পূর্বদেশীয় সভ্যতার সঙ্গে নরডিক সভ্যতার লড়াই অনবরত পাঁচশ বছর চলেছিল। এখানে নরডিক এবং স্লাভ সভ্যতার জয় হয় এবং পূর্বদেশীয় সভ্যতার পরাজয় হয়। পূর্বদেশীয় বলতে আরব, তুর্কীয়া এ'দুটি দেশকেই বোঝায়। এই দুটি দেশকে নিকটস্থ পূর্বদেশও বলা হয়।

সেই জয় পরাজয়টি কিরূপ জিজ্ঞাসা করায় ইংলিশ পর্যটক বললেন, নরডিকদের সভ্যতা মতে স্ত্রীলোক সকল সময়ই স্বাধীন, আর পূর্বদেশীয় সভ্যতা মতে স্ত্রীলোক সকল সময়ই পরাধীন। হুন্ এবং তুরুকগণ দানিয়ুব নদীতীর ধরেই পশ্চিম ইউরোপ বার বার আক্রমণ করে নরডিকদের ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। এই ছোট্ট গ্রামটির পাশেই একটি যুদ্ধক্ষেত্র আছে সেখানে তুরুকগণ অনেকবার পরাজিত হয় এবং হুনরা এই গ্রাম এড়িয়ে নাইসেড হয়ে হাঙ্গেরীতে প্রবেশ করে, এজন্য এ গ্রামের নাম ইউরোপে মশুর! এই গ্রামটি নাইসেড হতে পঁচিশ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে অনেকগুলি পুরান চার্চ দেখতে পাওয়া যায়। পরের দিনও ঐ গ্রামটিতে ছিলাম এবং চার্চগুলি দেখবার জন্য গিয়েছিলাম। পরিত্যক্ত চার্চগুলি দেখে অনেক কথাই মনে হল। গীর্জায় গ্রানাইট পাথরের সঙ্গে কালো পাথরও গাঁথা হয়েছে। সাধারণত কালো

পাথর গীর্জায় ব্যবহার করা হয় না। কালো পাথর দ্রাবিড়দের পূজার জিনিস। মনে হল হয়ত এখানে দ্রাবিড়দের কোন দেবালয় ছিল। দেবালয়গুলি ভেঙ্গে হয়ত কালো পাথর সংগ্রহ করে চার্চ তৈরী করা হয়েছে। প্রত্যেকটি চার্চ হয় উত্তরমুখী নয় পূর্বমুখী। দ্রাবিড়গণ সব সময় সব জায়গায় তাদের দেবালয় হয় উত্তরমুখী নয় পূর্বমুখী করে তৈরী করত। দক্ষিণ ভারতের দেবমন্দিরগুলি দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিকালের দিকে হোটেলে ফিরে এসে যখন বসলাম তখন ইংলিশ পর্যটক এসে জিজ্ঞাসা করলেন—

চার্চগুলি দেখে কি মনে করলেন?

কোন বিষয়ের কথা বলছেন?

গঠনের দিক দিয়ে।

দ্রাবিড় সভ্যতার ছাপ তাতে প্রচুর ভাবেই রয়েছে।

কেমন ক'রে?

প্রত্যেকটি চার্চ হয় উত্তরমুখী নয় পূর্বমুখী, এই হল প্রথম, দ্বিতীয় প্রমাণ হলো কালো সিস্ট (Schist) পাথরও ব্যবহার করা হয়েছে। জু'দের সিনয়াগগে, মুসলমানের মসজিদে, এবং খৃষ্টানদের চার্চে কালো পাথর ব্যবহার হয়না, কিন্তু এখানে তার প্রচুর ব্যবহার রয়েছে; শুধু তাই নয়, চার্চগুলির অগ্রভাগে এখনও দ্রাবিড়দের কারুকার্য সম্পন্ন অনেক পাথর রয়েছে যা দেখলে দ্রাবিড় সভ্যতার চিত্র-কলার সঠিক নিদর্শন পাওয়া যায়।

এদিকের দ্রাবিড়রা গেল কোথায়?

নরডিকদের সঙ্গে মিশে গিয়েছে। নরডিক সভ্যতা এবং দ্রাবিড় সভ্যতায় প্রভেদ অতি সামান্য। দ্রাবিড়রাও স্ত্রী-স্বাধীনতা তাদের সভ্যতার শুরু হতে দিয়ে এসেছে। দ্রাবিড় সভ্যতার মধ্যে অপ্রাকৃতিক কিছুই নেই।

ইংলিশ পর্যটক একজন প্রফেসর। তিনিও সেস্থানটা দেখবার জন্যই এদিকে এসেছিলেন। তাঁর মতের সঙ্গে আমার মত মিলেছে দেখে তিনি আমার অটোগ্রাফ এবং ফটোগ্রাফ নিয়েছিলেন। সেদিন আমার শরীর আরও দুর্বল হয়ে যায়, সেজন্য নিজের অটোগ্রাফ বইটা খুলে তাঁর অটোগ্রাফ নিতেও প্রয়োজন মনে করিনি। শরীর যখন দুর্বল হয়, মন তখন অনেক ভাল জিনিসও পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

নাইসেভের দিকে পা বাড়াতেই বুঝলাম এদিকে অন্য রকমের সভ্যতা ছিল। পথে এ্যাসফাল্ট দেওয়া ছিল কিন্তু যুগোশ্লাভ সরকার পথ মেরামত করাবার দরকারও অনুভব করেনি অথচ রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করেছে। পথের লোক প্রায়ই হাঙ্গেরিয়ান এবং জীবন ধারণের প্রণালীও অন্য রকমের। শুনেছিলাম হাঙ্গেরিয়ানরা জাতে মঙ্গোলিয়ান কিন্তু এমন একটা লোক দেখতে পেলাম না যার শরীরে এক বিন্দু মঙ্গোল রক্ত আছে। এদিকটা ছিল অষ্ট্রিয়া সম্রাটের অধীনে। অষ্ট্রিয়ানরা নরডিক। নরডিক সভ্যতা অন্যধরণের। বাড়িঘরও তারা যে রকমে করে তাতে বিশেষত্ব আছে। নরডিকদের মস্তবড় বাড়িরও প্রবেশ পথ ছোট। বলকানের ছোট

ঘরে প্রবেশ করতেও সম্ভবত একটা দরজা দেখতে পাওয়া যায়। আবহাওয়া এখানে কোনরূপ প্রাধান্য স্থাপন করতে পারেনি। নাইসেড পৌঁছা পর্যন্ত পথে কোথাও গ্রাম পেলাম না। দূরে দূরে ফার্মহাউসগুলি দেখতে পেলাম, কিন্তু পথের পাশে সেগুলি পড়ে না বলে গোলাবাড়িতে যাইনি।

নাইসেডে পৌঁছে একটি বড় হোটেলে উঠি। হাতে বেশ অর্থ ছিল, সেজন্যই বড় হোটেলে উঠতে কোনরূপ দ্বিধা হয়নি। হোটেল ঠিক করে পথের কাছে দাঁড়িয়ে পথের দৃশ্য দেখছিলাম। হঠাৎ চোখে একটি অপরূপ দৃশ্য পড়ল। একটি ছেলে যাচ্ছিল। তার সুন্দর পীঙ্গল চোখ মাথায় লাল বর্ণের কোঁকড়ানো চুল। শরীরের গঠনও নরডিক ধরনের। ছেলেটিকে দেখেই আমি এক লাফে হোটেলে গিয়ে হোটেল ম্যানেজারকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করলাম এই ছেলেটি কোন জাতের? হোটেল ম্যানেজার ছেলেটিকে ডেকে এনে তার জাতের পরিচয় চাইলেন।

সে বলল তারা জাতে অষ্ট্রিয়ান। জাতে অষ্ট্রিয়ান শুনে আমি আর কিছুই বললাম না। হোটেল ম্যানেজারও জাতে অষ্ট্রিয়ান তবে তিনি নিজকে ভিনিক (ভিয়েনার লোক) বলে পরিচয় দেন না। যখনই তাঁর জাত জিজ্ঞাসা করেছি তখনই তিনি নিজেকে ডাচ বলেই পরিচয় দিয়েছেন। ভিনিক এবং অষ্ট্রিয়ান এই দুইটি শব্দ ভার্সাই সন্ধির পর অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর পুরান ডাচদের নূতন করে দেওয়া হয়েছে। যারা নূতন অষ্ট্রিয়ার পক্ষপাতী নয় তারা ভুলেও নিজেকে ভিনিক ব'লে পরিচয় দেয় না, ডাচ বলেই পরিচয় দেয়। দুঃখের বিষয় এখানে হাঙ্গেরিয়ান জমিদারদের এত প্রাধান্য যে, শহরের হাঙ্গেরিয়ানরা এখনও তাদের জমিদার দেখলেই মাথানত করে রাখে।

রাত্রে একজন হাঙ্গেরিয়ান জমিদার হোটেলের কাছেই একটি খাবারের দোকান ভাড়া করে কতকগুলি মজুরকে ভোজন করাচ্ছিলেন। দৃশ্যটি দেখবার মত বলেই আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে একটি জানালায় দাঁড়িয়েছিলাম। সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে এসব দেখা বড়ই অন্যায় এবং আমার মত বিদেশীর পক্ষে দাঁড়িয়ে দেখা অসম্মানজনক।

জমিদার মশায় আসার আগেই হাঙ্গেরিয়ান্ চাষারা নানা রকমের পোশাক পরে আসে পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। চাষারা ভয়ানক দরিদ্র। কেউ সাদা কোটের নীচে কালো প্যাণ্ট পরেছিল। কেউ বা রং বেরংএর সার্টের উপর বাটারফ্লাই নেকটাই লাগিয়ে শিশ্ দিচ্ছিল। এত দূর থেকে তাদের পায়ের জুতা কেমন তা দেখবার সুবিধা হয়নি। রাত নয়টার সময় জমিদার মশায় কয়েকজন পুলিশ নিয়ে খাবারের দোকানে উপস্থিত হলেন। তিনি আসামাত্র চাষারা হর্ষ-সূচক চীৎকার করল। প্রথমতঃ জমিদার এবং জম্‌কালো উর্দী-পরা পুলিশ টেবিলের এক পাশে বসল, তারপর চাষাদের নাম ধরে একজন লোক ডাকতে লাগল, আর চাষারা নিজের নাম শোনা মাত্র মাথার টুপি খুলে রেঁস্তোরায় গিয়ে বসতে লাগল। চাষারা বসলে প্রত্যেকের গ্লাসে বিয়ার ঢেলে দেওয়া হল, তারপর চাষারা তাদের জমিদারের মঙ্গল কামনা করে বিয়ার খেল। জমিদার এবং পুলিশরা বিয়ারের গ্লাসে মুখ দিল মাত্র, চাষারা কিন্তু এক নিশ্বাসে বিয়ারের গ্লাস নিঃশেষ করেছিল।

বিয়ার খাওয়া হয়ে গেলে এল জলের গ্লাস এবং মোটা মোটা ইহুদী রুটি। এদিকে ইহুদী রুটিরই প্রচলন বেশি কারণ ইহুদী রুটি বেশ সস্তা এবং বলকারক। রুটি দেবার পরই এক বাটি করে সুপ (তার বাংলা ঝোল হতে পারে না)। চাষারা সুপ দিয়েই অর্ধেকখানা করে রুটি খেয়ে নিল। এদের রাক্ষসে খাওয়া দেখে জমিদার হাসছিলেন না, তবে তার মুখ অনেকটা বিবর্ণ হয়েছিল। তারপর এল আলুসিদ্ধ আর ড্রিপিং, এ দুটো পদও প্রচুর পরিমাণে দেওয়া হয়েছিল। তারপর এল বড় এক টুকরা করে মাংস এবং কপি সিদ্ধ। এখানেই খাওয়া শেষ। খাবার পর আবার বিয়ার দেওয়া হতে লাগল। প্রত্যেকটি চাষা কমের পক্ষে তিন মগ করে বিয়ার খেয়ে নাচতে আরম্ভ করে। ওদের নৃত্য বেশিক্ষণ হয়নি। পুলিশরা উঠে দাঁড়াল এবং জমিদার মশায়ও দাঁড়ালেন। নৃত্য সমাপ্ত হল। জমিদার সকলকে লক্ষ্য ক'রে কি বলে মোটরে গিয়ে বসলেন। মোটর চলল, চাষারাও গান গাইতে গাইতে তার পেছন পেছন চলল। এই জমিদার মশায়ই নাকি ভয়ানক জনপ্রিয়। আমাদের দেশের জনপ্রিয় নায়কগণও অনেক সময় হরিজন অথবা অবর্ণ হিন্দুদের একই সঙ্গে বসে ভোজন করেন কিন্তু তাতে কতটুকু আন্তরিকতা আছে কে জানে! হাঙ্গেরিয়ান্ জমিদারের চাষা-ভোজন আমাদের দেশের কাঙ্গালী ভোজনের মতই মনে হচ্ছিল।

সকাল হল। পূর্বদিকের সূর্য প্রথম প্রথম বেশ সুন্দরই মনে হচ্ছিল কিন্তু লোকজন পথে চলতে আরম্ভ করায় পথের বালি ক্রমেই হোটেলের দ্বারে এসে পড়ায় সুন্দর সূর্যালোকের আভাও বিশ্রী দেখাতে লাগল। বাইরে যাবার মোটেই ইচ্ছা হচ্ছিল না। বসে বসেই একখানা হাঙ্গেরিয়ান সংবাদপত্র দেখছিলাম। হাঙ্গেরী শব্দটি লেখা হয় মাঝারু (Mazaru); সংবাদ পত্রের শুধু অঙ্কগুলিই পড়তে পারছিলাম, আর কোন কথাই বুঝতে পারছিলাম না। আমরা যাকে ইংলিশ অক্ষর বলি এদেশের লোক তাকেই লাটিন অক্ষর বলে। লাটিন অক্ষরেই সংবাদপত্র ছাপা হয়। এখানে যদিও যুগস্লাভিয়ার সরকার স্থাপন হয়েছে তবুও মনে হয়না এখানে রাজা পিটারের কোনরূপ প্রাধান্য আছে। সবই যেন হাঙ্গেরী এবং হাঙ্গেরিয়ান।

সকাল বেলা কোথাও না গিয়ে বিকাল বেলা শহরটা বেড়িয়ে এলাম। দেখলাম এখানে অনেকগুলি লোক আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকে আবার সাইকেল নিয়ে আমার পেছনও ছুটছিল। এদিকে জিপসীদের চলাফেরা কম বলেই, আমি কে তা জানবার জন্য লোক পেছন পেছন আসছিল। শহর বেড়িয়ে আসবার একটি উদ্দেশ্য ছিল। মিঃ জন্ যেন জানতে পারে আমি এখানে এসেছি। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছিল কি না জানিনা তবে বুঝতে পেরেছিলাম এদিকে জিপসীদের চলাফেরা করতেও দেওয়া হয় না। অনেক ভেবেছিল আমি একজন জিপসী, কিন্তু যখন তারা বুঝতে পেরেছিল, দুর্বলতার হাসি আমার মুখে নেই, এবং মাঝে মাঝে সাইকেল থেকে ছেলেদের হাত টেনে জিজ্ঞাসা করতাম, তাদের নাম কি, তারা কোন্ ভাষায় কথা বলে তখন যুবক এবং প্রৌঢ়দের মনে সন্দেহ হচ্ছিল এ লোকটা নিশ্চয়ই

বিদেশী নতুবা সমব্যবহার করতে সাহস করত না। সমব্যবহার করা এবং পাওয়াটাও ছোটবেলার শিক্ষার উপর নির্ভর করে।

হোটেলে ফিরে আসার পর স্থানীয় পুলিশ এবং কতকগুলি যুবক এবং প্রৌঢ় আমার সন্ধান নিতে এসেছিল। আমি তখন রুমে বসেছিলাম। এতগুলি লোক এসেছে দেখে হোটেলের মালিক আমাকে ডেকে আনেন। আগতদের সামনে এসেই একখানা চেয়ারে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কি চায়? হোটেল মালিক বললেন আমার পরিচয় তারা চায়। ভিক্ষাপত্রের বদলে এদের আমি আমার পাসপোর্ট দেখতে দিলাম। পাসপোর্ট দেখেই অনেকের চমক লেগে গেল এবং আমাকে তাদের কায়দায় নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিয়েছিল। এরূপ সম্মান ইউরোপে কেন খাস ইংলণ্ডেও পেয়েছি। অনেক ইংলিশ কুলি কি ভেবে মাথার টুপি উঠিয়ে আমাকে পথে ঘাটে সম্মান দিয়েছে।

সম্মান পেয়ে আমি ক্ষেপে যাইনি। কেন আমাকে সম্মান দিয়েছিল তার কারণ খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়েছিলাম। ইউরোপের মজুর এতই দীন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে, সেই দীন এবং হীন অবস্থার চেয়ে আর দুরবস্থা হতে পারে না। একটু দাম্ভিকতা দেখলেই তারা মনে করত এর পেছনে নিশ্চয়ই কোন শক্তি আছে নতুবা এত হাত পা নেড়ে কথা বলত না। ইউরোপের মজুরে এবং ভারতীয় শিক্ষিত সমাজে বেশ প্রভেদ রয়েছে। ইউরোপের মজুর দাম্ভিকতার গুঁড়ি কেটে শান্ত হয় আর আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নিয়েই সন্তুষ্ট হয়।

যদিও আমার নাম যুগশ্লাভিয়ার কোনও সংবাদপত্রে বের হচ্ছিল না তবু-ও আমার আকৃতি এবং আচার ব্যবহার দেখে প্রত্যেক শহরের লোক অনুভব করত এ লোকটা নিশ্চয়ই নবাগত এবং অনেক দূর থেকে এসেছে। সেদিন দুপুর বেলা আর কোথাও বের হইনি কারণ এখান থেকে হাঙ্গেরীর সীমান্ত রেখা পার হতে হবে এবং সেজন্য এখানে অন্ততপক্ষে তিনচার দিন থেকে শরীরটাকে ঠিক করে নিতে হবে। গত দুই দিনে আমি প্রায় একশত মাইল ভ্রমণ করেছিলাম এতে শরীরটা বেশ দুর্বল হয়েছিল।

যদিও শরীর দুর্বল হয়েছিল তবুও ঘরে বসে থাকা আমার অভ্যাস ছিলনা। সাইকেলে করে শহরের একদিক থেকে অন্যদিকে ঘুরে বেড়াতাম। এদিকে প্রায় শহরেই মজুর গৃহ আছে। মজুররা মজুর গৃহে মামুলী দৈনিক ভাড়া দিয়ে শোবার বিছানা এবং স্বল্প খরচে খাওয়া পায়। মজুর ঘরগুলি কোনটা শহরের ভেতরে আর কোনটা শহরের সীমান্তেও থাকে। মজুরগৃহ খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছিলাম কারণ ভদ্রপাড়ায় গলা শুকিয়ে ওজন করা কথা আমার মোটেই ভাল লাগত না। অবশেষে যে মজুরগৃহটি খুঁজে পেলাম তা নিতান্ত দরিদ্র লোকের। শোবার জন্য আমাদের দেশের চার আনার মত দিয়ে থাকে, এবং আমাদের তিন আনার মত খরচ করে, এরা এক এক বেলা খায়। তারা যা খায় তা বিকেলে খেয়ে এসেছিলাম। কপি পাতা সিদ্ধ জল, ওজনে আধসের হবে, আধসের ওজনের রুটি আর এক পেয়ালা কফি

তাতে চিনি অতি সামান্যই থাকে। কাটা চামচ চুরি হয়ে যায় বলে আমাদের দেশের চার আনার মত সেই দেশের মুদ্রা জমা দিলে কাটা চামচ পাওয়া যায়, নতুবা হাত দিয়েই খেতে হয়।

এত দরিদ্রদের মধ্যেও শিক্ষিত লোক পেয়ে আমি আনন্দিত হয়েছিলাম। তবে সেই শিক্ষিত লোকগুলি রাষ্ট্রনীতি হতে চিরতরে বিদায় নিয়েছে, কারণ তারা বৃদ্ধ। পলিটিক্স দু'রকমের, একটা হল এ্যাকটিভ পলিটিক্স আর অন্যটা হল খেয়ালী পলিটিক্স। এখানে যারা আমার সঙ্গে কথা বলছিল তারা কোন পলিটিক্সেই ছিলনা। তবে তারা সব বুঝত এবং চুপ করে থাকত। চুপ করে থাকা ছাড়া তাদের উপায় ছিল না।

হাঙ্গেরী সীমান্তে

অনেকে বলবেন এত তাড়াতাড়ি শরীর দুর্বল হয় কেন? ক্রমাগত ভ্রমণ করলে শরীর আপনি দুর্বল হয় এবং দীর্ঘ সময়ের মত শরীর বিশ্রাম চায়। আমাদের দেশে অনেকে গৈরিক বস্ত্রধারীদের সঙ্গে পর্যটকদেরও তুলনা করে। এটা একটা মস্ত ভুল। এ ভুলের সংশোধন হবে যখন আমাদের দেশের লোকের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা আসবে। অনেকে হয়ত ভাববেন, ভারতে ফিরে আসার পর আমার মনে এসব কথা মনে হয়েছে, তা কিন্তু সত্য নয়, বিদেশে গেলেই নিজের এবং নিজের জাতের কোথায় ভুল ক্রটী আছে তারই কথা বিদেশের বিষয় বস্তু দেখে মনে হয়। নাইসেডে বসেই আমি এসব চিন্তা করছিলাম।

সেদিন বিকাল বেলা একটি মজুর ঘরে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেকগুলি ইংলিশ জানা লোকের সঙ্গে দেখা হয়। এসব লোকের মধ্যে একজন বিশিষ্ট লোক বসেছিলেন। তিনি বয়সে যুবক এবং জ্ঞানে বৃদ্ধ। যুবকের শরীর খাদ্যাভাবে দুর্বল হয়েছিল। তাঁর পোশাক এতই পুরান ছিল যে আমার মনে হয় এই পোশাকটি তাঁর জন্মের পূর্বে তৈরী হয়েছিল এবং একজনের কাছ থেকে অন্যের কাছে এসে সর্বশেষে পরিচিত যুবকটির কাছে এসেছিল। যুবকটি জাতে ইহুদী ন'ন তবে ইহুদী ভাবাপন্ন। ইন্টারন্যাশনাল জ্ঞান তাঁর কাছে সুপরিচিত। ইন্টারন্যাশনালিজমকেই অনেকে "ইহুদী-ইজম" বলে। যখন কোনও বিষয়-বস্তুকে আমরা যুক্তি দিয়ে হটাতে পারিনা, অথচ তা আমাদের স্বার্থে আঘাত দেয় তখনই আমরা বিষয় বস্তুটিকে একটা বদনাম দিই।

যুবক আমার থাকার স্থানের সন্ধান নিয়েছিলেন। যখন তিনি শুনলেন আমি কোনও সঙ্গতিপন্ন হোটেলে থাকছি তখন তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন। তার মতে মজুর গৃহগুলি পলিটিক্সের আড্ডাস্থল, এসব ঘরে যাওয়া আসা করা পর্যটকের পক্ষে সুবিধাজনক নয় এবং সেদিকে যাওয়া-আসা করলে স্থানীয় পুলিশের দৃষ্টিপথে সহজেই আসা যায়। আমার এতে ভয় করার মত কিছুই ছিল না, কারণ আমি রুশ দেশ ভ্রমণ করে আসিনি। রুশদেশ ভ্রমণ করাটা তখনকার দিনে বিপজ্জনকই ছিল। যারা রুশদেশ ভ্রমণ করে আসত তারা বাধ্য হয়ে

সোভিয়েট রুশের বিরুদ্ধে বই লিখত এবং সত্যকথা চেপে যেত। যারা তা করত না তারাই কারাগারে যেত এবং অমানুষিক অত্যাচারে কারাগারেই জীবন হারাত। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩২ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সোভিয়েট রুশের বিরুদ্ধে একটা প্রবাণ্ড অভিযান চলছিল। তাতে শত্রু মিত্র একত্রে কাজ করতে কোনরূপ কসুর করত না। চাপের চোটে সর্বপ্রথম মিঃ চার্চিলই সোভিয়েট রুশকে মিত্রশক্তি বলে স্বীকার করেছিলেন, তার পূর্বে সোভিয়েট রুশকে সবাই শত্রু বলেই গণ্য করত। এমন শত্রুর দেশ ভ্রমণ এবং সেদেশ সম্বন্ধে বই লেখা বড় লোকদের দ্বারাই সম্ভব হত। এরূপ কথা আমি অনেক পরিচিত এবং অপরিচিত লোকের কাছ থেকেই শুনেছিলাম। এদের কথা যে সত্য তার প্রমাণ ইউরোপীয় কন্‌সালদের কাছে গেলেই বুঝতে পারতাম। তাদের সর্বপ্রথম প্রশ্নই থাকত "Had you been to Russia"—আপনি কি রুশ দেশে গিয়েছিলেন ? আমি যখন বলতাম রুশ দেশে যাইনি তখনই পাসপোর্টে ভিসার সিল পড়ত।

এক কথা বলতে গিয়ে অন্য কথা বলা বড়ই অন্যায়, অতএব এবিষয় পরিত্যাগ করে আসল বিষয়ে আসা যাক। অপরিচিত, শীর্ণ যুবককে নিয়ে বাইরে এসে, বৃক্ষতলে সজ্জিত একটি স্টলে বসা মাত্র স্টলের বয় আমাদের দু'পেয়ালা সিদ্ধ যবের রস খেতে দিল! তাতে দুধ এবং চিনি মেশানো থাকায় পানীয় জিনিসটি বেশ ভালোই লেগেছিল। যবের রস ভাল লাগায় আম তিন পেয়ালা খেয়েছিলাম তাতে রাত্রে পেট পরিষ্কার হয়ে যাওয়ায় পরের দিন হাঙ্গেরীর দিকে রওনা হতে আমায় কোন কষ্ট হয়নি।

যুবকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে আসার পর শুনলাম কে এসে আমার খোঁজ করে গিয়েছিল। অনুমানে বুঝলাম জন্ ছাড়া আর কেউ আমাকে খুঁজতে আসেনি। সেজন্য কোথাও না গিয়ে জনের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অনিশ্চিতের জন্য বসে থাকা বড়ই কষ্টকর। এখানেও দৈনিক লণ্ডন টাইমস্ আসত, জনের অপেক্ষায় বসে তাই পড়তে লাগলাম। সংবাদ পড়া আমার শেষ হয়েছিল। বিজ্ঞাপনগুলিও বেশ মন দিয়েই দেখছিলাম। আমেরিকাতে কোন কোন জাহাজ গ্রেটবৃটেনের কোন কোন বন্দর হতে ছাড়বে তাই ভাল করে পড়ছিলাম, কারণ আমার ইচ্ছা ছিল ইংলণ্ড হতেই আমেরিকা রওনা হব কিন্তু তা আমার হয়ে ওঠেনি। অর্থাভাবই ছিল তার একমাত্র কারণ। পরে আফ্রিকা হয়ে আমেরিকাতে গিয়েছিলাম।

রাত আটটার পর জন্ এসেছিল এবং হোটেলে বেশী সময় না কাটিয়ে আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। তার বাড়ি গরীব পাড়ায় অবস্থিত ছিল না। ইণ্টারন্যাশনাল পাড়াতেই তার বাড়ি ছিল। উভয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে যখন তার বাড়িতে পৌছলাম তখন বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলাম সেখানে অনেকগুলি লোক বসে আছে। নানা জাতীয় লোক ছিল। তারা কথা বলছিল ফ্রেঞ্চ ভাষায়। ইউরোপের সাধারণ ভাষাই হল ফ্রেঞ্চ। যারা ফ্রেঞ্চ জানে তারা যদি একটু চেষ্টা করে তবেই ইংলিশ বুঝতে সক্ষম হয়। আমার পৌছার পরই কয়েকটি লোক জনের মারফতে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করল। তারই উত্তরে আমি বলেছিলাম "অনেক দিন

চাকুরি ছেড়েছি, এখনও আমার মনে বড়কর্তা-ভীতি রয়ে গেছে। বড়কর্তা-ভীতি যে কত হীন এবং মারাত্মক আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন। পারত পক্ষে সেই ভীতিকে সঙ্গে করে কেউ কি কাজ করতে চায়? আপনারা নিশ্চয়ই বলবেন এটা একটা অসহ্য যন্ত্রণা। তারপর আমার নিকটস্থ আত্মীয় স্বজন যত আছে তারা সকলেই দরিদ্র, তাদের পথের ভিখিরীরূপে দেখতে আমার মন চায়না। এসব দুঃখ কষ্ট হতে রেহাই পেতে হলে আপনাদের মত এবং পথ গ্রহণ করাই এক মাত্র কাম্য। এর বেশী আমি আর কি বলতে পারি। আমার কথা শুনে সকলেই সুখী হয়েছিলেন এবং জনের মা যে খাদ্য তৈরী করেছিলেন তা সকলেই খেয়েছিলেন।

জনের মা শূকর মাংসও তৈরী করেছিলেন। উপস্থিত সভ্যদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাদের ধর্মমত শূকর মাংস ভক্ষণ করতে নিষেধ করে কিন্তু কেউ খেতে বসে খাদ্য বিচার করছেন না দেখে আমি মোটেই দুঃখিত হইনি। খাদ্যাখাদ্যের বিচার দরিদ্র এবং ছোটদের মধ্যেই প্রচণ্ডভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, বড়লোক কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। বড়লোকরা খেয়ে হজম করতে পারে, আর ছোটরা নিজের পাকস্থলীই হজম করে স্বর্গে যায়!

জনের বাড়ি থেকে ফিরে আসার পর হোটেলের ম্যানেজার আমার রুমে এসে কি দেখলেন তারপর চলে গেলেন। পরদিন সকালবেলাই আমি সাইকেল নিয়ে জনের বাড়িতে গেলাম এবং জনের সঙ্গে কাছের কতকগুলি গোলাবাড়ি দেখতে গেলাম। তুর্কী হতে আরম্ভ করে অনেক রকমের গোলাবাড়ি আমি দেখেছি কিন্তু এমন বৈচিত্র্যময় গোলাবাড়ি আর কখনও দেখিনি। প্রত্যেকখানা গোলাবাড়ি তিন চেনের বেশী লম্বা নয়। চওড়াও প্রায় তদ্রূপই।

প্রত্যেকটি গোলাবাড়ির ঘরগুলি খড়ের ছাওয়া। চালগুলিও ধনুকের মত বাঁকা। ঘরগুলি দেখলে আমাদের দেশের ঘরের মতই দেখায় কিন্তু ঘরের ভেতরে গিয়ে দেখলে আমাদের চেয়ে অনেক পার্থক্য রয়েছে বলেই মনে হয়।

গোলাবাড়িতে আলু, রসুন আর লঙ্কা উৎপাদন করা হয়। এই মামুলী উৎপাদনের সাহায্যে কি করে একটি পরিবার বাঁচতে পারে তাই ছিল ভাববার কথা। শূকরও কেউ কেউ রাখে, তবে শূকর বাজারে বিক্রী করেনা, কারণ বাজারের ট্যাক্স, জমিদারের ট্যাক্স এসব নানারূপ ট্যাক্স দিয়ে ওদের কিছুই থাকেনা। কিছুই থাকেনা বলে কেউ পারতপক্ষে শূকরও রাখেনা। জমিদার মশাইরা গৃহপালিত জীবের উপর ট্যাক্স বসান শুনে একটু চিন্তিত হয়ে পড়লাম কারণ আমাদের দেশে সেরূপ কোন ট্যাক্স নেই। আমাদের দেশের জমিদার, পুলিশের লোক গরীবের পাঁঠাই বিনা পয়সায় নিয়ে যায় জানতাম। তাও সদাসর্বদা নয়, যখন জমিদার অথবা দারোগা বাবু তদন্তে আসেন তখনই এরূপ হয়, হাঙ্গেরীতে তা না হয়ে একদম ট্যাক্স! তারপর সরকারী ট্যাক্স ত আছেই। নানারূপ ট্যাক্স দিয়ে কি করে হাঙ্গেরীর চাষারা বাঁচে তাই ছিল বিবেচনার বিষয়।

ফার্মগুলি দেখে যখন ফিরছিলাম তখন গোলাবাড়ির লোক আমাদের সোভিয়েট প্রথায় নমস্কার জানিয়েছিল। তাদের বদ্ধমুষ্টি যেন জমিদারের মাথার উপর একদিন উঠবে বলেই মনে হয়েছিল। হাঙ্গেরিয়ান চাষাদের বাড়িতে প্রচুর খাবার খেয়েছিলাম বলে পথের পাশে কোমল ঘাসের উপর দুপুর বেলাটা শুয়ে কাটিয়ে বিকেল বেলা শহরে এসেছিলাম।

হোটেলে আসার পর ম্যানেজার মশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "কোথায় গিয়েছিলেন?"

বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম, "আজ আমার ভ্রমণ সার্থক হয়েছে, আজ যা দেখে এসেছি তাই দিয়েই প্রকাণ্ড একটা বই লেখা হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বই।" হোটেল মালিকও বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কি দেখে এসেছেন? আমি বললাম "আমি পৃথিবীর অনেক দেশ দেখে এসেছি। লোকের আচার ব্যবহার যার অপর নাম হ'ল কৃষ্টি তাই দেখাই হ'ল আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। আপনাদের শহরে শহরে ঘুরে সেরূপ কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। সবগুলি শহরই একরকম। আজ তাই গ্রাম দেখতে গিয়েছিলাম। গ্রামে গিয়ে দেখলাম হাঙ্গেরিয়ানরা ঠিক ঠিকই জাতে মঙ্গোল। তাদের ঘর প্রস্তুত প্রণালীটা অবিকল চীনাদের মতই, আমি শুধু চীন ভ্রমণ করিনি, মধ্য এশিয়াও ভ্রমণ করেছি (মধ্য-এশিয়া আমি ভ্রমণ করি নাই)। মধ্য-এশিয়ার মোঙ্গলদের সভ্যতার সঙ্গে এদের বেশ মিল রয়েছে।" ম্যানেজার আমার কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন এবং বললেন, "সে যা হ'ক আপনি যাদের সঙ্গে গ্রামে গিয়েছিলেন তারা কিন্তু ভাল লোক নয়, তারা সকলের শত্রু। ঈশ্বরে ওরা বিশ্বাস করে না, আবার বলে কিনা সকলের সমান অধিকার চাই। আমার হোটেলখানা বদ্‌মাস্‌রা দখল করবে আর আমি যাব বেকারদের ঘরে, তা কখনো হতে পারে, যীশু খ্রীষ্ট আমাদের এই শয়তানদের হাত থেকে রক্ষা করুন।"

ভেবেছিলাম লোকটা হোটেলের ম্যানেজার, এখন শুনলাম সে হ'ল হোটেলের মালিক। লোকটার সঙ্গে কথা বাড়ানো উচিত হবেনা ভেবে চুপ করেই রইলাম। তবে এটা বুঝলাম হোটেল মালিকের সঙ্গে গোপনীয় পুলিশের বেশ সম্বন্ধ রয়েছে নতুবা জনের সঙ্গে গোলাবাড়িতে গিয়েছিলাম সে কথা কি করে জানল? তাকে বললাম "কাল সকালেই আমি এখান থেকে বিদায় নেব।" আমার কথা শুনে সে বলল "তাই করবেন, এসব বদ্‌মাস হতে দূরে থাকাই আপনার কর্তব্য। কাল সকালে কিছু নিশ্চয়ই খেয়ে যাবেন?"

"হাঁ তাই খাব, তবে ঐ কাছের রেঁস্তোরায় নয়, একটু এগিয়ে যখন একটু ক্ষুধা হবে। আমার কথা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন?" হাঁ, বলেই হোটেল ওয়ালা বিদায় নিল।

ঘুম থেকে উঠেই তাড়াতাড়ি করে ম্যাপ্‌টা দেখে নিলাম। হিসাব করে দেখলাম আমার সামনে আরও একশ' মাইল। ইচ্ছা করলে দুদিনেই একশ' মাইল ধীরে সুস্থিরে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু এই এলাকাটা দুদিনে চলে গেলে অনেক কিছুই দেখতে পাওয়া যাবেনা। স্বাধীন দেশের পরাধীনদের জীবন কি করে কাটে তা দেখবার

ইচ্ছা হ'ল, তাই ধীরে সুস্থিরে নাইসেড শহর থেকে বের হলাম। শহরের বাইরে জন্ দাঁড়িয়ে ছিল। সাইকেল থেকে নেমে তার সঙ্গে করমর্দন করলাম এবং বিদায় দিতে বললাম। জন্ আমাকে বিদায় দেবার পূর্বে কয়েকটি কথা বলেছিল। সে বলেছিল বল্কানে আবার আগুন প্রজ্বলিত হবে। সেই আগুনে বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী সমেত এদেশের ধনী এবং জমিদারও পুড়ে ছাই হবে। জনের কথা অনেকটা ঠিক হয়েছে, বাকিটাও হবে বলেই আমার ধারণা। জনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শূন্য মনে আকাশের দিকে চেয়ে এগিয়ে চল্‌লাম।

যুগশ্লাভিয়া একটি ছোট খাট সাম্রাজ্য। তাতে নানা জাতের লোক বাস করে। নূতন রাজ্যও যুগশ্লাভিয়ার ভেতরে আপনি যেন এসে পড়ছে, সেজন্যই নূতন সীমান্ত রাজ্যের প্রতি যুগশ্লাভ সম্রাটের অবহেলা। নূতন সাম্রাজ্যে এসেছে রুমেনিয়ান্ জার্মান এবং হংগেরিয়ান। এসব জাত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে ভালবাসে, সেজন্য পথ রক্ষণাবেক্ষণের ভারও এদের উপরই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশের লোক পথের উপর আবর্জনা এনে ফেলে। আমাদের দেশের লোক ভাবে পথ তাদের নয়, পথ থাকুক আর না থাকুক তাতে তাদের কোন ক্ষতি নাই। এদিকে কিন্তু তার বিপরীত দেখতে পেলাম। অরক্ষণীয় পথের উপর কেউ আবর্জনা ফেলেনা; ভাঙ্গা পথকে যথাসম্ভব ব্যবহারের উপযুক্ত করেই রাখার চেষ্টা সকলেই করে। সকলেই ভাবে পথ তাদের। তাদের পথ যদি তারা না রক্ষা করে তবে সেপথ শ্লাভ-সরকার রক্ষা করবেনা।

অরক্ষণীয় পথের উপর দিয়ে চলছিলাম এবং ভাবছিলাম ভার্সাই সন্ধির কথা। ভার্সাই সন্ধি শুধু ইউরোপেই আরোপিত হয়নি। এর পূর্বেও কম্বোজ এবং লোয়বক্ষ শ্যামদেশ হতে কেড়ে নিয়ে ইন্দোচীনে সংযোগ করা হয়েছে। তবে এটা হল এশিয়াটিক দেশ। ভক্ত এবং বিদ্বানে এদেশ ভর্তি, সেজন্য পলিটিক্স নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, কিন্তু এযে ইউরোপ—এদেশের লোকের জীবনই হ'ল পলিটিক্স, সেজন্য তারা নিজের স্বার্থের দিকে অতি অল্পই তাকায় কিন্তু তারা জাতীয় স্বার্থই বেশি দেখে এবং তা ভাল করে বোঝে।

ভাঙা পথের উপর চলে কোমরে ব্যথা হয়েছিল। ভাবছিলাম সেদিন কমের পক্ষে পঞ্চাশ মাইল যেতে পারব কিন্তু পঁচিশ মাইল যাবার পর একখানা গ্রাম পেয়ে আর অগ্রসর না হয়ে গ্রামেই থেকে গেলাম। এখানে কিন্তু অন্য অবস্থা। এখানকার পলিটিক্স অন্য ধরনের। এই গ্রামের লোক যেন সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছে। কাজ কর্ম বড় বেশি করেনা; যা না করলে নয় তাই শুধু করে যায়। গ্রামের শিশুরা পর্যন্ত যেন হাসতে চায়না। যুবক যুবতীর মধ্যে "কানুর পিরীতি" দেখতে পাওয়া যায় না। সকলেই যেন পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করছে। সেই পরিবর্তন আর কিছুই নয়, বৃটিশ এবং ফ্রেঞ্চদের ভার্সাই সন্ধির বোঝা ঠেলে ফেলে দেবার শুভ মুহূর্তের আগমনের অপেক্ষা।

এখানে পর্যটকের অনেক সম্মান। পর্যটকের কাছ থেকে লোক পৃথিবীর সংবাদ জানতে চায়। গ্রামবাসী নানা ভাষায় এবং ইঙ্গিতের সাহায্যে আমার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করে, তারা যা চাইছিল তা পেয়েছিল। সংবাদ তাদের আমি দিয়েছিলাম। যুগশ্লাভ পুলিশ কিন্তু অনবরত পাহারায় ছিল। যুগশ্লাভ পুলিশ যে ভাবে লোকের চলাফেরা লক্ষ্য করছিল তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল গ্রামের লোকের প্রতি তাদের কোনরূপ সহানুভূতি নেই। গ্রামবাসীও তেমনি পুলিশের সাহায্যপ্রার্থী হয় না। এটা কি কম কথা! রাষ্ট্রনৈতিক জাগরণ যাদের ভেতর জাগে তারা এমনই হয়ে থাকে।

গ্রামে রাত কাটিয়ে পরের দিন আবার পথে এলাম। পথের ঠিক মাঝখানে এক খানা ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। যে ঘোড়াটি গাড়িখানাকে টানছিল সে ঘোড়াটা হঠাৎ পড়ে যায় এবং পা ভেঙ্গে ফেলে। পিচ দেওয়া পথের ঠিক মাঝখানে একটা গর্ত হয়েছিল। সেই গর্তেই ঘোড়াটার পা আটকে যায়। আমার পৌঁছুবার আগেই লোকজন এসেছিল। এদিকের লোক কোনরূপ আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারে না। পা ভাঙ্গা ঘোড়াকে হত্যা করাই রীতি। হত্যা করতে হলে পিস্তলের দরকার। পিস্তল পুলিশেরই থাকে। পুলিশের কাছে লোক গিয়েছিল। পুলিশ এল। ঘোড়া হত্যা করা পশুর ডাক্তারের কাজ। পশুর ডাক্তার সুভটিকা (Subotica)-তে থাকেন। সুভটিকা সেণ্ট বিছা (St: BECE) হতে পঁচাত্তর মাইল দূরে। পুলিশ ঘোড়াটিকে হত্যা না করে সেণ্ট বিছাতে ঘোড়ার মালিককে পাঠাল। উপায়ান্তর না দেখে ঘোড়ার মালিক সেদিকেই রওনা দিল। গ্রামের লোক ঘোড়াটাকে ভাল করে ঢেকে পথেরই পাশে একটি কবর খুঁড়তে লেগে গেল। এই অঞ্চলের লোক যখন স্বাধীন ছিল তখন এরূপ হত্যা কাজের জন্য গ্রামের প্রধানের কাছেই পিস্তল বন্দুক পেত। যুগশ্লাভ সরকার গ্রামের প্রধানদের মোটেই বিশ্বাস করেনা বলে পিস্তল রাখতেও দেয় না। এটাকেই বলে পরাধীনতা। পরাধীনতা অনেকের গা সওয়া হয়ে যায়, অনেকের হয় না। ইউরোপের লোক পরাধীনতা সহ্য করতে পারে না।

আমাকে অনেক দূর যেতে হবে সেজন্য পথে আর দাঁড়ালাম না। এক চোটে এক চল্লিশ কিলমিটার পথ চলে সেণ্টা (Senta) নামক স্থানে পৌঁছুলাম। সেণ্টার কাছ দিয়ে দানিয়ুব নদী বয়ে চলছে। দানিয়ুবের জল এখানে বেশ পরিষ্কার, তবে নদীর জল কেউ ব্যবহার করে না। ইচ্ছা হয়েছিল নদীতে একটু স্নান করে নিই। স্নান করব ঠিক করে জুতা এবং মোজা খোলার পরই এক দল লোক আমাকে ঘিরে ফেলে। তাদের উদ্দেশ্য, আমার শরীরের বস্ত্রাবৃত অংশের কি রং তাই তারা দেখবে। বেগতিক দেখে আমি শুধু হাত পা ধুয়েই গ্রামের দিকে অগ্রসর হলাম। যারা আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল তারাও চলে গেল।

এদিককার দৃশ্যাবলী বড়ই সুন্দর। মাঠের সর্বত্র নানা রকমের ফুল ফুটে রয়েছিল। গরুগুলি হে ঘাসের ওপর শুয়ে গিলিত-চর্বণ করছিল। গরুগুলির আকৃতি বাঙ্গলা দেশের গরুর মতই, তবে বিশেষ ভাবে যত্ন করা হয় বলেই শরীরের গঠন একটু

বেড়েছে। আমাদের দেশের পশ্চিমাঞ্চলের গরুর মত একটি গরুও ইউরোপের কোথাও দেখতে পাইনি। সাদা গরু খুব কমই দেখতে পেয়েছি। গরুগুলির দিকে অনেক্ষণ তাকিয়ে, গরুর সম্বন্ধে অনেক কথা ভেবে আমি গ্রামে প্রবেশ করি। এগ্রামে হাঙ্গেরিয়ান এবং জার্মানদের বাস। গ্রামের সাধারণ ভাষা হল দচ্। দচ্ ভাষার সঙ্গে ইংলিশ ভাষার অনেক সাদৃশ্য থাকায় আমার ভাষার দিক দিয়ে এখানে বিশেষ অসুবিধা হয়নি। জার্মানরা বড়ই পায়েস প্রিয়। গ্রামে পৌছেই খাবারের দোকানের উঁগো-সোতে পায়েস দেখে একটি দোকানে প্রবেশ করে পায়েস দিতে বলি। একটি একটি করে যখন পাঁচটি প্লেট শেষ করলাম তখন দোকানী বিল হাজির করতে বাধ্য হ'ল। তার বিল চুকিয়ে দিয়ে আবার যখন পায়েস চাইলাম তখন সে অন্য দোকান দেখিয়ে দিল। অন্য দোকানে গিয়েও পাঁচ পেয়ালা পায়েস খেয়ে অনেকটা তৃপ্ত হলাম এতগুলি পায়েস খেয়েছি, এই সংবাদটি সকলের কাছে অল্প সময়ের মধ্যে গ্রামে প্রচারিত হল। অনেকে আমাকে দেখতে এল। আমি তখন হোটেলে স্থান নিয়েছিলাম।

হাঙ্গেরিয়ান্, স্লাভ, ক্রট, ম্যাসিডোনিয়ান্, গ্রীক, এসব জাত দই, দুধ পনীরই খায় বেশি, পায়স খুব কমই খায়। নরডিকরাই পায়সের পক্ষপাতী।

নরডিক জাত পায়স যেমন ভালবাসে তেমনি ভালবাসে পপী ফুল। গরু, পপীফুল আর নরডিক জাতের লোক একত্রে দেখতে পাওয়া যায়। পপীফুল সাদা, লাল, নীল, এবং হল্‌দে রং‌এর হয়। নরডিকরা ফুল দিয়ে ঘর সাজায়, নিজে সজ্জিত হয়, আর স্লাভরা কচি ঘাস দিয়ে ঘর সজ্জিত করে। পুতুল পূজা এরা করেনা। পুতুল পূজাকে তারা "পটারীর প্রশংসা" বলেই গণ্য করে। অষ্ট্রিয়ায় প্রায়ই পথের পাশে যীশুর মূর্তি দেখা যায়। যীশুর মূর্তি দেখা মাত্র রোমান ক্যাথলিকরা নাকে এবং বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকে। সকলে কিন্তু তা করেনা। অনেকেই "পটারীর প্রশংসা" করতে রাজি হয় না। যারা কৃষ্টির চর্চা করেন তারা ভেবে দেখবেন নরডিকরা কেন পপী ফুল দিয়ে ঘর সাজায় আর শ্লাভরা কেন কচি ঘাস দিয়ে শুধু ঘর নয়, ঘরের মেজে পর্যন্ত আবৃত করে রাখতে ভালবাসে?

এখানে অনেকেই আমার জাতের পরিচয় চেয়েছিল। জার্মানরা ভেবেছিল আমি একজন কালো জার্মান, কারণ পায়স আমি ভালবাসি। আমার জাতের পরিচয় পেয়ে তারা বলেছিল "ইন্দো-ইউরোপীয়ান"। শহরে থাকবার এবং খাবারের বেশ সুবিধা হয়েছিল এবং দিনটা আনন্দেই কেটেছিল।

সেণ্টা হতে ফাঁড়ি পথে "সুভাটিকা" আসি এবং একটি বড় হোটেলে স্থান নিই। আগে এই বাড়িতে একটি হাসপাতাল স্থাপিত ছিল কিন্তু যুগশ্লাভিয়া সরকার সুভাটিকা গ্রহণ করার পর থেকে এখানে হাসপাতালের বদলে হোটেল হয়েছে। হাসপাতালে নানা রকমের রিসার্চ চলত, যুগশ্লাভিয়া সরকার যাতে রিসার্চের ফল ভোগ না করতে পারেন সেজন্য যন্ত্রপাতি সরিয়ে হাঙ্গেরীর সেগিডিনে (SEGEDIN) সরিয়ে ফেলা

হয়েছিল। হাসপাতাল হোটেলে পরিবর্তিত করার পর তার নাম হয়েছিল টলস্টয় হোটেল। খাবারেরও বন্দোবস্ত ছিল। এতে আমার বেশ সুবিধা হয় এবং আরাম করে এখানে পরের দিনও থাকি। দুঃখের বিষয় শহরটি ক্রমেই লোকশূন্য হতে চলেছিল, তার এক মাত্র কারণ হ'ল, যুগশ্লাভিয়া সরকারের সকল কাজে অবহেলা। যুগশ্লাভিয়া সরকারও যেন চেয়েছিলেন শহরটি ধ্বংস হয়ে যাক। এরূপ মনোভাব হবার এক মাত্র কারণ হ'ল, কোনদিন হাঙ্গেরী যুগশ্লাভিয়ার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে তার লুপ্তরাজ্য পুনরুদ্ধার করার জন্য। এখানে ছিল পুলিশের বড়ই বাড়াবাড়ি। বাড়িতে বাড়িতে মামুলী কারণে অনুসন্ধান করা, কমিউনিস্ট বলে যাকে তাকে সন্দেহ করা, ব্যবসায়ীদের প্রতি নানারূপ অত্যাচার করা, যুগশ্লাভ সরকারের যেন একটা পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্যই শহরের লোক্ হাঙ্গেরীতে ক্রমে চলে যাচ্ছিল। এরকম জায়গায় বাইরে গিয়ে লোকের সঙ্গে মেলামেশা করা ভাল হবে না ভেবে হোটেলেই সময় কাটিয়ে ছিলাম। পুলিশ কিন্তু নীরব ছিলনা। আমার কাছে এসেও নানা প্রশ্ন করতে চেয়েছিল। কিন্তু যুগশ্লাভ সরকারের দুর্বলতা কোথায় তা আমি জানতাম তাই পাসপোর্ট খানা দেখানো মাত্রই পুলিশ মশাইরা মাথা নত করে হোটেল থেকে চলে গিয়েছিল। যুগশ্লাভের পুলিশ বৃটিশের লোককে সম্মান এবং ভয় করত। মারশেল টিটো বৃটিশের সকল অহঙ্কার চূর্ণ করে যুগশ্লাভিয়ায় বর্তমানে সোসিয়েলিস্ট সরকার গঠন করেছেন। মানুষ যা চাইছিল তাই পেয়ে গেছে। রাজা পিটার যুগশ্লাভিয়ায় আর ফিরতে পারবেন কি না তাও সন্দেহের বিষয়। এক দিনে কিছুই গড়ে ওঠে না। অনেক দিনের কর্ম্মতৎপরতার ফলে টিটোর মত লোকের উদ্ভব হয়েছে। যুগশ্লাভিয়ার লোক নানা স্তরের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে আজ জাত্যভিমান এবং গোষ্টিস্বার্থ ভুলতে পেরেছে।

তৃতীয় দিন সকালবেলায় হোটেল পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। কারণ সীমান্ত পার হতে হবে। সীমান্ত পার হবার সময় নানা রূপ হাঙ্গামা পোয়াতে হয়। যুগশ্লাভ সীমান্তে পৌঁছেই সাইকেলের জন্য জমা তিন শত আশী দিনার ফেরত চাইলাম। ফেরত দেবার সময় কিন্তু সবগুলি দিনার ফেরত পেলাম না। তিন শত পয়সট্টি দিনার ফেরত পেলাম। সবগুলি মুদ্রা কেন দেবেনা তা জিজ্ঞাসা করলাম, তার জন্য কোনও ভাল উত্তর পেলামনা। অন্যের দেশ থেকে যে মানে মানে চলে আসতে পেরেছি তাই ভেবেই সুখী হলাম।

হাঙ্গেরী

হাঙ্গেরীর অপর নাম "মাঝারু"। এই একটি কথা ছাড়া আমি আর কোনও হাঙ্গেরিয়ান্ ভাষা শিক্ষা করবার সুযোগ পাইনি। হাঙ্গেরীতে জার্মান এবং ফ্রেঞ্চ ভাষার প্রচলন থাকায় হাঙ্গেরিয়ান ভাষা শিক্ষা করার কোন দরকার হয়না। গোটা হাঙ্গেরী দেশ ভ্রমণ করে কোথাও মোঙ্গল রক্তের চিহ্ন পাইনি। মালয় দেশে যেমন করে মালয় জাত লোপ পেতে বসেছে এবং তাদেরই স্থানে চীনারা স্থান নিয়েছে তেমনি বোধহয় হাঙ্গেরীতেও মোঙ্গল বংশ ধ্বংস হয়েছে এবং তাদেরই স্থানে অন্যান্য জাতের লোক বসবাস আরম্ভ করেছে। মালয় দেশে কিন্তু মালয় ভাষা অক্ষয় হয়ে রয়েছে। চীনা, জাপানী এমন কি একগুয়ে বৃটিশ পর্যন্ত মালয় ভাষা শিক্ষা করে মালয়দের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়। মালয়রা কিন্তু কারো ভাষা শিক্ষা করে না, তারা অপরের ভাষা নিজের ভাষায় এনে ব্যবহার করতে কোনরূপ কসুর করেনা, এখানেও হয়ত ঠিক তেমনি কিছু ঘটেছে। হাঙ্গেরিয়ানরা লোপ পেয়েছে কিন্তু তাদের ভাষা এখনও পূর্ণ দম্ভে তাদের দেশে বিরাজ করছে।

যুগশ্লাভিয়ার সীমান্ত পেরিয়ে যাবার পরই এক দল হাঙ্গেরিয়ান সেপাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়। তারা পথ দেখিয়ে আমাকে তাদের সীমান্ত অপিসে নিয়ে যায়। সীমান্ত অফিসার অন্যান্য কয়জন অফিসারকে নিয়ে আমার সম্বন্ধেই বাক্যালাপ করতে থাকেন। প্রশ্ন উঠেছিল—আমার কাছ থেকে ভিসা দেবার জন্য ফি চার্জ করা যায় কিনা। একজন অফিসার বললেন, "আমরা এই লোকটিকে এখন যুগশ্লাভিয়া হতে আগত মনে করব। তাঁর সঙ্গে সাইকেলের ত্রিপটিক-এর বাবদ ট্যাক্স আদায় করা ছাড়া আমাদের আর করবার কছুই নেই।" তৎক্ষণাৎ আমার কাছ থেকে বাহাত্তর পেঙ্গা (Penga), পঁয়তাল্লিশ টাকার মত জমা রেখে ছেড়ে দেওয়া হ'ল। কাস্টম অফিসার আমাকে একখানা ম্যাপ দিয়ে বললেন, "মানচিত্রে আমাদের পূর্বগৌরব দেখুন আর বর্তমানে আমাদের কি অবস্থা হয়েছে তার প্রতি যদি চেয়ে দেখুন, তবে ভার্সাই সন্ধিকে অমানুষিকতার আসল মূর্তি বলেই গ্রহণ করবেন। বিনা বাক্য ব্যয়ে স্থান ত্যাগ করে সিগিদিনের (Sigidin) দিকে অগ্রসর হলাম। সিগিদিন সেখান থেকে পাঁচ কিলমিটার মাত্র। আমি সাইকেলখানা ডান হাতের দিকে (Keep to right) রেখেই চলছিলাম। কতকক্ষণ পর একখানা মোটরকার আমার পেছন দিকে এসে ইঙ্গিতে বলল এবং একখানা কাগজে লিখল (Keep to the left) সাইকেল বামদিকে চালান। ইউরোপের গ্রেটবৃটেন এবং হাঙ্গেরী ছাড়া আর কোথাও ট্রাফিক বাঁদিকে চালাবার নিয়ম নাই। সিরিয়া থেকে আরম্ভ করে যুগশ্লাভিয়া পর্যন্ত সাইকেল ডানদিকে চালিয়ে এমন অভ্যাস হয়েছিল যে আপনা হতেই সাইকেল পথের ডানদিকে চলে যেত। কিন্তু এটা ইউরোপ এবং তখন ইউরোপে শান্তি বিরাজ করছিল। তখন অনর্থক নরহত্যা করা অন্যায় কাজ ছিল। অথচ মালয় দেশে ছুটো

অস্ট্রেলিয়ান আমাকে মোটর চাপা দিয়ে আমার পৃথিবী ভ্রমণের অবসান জহোর বারুর কাছেই সমাপ্ত করতে চেয়েছিল। স্থান ভেদে মানুষের মনের গতিও বদলায়। যে ভদ্রলোক পেছন থেকে মোটর চালিয়ে এসেছিলেন তিনি ইচ্ছা করলেই আমাকে হত্যা করতে পারতেন অথচ আইন মতে তার কোন শাস্তি হ'ত না। একেই বলে স্থান-মাহাত্ম্য

সিগিদিন পৌঁছবার পর এক মহা বিপদে পড়লাম। চারিদিক থেকে লোক ছুটে আসতে লাগল এবং আমার ডাইনে বাঁয়ে, সম্মুখে পেছনে চলতে লাগল। ক্রমেই লোক বাড়তে লাগল। বেগতিক দেখে আমি মস্তবড় একটা বাড়িতে ঢুকে পড়লাম। সেটা ছিল একটা হোটেল। এতবড় হোটেলে থাকা আমার মত লোকের পোষায় না। আরও আশ্চর্যের বিষয় হোটেলের মালিক ছিলেন একজন ইংলিশ জানা লোক। তিনি আমাকে দেখেই বললেন "এই তুই কি আবিসিনিয়া হতে এসেছিস্ ?" আমি তাকে ভদ্র ভাবে বললাম, "না মহাশয় আমি একজন হিন্দু।" হোটেলের মালিক আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে বললেন, "আরব দেশের মরুভূমি পেরিয়ে এসেছেন কিনা সে জন্যই আপনার মুখ কালো হয়ে গেছে। কয়েক দিন গরম জলে স্নান করলেই শরীরের রং বদলে যাবে।" আমি হোটেলের মালিককে জিজ্ঞাসা করলাম "এই লোকগুলি কি আমাকে আবিসিনিয়ান ভেবেই পেছন নিয়েছে ?" "নিশ্চয় তাই, তবে আমরা আবিসিনিয়ানদের জয় কামনাই করেছিলাম। আবিসিনিয়ার জয় না হয়ে পরাজয় হচ্ছে। ইটালিয়ানরা বিষবাষ্প ছাড়ছে কিনা, সেজন্যই এই কাণ্ড। আবিসিনিয়ার জয় একদিন হবেই সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত।"

হাঙ্গেরীর সর্বত্র আবিসিনিয়া-প্রীতি লক্ষ্য করেছি, এমন কি ইংলণ্ডে যাবার পর ইংরেজদেরও আবিসিনিয়ার প্রতি একটা সহানুভূতি ছিল তা জানতে পেরেছি কিন্তু ছত্রধারী রাইট আনারেবল চেম্বারলেন কুমীরের মত চোখের জল ফেলে মুসোলিনীকে স্থয়েজ খাল খুলে দিয়েছিলেন। মঁশিয়ে দালাদিয়ের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয়গান গেয়ে জিবুতীর রেলপথ ইটালিয়ানদের সৈন্য অবতরণের জন্য মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ইউরোপের সাধারণ লোক তা জানত এবং ইম্পিরিয়েলিস্ট এবং ফ্যাসিস্ট জুঠাকে মনে প্রাণে ঘৃণা করত। অবশ্য সকলে নয়। অনেকে বলত, বর্বরদের মানুষ করতে হলে অত্যাচার একটু আধটু করতে হয়ই। বিষ বাষ্প ছেড়ে বর্বরদের সায়েস্তা করার বদলে সভ্য ভাষায় শিক্ষা দেওয়া বলে। সাম্রাজ্যবাদী এবং ফ্যাসিস্টরা সেরূপ ভাষারই প্রয়োগ করত।

হোটেলের মালিক অনেক বছর ইংলণ্ডে ছিলেন বলে তাঁর ইংলিশ উচ্চারণ ইংরেজদের মতই হয়েছিল। আমি ইংলিশ রায়ত বলে দৈনিক তিন পেঙ্গায় আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল, যদিও হোটেলে খাবারের কোন বন্দোবস্ত ছিল না তবুও হোটেল মালিক আমাকে তাঁরই সঙ্গে খেয়ে পয়সা বাঁচাবার পথ বাতলিয়ে দিয়েছিলেন।

এখানে আর একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছিল। পরের দিন দুপুরবেলা হোটেল ম্যানেজার বললেন, তারই হোটেলের ঠিক বিপরীত দিকে একজন ভারতবাসী বাস করেন। আমি সেই ভারতবাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাঁর দেখা পাইনি, দেখা হয়েছিল তার নাবালক ছেলের সঙ্গে। অল্প সময়ের মধ্যেই ছেলেটির সঙ্গে বেশ ভাব হয়। লক্ষ্য করে দেখলাম ছেলেটি যেন তার নিজের ঘরে শান্তিতে নেই। সেজন্য তাকে বাইরে ডেকে নিয়ে এসে বেড়াবার ভাণ করে পথে বের হলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—

ঘরে যে স্ত্রীলোকটি দেখলাম তিনি কি তোমার মা ?

না তিনি আমার মা নন্, তিনি আমার সৎমা। স্ত্রীলোকটী হাঙ্গেরিয়ান। আমার মা ছিলেন জার্মান। তিনি আমার জন্ম হবার পরই মারা যান। এই স্ত্রীলোকটী আমাকে মোটেই পছন্দ করেনা। আর দু এক বছর পরই আমি আমার পথ দেখব।

তোমার বাবা তোমাকে কেমন ভালবাসেন ?

আমার বাবা আমাকে খুব ভালবাসেন তবে আমাকে ঘরে রাখা না রাখা তার হাত নাই।

আমরা আর কোন কথা বললাম না, ঘরে ফিরে এলাম। ছেলেটির সৎমা ছেলেটিকে একটি মোরগ কাটিতে আদেশ দিল। ছেলেটি ইচ্ছা করেই একটা বড় মোরগের মাথা এক টানে ছিঁড়ে ফেলল। বড় মোরগ হত্যা করেছে বলে ছেলের সৎমা ছেলেকে বেশ শাসিয়ে দিল। কিন্তু যে কাজ হয়ে গেছে তা আর ফেরানো যাবেনা বলে আমি ছেলের মাকে কথা না বাড়াতে নিষেধ করলাম।

ছেলের মা বড়ই হিন্দু ভক্ত। হিন্দুনারীরা তাদের স্বামীর কথা মতে চলে, তারা তাদের স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি করে। হিন্দুনারী স্বামীর জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করে। এই রকমের একটি নিরীহ নারীকে ছেলের মা তার ভায়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে সুখী হতে চান। তার ভাইটি হাঙ্গেরীর একটি রাজপুরুষ। তার ঘরে কোন স্ত্রীলোকই এসে থাকতে পারেন না। তিনি নাকি একটু উগ্রপ্রকৃতির। তার ভাইএর পক্ষে হিন্দু রমণীই উপযুক্ত হবে। ছেলেটি কাছেই বসেছিল, সে বললে, "শুধু তাই নয় মারপিটও চলে। জাতে হুন্ বলেই স্ত্রীলোকের প্রতি হাত উঠাতে কোনরূপ দ্বিধা করেনা। জার্মানীতে হলে এই হুনটিকে কোন দিন কে গুলী করে মেরে ফেলত তা কে জানে"। ছেলের কথা শুনে ছেলের বিমাতা রেগে গেলেন এবং বললেন, "জর্জি তুমি এখান থেকে যাও; আমাদের কথায় বাধা দিওনা"। ছেলেটি চলে গেলে আমি ছেলের বিমাতাকে জিজ্ঞাসা করলাম এই ছেলেটির নাম কি জর্জ ?" আরে না, জর্জ হ'ল ইংলিশ নাম, যখনই আমরা কারোকে অপমান করি তখনই তাকে ইংলিশ নাম দেই"। আমি বললাম "তাই বলুন, ছেলের পিতা হ'ল হিন্দু আর নাম হ'ল ইংলিশ তা কি কখনও হয় ? তবে ছেলেটির নাম কি ?" ছেলের বিমাতা বললেন, "ছেলেটির নাম হ'ল সংগ্রাম, জার্মান নাম হল, হার যাবে।"

এদিকে মুরগীর তরকারী রান্না হচ্ছিল। আমি আর বেশিক্ষণ না বসে হোটেলে ফিরে আসার জন্য উঠলাম বললাম, সন্ধ্যার পর আসব, এখন যাই। ছেলের সৎমা বললেন তাই হবে।

সন্ধ্যা সমাগত। হোটেলে বসে সামনের দৃশ্য দেখছিলাম। এমন সময় ভারতীয় ভায়া এসে ইংলিশে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। আমি তাকে বসিয়ে হিন্দুস্থানীতে জিজ্ঞাসা করলাম তার বাড়ি ভারতের কোন প্রদেশে? তিনি বললেন তাঁর বাড়ি সিংহলে। তাকে ইংলিশে কথা বলতে মানা করলাম, কারণ বিদেশে এক জন ভারতীয় অন্যভারতীয়ের সঙ্গে বিদেশী ভাষায় কথা বললে অপমানের বিষয় হয়। তিনিও আমার কথা বুঝতে পেরে হিন্দুস্থানীতে কথা বলতেই রাজি হলেন। হিন্দুস্থানী ভাষা মাদ্রাজীদের কাছে মুসলমানী ভাষা নামে পরিচিত। পারতপক্ষে মাদ্রাজীরা হিন্দুস্থানী বলেনা। বিদেশে সে নিয়ম চলেনা। হিন্দুস্থানী মুসলমানী ভাষাই হোক আর খৃষ্টানী ভাষাই হোক বিদেশে গিয়ে যদি মান ইজ্জত বজায় রাখতে হয় তবে এই ভাষার ব্যবহার করতেই হবে। উর্দু কথাটার মানে আমরা অনেকে জানিনা। আমরা মনে করি এটি একটি আরবী শব্দ। আসলে শব্দটি হল চীনা। তার মানে হ'ল "মিশ্র"। দু তিন ভাষার শব্দ মিলে যে ভাষায় সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় মিশ্র ভাষা, অর্থাৎ উর্দু। উর্দু শব্দের আর একটি মানে আছে তা হ'ল "জারজ"। এসব শব্দের মানে হাঙ্গেরীতে গেলেই লোকে বুঝিয়ে দিয়ে ভারতবাসীর আনন্দ বর্ধন করে। সিংহলী ভদ্রমহাশয় আমাকে তাই বললেন।

রাত আটটার সময় আমরা তাঁর বাড়িতে পৌছুলাম। খাদ্য প্রস্তুতই ছিল। লবাননী সরাব তিনি যোগাড় করেছিলেন। প্রথমে লবাননী সরাব প্রত্যেকে এক পেয়ালা করে খেলেন তারপর মুরগীর মাংস আর ভাত খেতে দেওয়া হল। তারপর রুটি এবং মাংস ভাজা। পায়সও হয়েছিল। পায়স খাবারের পর আবার সবাই মদ খাওয়া আরম্ভ করলেন। হাঙ্গেরিয়ান স্ত্রীলোকটি অত্যধিক মদ খাচ্ছে দেখে আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম, কারণ তার মুখ দিয়ে ক্রমেই আবোল-তাবোল বাজে কথা বের হচ্ছিল। ছেলেটি কিন্তু মদ খাচ্ছিল না। সে আমাকে বলল, "চলুন আপনাকে হোটেলে পৌছে দিয়ে আসি।" তার সঙ্গে পথে বের হওয়া মাত্র সে বললে হাঙ্গেরিয়ান স্ত্রীলোকেরা উগ্র মদ খায়, জার্মান স্ত্রীলোক সেরূপ নয়, তারা বিয়ারও খায় না। যেরূপ ভাবে অকথ্য ভাষা এখনই বলতে আরম্ভ করেছে, পরে কি করবে স্ত্রীলোকটাই জানে।

বাস্তবিকই লবাননী মদের বিশেষত্ব আছে। খাবার সময় মনে হয়েছিল যেন সরবৎ কিন্তু বিছানায় মাথা রাখা মাত্র নেশা হতে লাগল। শরীরটা অবশ হয়ে আসতে লাগল। আমি অজ্ঞান হয়ে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন স্থান ত্যাগ আর হ'ল না। ঘুম থেকে উঠেই মাথার ব্যথা অনুভব করলাম। শয্যা নেওয়া ছাড়া আর উপায় ছিলনা। বিকালের দিকে কতকগুলি কাফেতে

গিয়ে ভিক্ষা করে খরচের টাকা যোগাড় করে আনলাম। অনেকেই সাহায্য করল। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নানা লোক নানা কথা জিজ্ঞাসা করল। যতটুকু পারলাম ততটুকুই বললাম। লক্ষ্য করে দেখলাম এখানকার লোক কোন কথাই অন্তরের সঙ্গে বলছে না, সেজন্য বিশেষ কিছু বলতেও ইচ্ছা হল না। পরের দিন সকাল বেলা আবার পথে এলাম এবং একটি ফাঁড়ি-পথ ধরে বড় পথটাতে পৌছুবার জন্য 'এগিয়ে গেলাম। বড় পথটি বুদাপেস্ত হয়ে ভিয়েনা চলে গেছে এবং সেখান থেকে সেই পথটিই চেকোশ্লভাকিয়ার মধ্য দিয়ে বার্লিনের দিকে চলে গেছে। ফাঁড়ি-পথও খারাপ ছিল না। পিচ দেওয়া পথে চলতে বেশ আরাম লাগছিল। দীন দরিদ্র লোক পায়ে হেঁটে পথ চলছিল। অনেকেরই মুখ অপরিষ্কার এবং শুষ্ক ছিল। পথের পাশের গোলাবাড়িতে গিয়ে দরিদ্র লোক ভিক্ষার বদলে খাবার চাচ্ছিল। যারা পারছিল তারাই দিচ্ছিল আর যারা পারছিল না তারা তাদের নিজেদের অক্ষমতা জানাচ্ছিল।

বড় পথে পৌছুতে পুরা একটি দিন লেগেছিল। পথে দেখা হয়েছিল এক সব্জী ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তার সঙ্গেই শহরে যাই। লোকটি ইঙ্গিতে কথা বলত। বিদেশী ভাষা সে একটিও জানত না। শহরে গিয়েই ঘোড়ার গাড়িটা থামিয়ে আমাকে সে নিয়ে চল্‌ল একটি হোটেলে। হোটেলখানা ছোট এবং তার মালিকও ছিল হাঙ্গেরী জানা লোক। হোটেলের মালিক তার পকেট থেকে ম্যনিব্যাগটা খুলে জানাল, আমার থাকার জন্য এক পয়সাও দিতে হবে না। নিশ্চিন্ত মনে আমি থাকলাম, কিন্তু রাত্রে এল পুলিশ। পুলিশ জানাল আমি যেন এই হোটেল কালই পরিত্যাগ করি। এখানে চোর বদ্‌মাসের আড্ডা। অনেকে হয়ত চোর বদমাসের কথা শুনে ঘাবড়ে যাবেন। আমি কিন্তু সেরূপ লোক ছিলাম না। আমি চোর বদমাস কাদের বলা হয় তা জানতাম, তাই রাত নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পরের দিন চাষা এবং হোটেলওয়ালার কাছে বিদায় নেবার সময় রুমেতেই একটু নাচলাম এবং তাদের বুঝিয়ে দিলাম, তারাই আমার প্রকৃত বন্ধু, পুলিশ বন্ধু নয়। তারাও সুখী হল। তারপর বড় পথে নেমে এলাম।

ঠিক করলাম দশ কিলমিটার চলে একটা সিগারেট খাব। কুড়ি কিলমিটার চলে একটু দাঁড়াব, তিরিশ কিলমিটার চলে দাঁড়িয়ে জল খাব। চল্লিশ কিল মিটার চলে বিশ্রাম করব। তারপর প্রত্যেক দশ কিল মিটার চলে বসব এবং বিশ্রাম করব। পরিকল্পনা অনুযায়ী যাট কিলমিটার চলার পর এল একটা! তারপর আর পরিকল্পনা অনুযায়ী চলা সম্ভব হল না। ক্রমাগত পথ চলাও অসম্ভব হয়ে উঠল। পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে ক্লান্ত শরীরটাকে টেনে নিয়ে যেতে লাগলাম। পাহাড়টা পার হয়ে যাবার পরই দেখলাম বুদাপেস্ত শহর। আমার কি আনন্দ। শরীরে শক্তি বেড়ে গেল, সাইকেল চলতে লাগল। পথে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন ভদ্রলোক। তিনি আমায় ডাকলেন এবং বললেন "চলুন আমার সঙ্গে।" তিনি হলেন একজন

কারখানার মালিক। তার কারখানায় হাজার চারেক লোক খাটে। তিনি আমাকে তাঁর অফিসে নিয়ে বসিয়ে বেশ করে খেতে দিলেন। অম্‌লেট, কেক্, বিস্কুট আর দুধ ছিল প্রচুর পরিমাণে। তারপর নিয়ে গেলেন তাঁর কারখানা দেখতে। কারখানা দেখে আমার তাগ লেগে গেল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি মালিক কি ম্যানেজার ? তিনি বললেন তিনি ম্যানেজার নন্ মালিক। মালিক হয়ে একটা পথের লোকের সঙ্গে ভাব করা কম কথা নয়। ক'লকাতায় যে মালিক চার হাজার লোক খাটায় তার সঙ্গে দেখা করতে হলে দস্তুর মত আবেদন নিবেদন করতে হয়। আমার সেই অভিজ্ঞতা আছে, তবে এখন আর এরূপ লোকের সঙ্গে দেখা করতে ঘৃণাই হয়। ঘৃণা হবার প্রধান কারণ হ'ল এরা যে পরাধীন সেকথা মোটেই ভাবেনা। তারা শুধু ভাবে তারা মালিক।

মালিক জাতে ইহুদী এবং প্রগতিশীল। ইহুদীদের তখনই হাঙ্গেরীতে বারটা বেজে গিয়েছিল! কখন যে তাঁর মালিকআনা বাজেয়াপ্ত হয় তার স্থিরতা ছিলনা। সেজন্যই আমাকে আদর যত্ন করা হচ্ছিল না। তার ফ্যাক্টরীতে আমার বুলগেরিয়ায় পরিচিত ইহুদী যুবক কাজ করত। মালিকের অনুকম্পায় বুদাপেস্তে আমি এক বৃদ্ধা ইহুদী রমণীর ঘরে স্থান পেয়েছিলাম। বৃদ্ধার বয়স পঁচাত্তরের কম ছিলনা। তিনি ছিলেন নিরীশ্বর বাদী এবং ধর্মে সোসিয়েলিস্ট। বিদ্রোহ করে যাওয়াই তাঁর কাজ। আমি কিন্তু তাঁর বিদ্রোহ-ভাবের পূজারী ছিলামনা। তিনি আমাকে ভাত রেঁধে দিতেন। তাঁর অন্নদানের জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ ছিলাম। ড্রেসডেনেও সেরূপই একটি জার্মান মহিলার বাড়িতে ছিলাম, তিনিও আমাকে সুপক্ক অন্ন ব্যঞ্জন রেঁধে ভোজন করাতেন। বিদেশে গিয়ে দেশী প্রথায় ভাত খেতে পেয়ে সকল কথা, এমন কি, কি কারণে পথে বের হয়েছিলাম তার কথাও ভুলতে হয়েছিল।

বুদাপেস্ত্

বুদাপেস্ত হ'ল হাঙ্গেরিয়ানদের রাষ্ট্রকেন্দ্র, অন্তরের সঙ্গে তারা সেই নগরীটিকে ভালবাসে। হাঙ্গেরিয়ানরা চায় না এই নগরে বিদেশী এসে বসবাস করুক। দুঃখের বিষয় বুদাপেস্তের যত লোক সংখ্যা তার অর্ধেকই হল বিদেশী। বিদেশীদের মধ্যে জার্মান ক্যাথলিকদের সংখ্যাই বেশী। প্রোটেষ্টান এবং জার্মান ইহুদীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান। জার্মানরা হল হাঙ্গেরিয়ানদের বন্ধুবান্ধব এবং জার্মান ইহুদীরা হল হাঙ্গেরিয়ানদের তথাকথিত শত্রু। কারণ জার্মান ইহুদীরা প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বুদাপেস্তের অনেক বাড়িঘর প্রায় বিনা মূল্যেই কিনে ফেলে। আমেরিকান 'ডলার' এবং বৃটিশ স্টার্লিং জার্মান ইহুদীদের সাহায্য করেছিল। এই কথাটি কাগজপত্রে কোথাও পাওয়া যায় না তবে সর্বসাধারণ এরূপই বলে থাকে। আমি যে বৃদ্ধার ঘরে স্থান নিয়েছিলাম সেই বৃদ্ধাও তার নিজের জাতের লোকের কথা বলে দুঃখ প্রকাশ

করতেন। সঙ্গে সঙ্গে বলতেন সম্পত্তি কেনাবেচার প্রথা এই পৃথিবীতে যতদিন থাকবে ততদিনই এক জাতে অন্য জাতের মুণ্ডপাত করবার চেষ্টা করবে, যাতে দুর্দমনীয় কেনাবেচার প্রথা পৃথিবী থেকে লোপ পায় তারই জন্য তিনি মনেপ্রাণে চেষ্টা করছিলেন।

বুদাপেস্ত শহরটি দুইভাগে বিভক্ত। দানিয়ুব নদী বুদাপেস্তের ভিতর ভেদ করে পূর্ববাহিনী হয়ে এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণ সাগরে পতিত হয়েছে। বুদাপেস্তে দানিয়ুব নদীর গভীরতা মোটেই নেই। জল ধীরে আস্তে বয়ে যাচ্ছে। দানিয়ুব নদীই হ'ল বলকানের জীবনীশক্তি। জীবনীশক্তির যেখানে উৎস সেখানেই হবে আমার ভ্রমণ কাহিনীর শেষ, সেখানেই হবে 'বিদ্রোহী বলকানের' বিষয়বস্তুর পরিসমাপ্তি।

বৃদ্ধার ঘরে যে সময় আমি গিয়ে পৌঁছেছিলাম তখন বিকালবেলা। বিকালবেলাই বৃদ্ধা আমার জন্য ভাত এবং সব্জীতরকারী প্রস্তুত করেছিলেন এবং আমার খাওয়া হয়ে গেলে তিনি তাঁর নিকটস্থ এক আত্মীয়কে ডাকবার জন্য গিয়েছিলেন। বলে গিয়েছিলেন, সন্ধ্যার পূর্বেই ফিরবেন, আমি তার ফিরে আসার পূর্বে যেন কোথাও না যাই। বৃদ্ধা যখন ফিরে এলেন সঙ্গে করে নিয়ে এলেন তাঁর এক ভাইপোকে। তার বয়স কুড়ি হতে বাইশ। যুবক ছিল কলের মজুর, শুধু তাই নয় তার একটা বিশেষ গুণও ছিল। সে ইংলিশ বেশ ভাল করে বলতে পারত, সেজন্য দোভাষীর কাজ তাকে দিয়েই সুচারুরূপে সম্পন্ন হত। সে এসেই আমাদের প্রথায় নমস্কার করে। নমস্কার শব্দটি আমাদেরই মত উচ্চারণ করেছিল। বিদেশীর মুখে স্বদেশী কথা শুনে আমি কখনও বিচলিত হইনা সেজন্য তাকে বসতে বলে জিগ্যেস্ করলাম্ "আপনি কি হাঙ্গেরিয়ান?" সে বললে "হাঙ্গেরিয়ান্ শব্দটি হল ইংলিশ, আমরা নিজেদের 'মাঝারু' বলে পরিচয় দিই এবং জার্মান ও হাঙ্গেরিয়ানরা আমাদের ইহুদী বলেই গণ্য করে। আমি নিজেকে ইহুদী বলে পরিচয় দিতে রাজী নই। ইহুদীদের ভাষা, ইহুদীদের আচার ব্যবহার আমি একটাও প্রতিপালন করিনা, অতএব যারা আমাকে এবং আমাদের মত লোককে ইহুদী বলে অভিহিত করে তারা হল আমাদের শত্রু, হাঙ্গেরীর শত্রু এবং পৃথিবীর শত্রু।" যুবক আরও বল্লে যে সেখানে আমার যাবার পূর্বে সুভাষচন্দ্র বসু যখন বুদাপেস্তে এসেছিলেন তখন সে তাঁর দোভাষীর কাজ করেছিল। আমাকেও সেদিক দিয়ে সে সাহায্য করবে। শুধু সেদিক দিয়ে সাহায্য নয় আমি যাতে ভিক্ষা পাই সে বিষয়ে সে আপ্রাণ চেষ্টা করবে। যুবকের কথা শুনে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলাম তাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম "শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুকে এই দেশে কিরকম ভাবে অভ্যর্থনা করা হয়েছিল।" যুবক অগাধ জলের মাছ। এসম্বন্ধে সে একেবারে নীরব ছিল, শুধু বলেছিল "আপনি কি সেই ভারতীয় দেশপ্রেমিকের কথা বলছেন?" যুবকের সেই কথা শুনে আমিও নীরব থাকাই ঠিক করেছিলাম।

বুদাপেস্ত পশ্চিম ইউরোপের নিকটস্থ শহর। সেখানকার লোক রাষ্ট্রনীতি বেশ

ভাল করেই বোঝে এবং সেজন্য রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে চীৎকার করেনা। দু'একটি কথার সাহায্যে অথবা ইঙ্গিতে মস্তবড় একটা বিষয়ের ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দিতে সক্ষম হয়। আর হিটলার পুর্ণোদ্যমে শক্তি বাড়াচ্ছিলেন। যে সকল ধনীরা জার্মান ইহুদীদের অষ্ট্রিয়া এবং হাঙ্গেরীর বড় বড় 'বিল্ডিং' 'ষ্টার্লিং' এবং 'ডলার' কিনতে সাহায্য করেছিলেন তারাই হের হিটলার এবং সিনির মুসোলিনীকে অর্থ এবং যুদ্ধোপকরণ দিয়ে অকাতরে সাহায্য করছিলেন। বিষ বাষ্পে আবিসিনিয়া আক্রান্ত হয়েছিল এবং আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা চিরতরে লোপ হবার উপক্রম হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মহাশক্তিশালী 'ডলার' এবং মহাপরাক্রান্ত স্টার্লিং—চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ইউরোপের লোক এই পরিবর্তন দেখে কেঁপে উঠেছিল। ভারতের কেউ ভাবছিলনা অতএব নবাগত যুবকের কাছ থেকে সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে এর বেশী কিছুই শুনবার মত ছিল না।

পরদিন যুবককে নিয়ে অনেকগুলি সংবাদপত্র অফিসে গিয়েছিলাম। অনেক বড় বড় সম্পাদকের সঙ্গে কথাও বলেছিলাম এবং বুঝতে পেরেছিলাম এরা হলেন টাকার দাস। কর্তার ইচ্ছা কর্ম করাই হল তাদের পেশা। যদিও প্রেস্-'সেন্সর' ছিল না তবুও অলক্ষিতে কে এবং কারা যেন সংবাদপত্রের সম্পাদকের ঘাড়ে মাহুতের মত বসে উপদেশ রূপে আদেশ করছিল। বুদাপেস্তের কোন ধনিক সংবাদ পত্রে আমার নাম প্রকাশিত হয়নি। কতকগুলি বিজ্ঞাপন রহিত সাপ্তাহিক পত্রিকায় আমার নাম প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁরা তাতে কি লিখেছিলেন আর কি না লিখেছিলেন তা আমি কাউকে জিজ্ঞাসাও করি নাই।

বুদাপেস্তের একটি বিশেষত্ব আছে। এখানে যতগুলি কাফের ক্যাবারেড, রেস্তোঁরা এবং 'অপেরা হাউস' আছে ততগুলি আর ইউরোপে কোথাও নেই। কেউ কেউ বলেন ভিয়েনার কফি সব চাইতে ভাল হয় আমি কিন্তু তাদের সঙ্গে একমত নই আমার মনে হয় বুদাপেস্তের কফি প্রস্তুত প্রণালী সবচেয়ে ভাল, এখানে নানাপ্রকারের খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়। খাদ্যদ্রব্যগুলির মধ্যে পিঠেই হল তার অন্যতম, ইউরোপের আর কোথাও বুদাপেস্তের মত পিঠে তৈরীর প্রণালী দেখতে পাওয়া যায়না! বুদাপেস্তের কয়েকজন ভারতীয় ছাত্রের সঙ্গেও দেখা হয়েছিল, তাদের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম তারা স্থানীয় আমোদ-প্রমোদ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে লক্ষ্য রাখেন না। ইহুদী যুবক আমাকে বলেছিল এদেশে আগত ভারতীয় ছাত্রগণ যেন এক একজন রাজপুত্র। স্থানীয় ভাল মন্দ কোন বিষয়ে তাঁরা কোনও সংবাদ রাখেন না। এতে আমার দুঃখ করবার মত কিছুই ছিল না। বুদাপেস্ত, ভিয়েনা, বার্লিন প্রভৃতি স্থানে যে সব ভারতীয় ছাত্র শিক্ষা করবার জন্য যান তাঁরা প্রায়ই ব্যবসায়ীদের আত্মীয়, নয় পুত্র তারা ব্যবসা বাণিজ্য ছাড়া এবং নিজের কার্যোদ্ধার ছাড়া স্থানীয় পলিটিক্স নিয়ে কোনরূপ চিন্তা করতেন না। আগেই বলেছি এদিকের লোক রাষ্ট্রনীতিতে খুব অভিজ্ঞ। তাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ভারতীয়-ছাত্রের রাষ্ট্রনীতির অভিজ্ঞতা সাগরের সঙ্গে গোষ্পদ

তুল্য। ভারতীয় ছাত্র অনভিজ্ঞতার কথা তাদের কিছুই বলিনি, শুধু বলেছিলাম এদেশের রাষ্ট্রনীতি বড়ই উঁচুদরের।

ভিক্ষাই ছিল আমার জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন, ভিক্ষাই ছিল আমার জ্ঞান আহরণের একমাত্র পথ। সুন্দর চন্দ্রালোকে পথের মাঝে রেস্তোঁরাগুলিতে উপবিষ্ট ভদ্রলোকদের কাছে যখন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে উপস্থিত হতাম তখন তারা ভিক্ষা ত দিতই, উপরন্তু আমার জ্ঞানের ভাণ্ডে যে অমূল্য সম্পদ তুলে দিত তার মূল্য আমার পক্ষে পরিশোধ করা অসম্ভব ছিল। রেস্তোঁরাগুলিতে যখন ভিড় দেখতাম তখন মনে বেশ আনন্দ হত এবং সেই আনন্দ উপভোগ করবার জন্য নিজেও বসে যেতাম। বুদাপেস্তে আনন্দ উপভোগ করার মত সময় আমার বেশী ছিল না সেজন্য বৃদ্ধা মহিলা এবং যুবক বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একদিন ভিয়েনার দিকে রওনা হয়েছিলাম। অনেকদিন হয় বুদাপেস্ত পরিত্যাগ করে এসেছি, কিন্তু আজও সেই হাঙ্গেরিয়ান যুবক বন্ধুর কথা মনে পড়ে।

—শেষ—